

চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ

আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার



চিন্তানায়ক

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ

আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার,
এম্. এ., পি-এইচ্. ডি. (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়),
অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলকাতা ।



শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী,
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা—৯ ।

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ,
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী,
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা—৯।

মূল্য : আঠারো টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর :
শ্রীমোহন চাঁদ শীল,
প্রিন্ট ও প্রিন্ট,
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলকাতা ৭০০০০৬।

॥ উৎসর্গ ॥

যাঁদের প্রেরণা ও আশীর্ব্বাদ
আমার সকল শ্রেয়ঃবোধ ও কর্মপ্রচেষ্টার উৎসস্বরূপ ঃ

পরমারাধ্য পিতৃদেব
স্বর্গীয় ধরণীধর মজুমদারের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত
এই দীন অর্ঘ্যখানি

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মজুমদারের পবিত্র করকমলে
সমর্পিত হল।

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মননধর্ম, ক্রিয়াকর্ম ও ভাবাদর্শ আপাত-দৃষ্টিতে দুই সুদূরবর্তী মেরু-অঞ্চলে অবস্থিত বলে সাধারণ পাঠকের মনে হতে পারে। কিছুকাল পূর্বে দুই মহাপুরুষের জন্ম-শতবার্ষিক উপলক্ষে ভাগ্যক্রমে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সাময়িক পত্রে উভয়ের সম্পর্কেই নানাধরণের প্রবন্ধ নিবন্ধ, আলাপ-আলোচনা, স্মৃতিকথা প্রচুর পরিমাণে মুদ্রিত হয়েছে—যার কিঞ্চিন্মাত্র অধিগত করলে স্বামীজী ও কবিগুরুর জীবনাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে বৈপরীত্যের চেয়ে সাদৃশ্য ও সমজাতীয়ত্বই অধিকতর প্রতিভাত হবে। শত-বার্ষিক অনুষ্ঠান শুরু হবার পূর্বেই বর্তমান গবেষণাগ্রন্থের লেখক ডক্টর শ্রীমান্ আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার প্রাপ্ত উপকরণের সাহায্যে দুই মহাপুরুষের চিন্তা ও মননের মধ্যে আত্মীয়তার সেতু আবিষ্কার করেন—এই গবেষণাগ্রন্থ সেই অনুসন্ধানেরই সার্থক ফল। পরে জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে এই সম্পর্কে বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য পাঠকসমীপে উপস্থিত হলে, লেখক দেখলেন, ইতিপূর্বে তিনি এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ তথ্যসঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ।

এ-বিষয়ে ধীরমস্তিষ্কে আলোচনা করার বাধা ছিল বিস্তর। বিবেকানন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রথম যৌবনে পরিচিত ছিলেন। ধর্মোন্মাদনার প্রথম জলোচ্ছ্বাসের সময়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে উপলব্ধি ও ঈশ্বর-জ্ঞান-সম্পর্কে একাধিকবার আলাপাদি করেছেন, অন্তরের তীব্র দিব্যজ্বালা দূর করতে তিনি সেকালের স্থিতধী দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর উৎসবানুষ্ঠানেও তাঁকে দু'একবার যোগ দিতে দেখা গেছে। বিশ্ববিজয়ের পর স্বদেশে ফিরে তিনি মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও কর্মৈষণার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সংযোগ ছিল না। সেই বিরোধ দূর ক'রে স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও ব্রাহ্মসমাজের ভাবাদর্শকে একটি মিলনসূত্রে মিলিয়ে দেওয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য নিবেদিতা চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন, তাতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেও এ-ব্যাপারে নিবেদিতা বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে ভগিনীর ঘনিষ্ঠতা স্বামীজীও অনুমোদন করতেন না। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ দু'একবার প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দের কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করলেও কবির সঙ্গে যে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মূলতঃ

পার্থক্য আছে তা তিনি রোমাঁ রোলাঁকে স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন। দেখা যাচ্ছে—একই কালে, পরম গৌরবময় অস্তিত্বের মধ্যে বর্তমান থেকেও একে অপরের কাছে আসতে পারেননি বা চাননি।

বলাই বাহুল্য কবি ও 'নবি'র মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবধান থাকবেই। বৈচিত্র্যের দূত কবি এবং ঐক্যনির্দেশক ধর্মাচার্যের চিন্তাপ্রণালী নিশ্চয়ই একই মনন-উৎস থেকে উত্থিত হয় না। সুতরাং বৈদান্তিক ভারতের প্রবক্তা এবং ঔপনিষদিক রসপানে বর্ধিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্যঘটা সম্ভব নয়। তবে একটু অবহিত হয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে—জ্ঞান ও ভক্তি, আবেগ ও মনন, হৃদয় ও মস্তিষ্ক,—দু'জনকেই কোনও কোনও মুহূর্তে বিপরীত দিক থেকে টান দিত। মনের এই বিচিত্র দ্বন্দ্ব বিবেকানন্দ এইভাবে প্রকাশ করেছেন :

How I hate *love.* Would I never had any Bhakti. Indeed, I wish I could be an Advaist, calm and heartless. Well, this life is done. I will try in the next.···It is the weak heart that has driven me out of India to seek some help for those I love, and here I am. Peace have I sought, but the heart, that seat of Bhakti, would not allow me to find it. Struggle and torture, torture and struggle.

(*Complete Works,* Vol. VI)

এই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথকেও কম ব্যাকুল করে তোলেনি। তিনি বলেছেন,

"আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্য একদিকে বেদনা, আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশের প্রতি, দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ।" (চিঠিপত্র। ৫ম)

ডক্টর আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার এই সমস্ত বিচিত্র, বিপরীত, বিষম এবং

তার সঙ্গে সুগভীর নৈকট্য ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত হন এবং বিশালতর দেশ ও কালের পটভূমিকায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আপাতঃ অনাত্মীয়তার বেড়া ভেঙে উভয়ের চিন্তা ও আদর্শের মধ্যে সুগভীর ঐক্য আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেন। বলা বাহুল্য তাঁকে উভয়ের জীবন ও পরিবেশের সম্পর্ক বিচারে তুলনামূলক রীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। উভয়ের পারিবারিক ও পরিবেশের সম্পর্ক, প্রকৃতিগত ঐক্য ও অনৈক্য, ধর্ম-সমাজ-স্বদেশচিন্তা-সংগঠন-সেবাব্রত, শিক্ষাদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে ডক্টর মজুমদার অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে উভয়ের মধ্যে ভাবের দিক থেকে সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ পাঠকের প্রথমে মনে হবে, কাজটি দুঃসাহসিক। কারণ অনেকেই মনে করেন যে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবাদর্শগত আত্মীয়তা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কারণ দু'জনে দুই ভিন্ন গ্রহলোকবাসী। কিন্তু এই তরুণ গবেষক উভয়ের রচনাবলী থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-বিবেকানন্দের সঙ্গে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যাই হোক না কেন, ভাবের জগতে তাঁদের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা ছিল, সে তাঁরা স্বীকার করুন, আর না-ই করুন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ডক্টর মজুমদারের এই আলোচনার দ্বারা খুব উপকৃত হয়েছি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে-সমস্ত পাঠক এ-বিষয়ে কিছু সংশয়াকুল, তাঁরাও এই গ্রন্থ প'ড়ে নিজেদের মনের অন্ধকার নিজেরাই দূর করতে পারবেন। এখানে আমি লেখকের গ্রন্থ-পরিচয় দিলাম না, কারণ সে কাজটুকু পাঠকেরাই করুন—এই আমার অনুরোধ। মোদকের মিষ্টত্ব স্বাদগ্রহণের দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়, শত ব্যাখ্যানের দ্বারা নয়।

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা বিভাগ,
১৩৪৭।১৯৪০

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, আবির্ভাবকালের দিক্ থেকে উভয়ে ভারত-ইতিহাসের একই যুগের দুই প্রধান পুরুষ। চিন্তাধারা তথা জীবনমূল্যাব-ধারণ ও আচরিত কর্মের ফলাফলের বিচারে প্রত্যক্ষতঃ **বৈরাগ্যবিমুখ কবি ও বৈরাগ্যব্রতচারী সন্ন্যাসী,**—দুই ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রত্যয়াশ্রয়ী বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে, উভয়ের অনুগামী বলে যাঁরা সর্বসমক্ষে পরিচিত তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জীবনমূল্যবোধের এই বৈপরীত্য স্বতঃপ্রতীয়মান হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্বভারতী এবং বেলুড় মঠ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু উভয় চিন্তানায়কের মূল ভাবনাধারা গভীরভাবে অনুধাবন করলে এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক্‌রূপে অবহিত হলে দেখা যাবে, 'এহ বাহ্য'—দুজনের অধিকাংশ বৈষম্য একান্তই বহিরঙ্গাশ্রয়ী। জীবনাচরণ ও মূল্যবোধের আপাত বৈপরীত্যের অন্তরালে চিন্তা ও চেতনার গভীরে তাঁরা অনেক স্থলে পরস্পরের নিকটতম সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন। **দুজনের বৈষম্যপ্রসঙ্গ সকলের কাছেই সুস্পষ্ট ; কিন্তু সাম্যের দিক্‌টি প্রাকৃত দৃষ্টিতে সহসা ধরা পড়ে না ;—অজ্ঞাতপ্রায় নেপথ্যচারী সেই অন্তর্নিহিত ঐক্যের সত্য স্বরূপটি পাঠ করবার চেষ্টা বর্তমান নিবন্ধপরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।** যা ঘটেছে শুধু তাই দিয়ে তাঁদের বিচার না করে, তাঁরা যা ঘটাতে চেয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের বিচার করলে দুই ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত মৌল ঐক্যের রূপটি স্পষ্টরূপে ধরা পড়বে বলে আমাদের বিশ্বাস। বহু বিষয়ে কর্মপন্থা অনেকাংশে বিভিন্ন হলেও দুজনে একই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। **চিন্তায় ও কর্মে দুই যুগপুরুষের বাহ্য বিরোধের অন্তরালে যে ঐক্যসূত্রটি রয়েছে সেইটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখে 'চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ' (তুলনামূলক আলোচনা) নিবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।**

দুজনের আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে ঘটলেও উভয়ের তিরোভাবের কালগত ব্যবধান অনেকখানি। বিবেকানন্দের জীবৎকাল মাত্র উনচল্লিশ বৎসর (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ)। তার মধ্যে তাঁর কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে শেষ

নয়-দশ বৎসর (১৮৯৩-১৯০২ খ্রীঃ)। রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর আরও উনচল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। দীর্ঘ জীবন লাভের ফলে কালের অগ্রগতি ও বয়সের পরিণতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিন্তার ও কর্মের ক্ষেত্রে যতোখানি পূর্ণতা লাভ করবার সুযোগ ও অবকাশ পেয়েছিলেন, বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে ততোখানি পান নি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, কালের পরিপ্রেক্ষিতে ও সময়ের অনুপাতে বিবেকানন্দের চিন্তার অগ্রগতি ও বিস্তার ছিল অসামান্য ও অভূতপূর্ব।

নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্থাৎ উনিশ শতকের জাতীয় নবজাগরণের রূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে পূর্বসূরিদের তথ্য ও মতবাদগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। সেইগুলিকে প্রয়োজনমতো একত্রে সঙ্কলিত করে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য, পরস্পরবিরোধী ভাবনার সংঘাত ও সমন্বয়ের সূত্রগুলি অনুধাবন করবার চেষ্টা ঐ পরিচ্ছেদে আছে। নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু অর্থাৎ দুই মনীষীর চিন্তা ও কর্মের স্বরূপটিকে চিনে নেওয়ার জন্যে তাঁদের ধ্যানধারণার পশ্চাদ্‌পট উনিশ শতকের পরিবেশ প্রতিবেশ ও সে-যুগের চিন্তা-সূত্রগুলির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে ঐ পরিচ্ছেদটি নিবন্ধে সংযুক্ত হয়েছে।

দুই চিন্তানায়কের মানসপ্রতিবেশ, উভয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ-পরিচয় সম্পর্কিত আনুপূর্বিক তথ্যাবলী, ধর্ম-সমাজ-স্বদেশ-বিশ্ব-মৈত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে দুজনের চিন্তাধারার তুলনামূলক সামগ্রিক আলোচনা, স্বদেশে ও বিদেশে দুই ভারতপথিকের কর্মসাধনার অন্তর্নিহিত স্বরূপ, উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে বাঙ্‌লা চলিত ভাষাকে লঘুগুরু-বিষয়বস্তু-নির্বিশেষে সাহিত্যে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিবেকানন্দের অগ্রবর্তিতা ও ও লেখ্য বাঙ্‌লা ভাষারূপের বিবর্তনে তাঁর দান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য, মানবাদ্বৈতবোধের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব—সবকিছুই অল্পবিস্তর এই বিষয়নিষ্ঠ নিবন্ধের সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত একুশটি পরিচ্ছেদের ('পরিশেষ' সহ) আলোচ্য বিষয়সূচির অন্তর্গত হয়েছে।

নিবন্ধের প্রতিপাদ্য ক্ষেত্রবিশেষে একান্ত বিতর্কিত বলে যথাসম্ভব অনুবাদ পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মূল রচনাগুলিকেই আলোচনায়

আশ্রয় করা হয়েছে। উভয়ের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বচিহ্নিত অনুরণিত বাণীর অননুবাদ্য সুর ও স্বরকে সাধ্যমতো অনাহত রাখবার ঐকান্তিক প্রয়াসও অনুবাদ-পরিহারের অন্যতম কারণ।

আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে এক কিশোরের ছাত্রজীবনের আবেগাবর্তিত দিনগুলিতে এই নিবন্ধের মূল কাঠামোটি পরিকল্পিত ও রূপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সেদিন তার সকল চেতনাকে আচ্ছন্ন, সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু 'সাধ যতো ছিল, সাধ্য ছিল না'। তার সেসময়ের শক্তি ও দৈন্যের সবরকম ছাপ যুগপৎ রচনাটির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালের সম্ভাব্য পরিমার্জনা সত্ত্বেও লেখাটি যে তার প্রাথমিক রূপের দুর্বলতাগুলি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি, এ সম্পর্কে নিবন্ধরচয়িতা নিজে সর্বাধিক সচেতন। নিবন্ধপরিকল্পনার পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়ে নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, উভয়েরই আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে প্রায় একযুগ আগে। তারপর নিবেদিতার ও অরবিন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তিও প্রতিপালিত হয়েছে।—স্বাভাবিকভাবে এইসব সুযোগে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও চর্চা বেড়েছে অনেক এবং তাঁদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদিও প্রকাশিত হয়েছে অবিশ্রান্ত। দুদশক আগে, রচিত হবার অব্যবহিত পরে বর্তমান নিবন্ধটি মুদ্রিত আকারে পরিশীলিত পাঠকদের সামনে হাজির হবার সুযোগ পেলে হয়তো অধিকতর নূতনত্বসন্ধানী বলে প্রতীত হতে পারতো।

এসব সত্ত্বেও একটা বিষয়ে নিবন্ধের লেখক নিশ্চিন্ত যে, রচনাটি কালের অগ্নিপরীক্ষায় কথঞ্চিৎ উত্তীর্ণ।—দেশকালনিরপেক্ষ বিষয়বস্তুর গুণেই হোক্ অথবা আলোচ্য বিষয়ের সর্বজনীন আবেদনের জোরেই হোক্, রচিত হবার সুদীর্ঘ সময় পরেও এটি বুধঃমণ্ডলীর সপ্রশংস প্রসন্ন অনুমোদন ও স্বীকৃতি পেয়েছে। বছর ছয়েক পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাপত্র হিসেবে নিবন্ধটিকে 'ডক্টর অফ্ ফিলজফি' উপাধি লাভের যোগ্য বলে সম্মানিত করে নিঃসন্দেহে লেখককে উৎসাহিত করেছেন। তারপরেও নানা প্রতিকূল পরিবেশের জন্যে এবং যোগাযোগ ও সুযোগের অভাবে নিবন্ধটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশে অনেক দেরি হয়ে গেল। তবু 'কদাপি না-এর চেয়ে বিলম্বেও ভালো' এই আপ্তবাক্যকে শেষপর্যন্ত অনুসরণ করা গেছে, এইটুকুই সান্ত্বনা!

'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসায় আমাকে প্রথম উদ্বুদ্ধ ও

প্রণোদিত করেছিলেন পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। আচার্যদেবের পদতলে বসেই আমার গবেষণাকর্মে দীক্ষা এবং তাঁর নির্দেশানুসারেই এই নিবন্ধরচনায় আমি ব্রতী হয়েছিলাম। পরমপূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায় মহাশয়ের অকৃপণ উৎসাহ ও উপদেশ এবং সর্বোপরি তাঁর প্রসন্ন উদার রাজকীয় ব্যক্তিত্ব আমাকে এই কাজে সকল সময় প্রবুদ্ধ করেছে। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহোদয়ের দাক্ষিণ্যে ও তত্ত্বাবধানে নিবন্ধটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডক্টর অফ্ ফিলজফি' উপাধি-পরীক্ষার গবেষণাপত্ররূপে উপস্থাপন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।—এঁদের সকলের কাছেই ছাত্র হিসাবে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। পূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও ডক্টর উপেন্দ্রকুমার দাস সস্নেহ উৎসাহে ও উদ্দীপনায় আমাকে সর্বদা আত্মবিশ্বাসে উদ্বোধিত করেছেন। পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের আলোচনা ও ভাষণ নানাভাবে আমার চিন্তাকে প্রণোদিত ও বিচারপদ্ধতিকে উজ্জীবিত করেছে। গবেষণাকর্মে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্সপেক্টর অফ্ কলেজেস্' অগ্রজপ্রতিম শ্রীআর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুপ্রেরণা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বাত্মানন্দজী মহারাজ চলিত ভাষার সপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের লেখনীচালনা সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ ও অনালোচিতপূর্ব তথ্যাদির সন্ধান দিয়ে নিবন্ধটিকে সম্পূর্ণাঙ্গ হতে সাহায্য করেছেন। এঁরা কোনোরকম নিয়মতান্ত্রিক ঋণস্বীকারের বহু ঊর্ধ্বে।—এঁদের সকলকে আমার প্রণতি জানাচ্ছি।

আমার প্রতি একান্ত স্নেহপরবশতঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্লাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর অজস্র ব্যস্ততা ও বিপুল কর্মভার সত্ত্বেও অনুগ্রহ করে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর প্রশান্ত প্রেরণা আমার জীবনের বিরল সৌভাগ্যলব্ধ সম্পদ্। তাঁর উদ্দেশ্যে আমার বিনম্র প্রণাম রইলো।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্লা পুঁথিবিভাগের সর্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় 'সুকুমারদা-'র (শ্রীসুকুমার মিত্র) কাছে আর-সকলের মতোই গবেষণাকর্মসংক্রান্ত নানা ব্যাপারে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আমার অনুজপ্রতিম সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই নিবন্ধরচনায় একদা আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছিলেন তা যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করছি।

শ্রীমতী গোপা দত্ত ব্যক্তিগত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও প্রুফ্ দেখা বিষয়ে আমাকে অক্লান্ত সাহায্য করেছে। এছাড়া অধ্যাপক ডক্টর নন্দলাল চক্রবর্তী [এম্. এস্. সি., পি-এইচ্. ডি. (লণ্ডন)], শ্রীমতী মঞ্জু মুখোপাধ্যায় [এম্. এ, বি. এড্.), শ্রীমতী অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ তপোব্রত ঘোষ অবসরসময়ে সাধ্যমতো প্রুফ্ দেখার ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করেছে।—এরা সকলেই আমার একান্ত প্রীতিভাজন ছাত্রছাত্রী। লৈখিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এদের বিব্রত করতে চাই না।

শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী মহাশয়ের প্রেরণা ও ব্যবস্থাপনায় এবং 'শ্রীভূমি'-র কর্ণধার শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ মহোদয়ের অক্লান্ত উদ্যম ও বদান্যতায় নিবন্ধটি শেষপর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভবপর হল। এ ব্যাপারে তাঁরাও আজ আমার মতোই সমপরিমাণে তৃপ্ত বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীমান্ শুভতোষ, শ্রীমান্ মানবেশ, কল্যাণীয়া শতরূপামা ও শ্রীমতী অণিমা মজুমদার তাদের সাহচর্য, মমতা, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে আমাকে পরিশ্রান্ত কর্মক্লান্ত মুহূর্তগুলিতে সর্বদা নূতন উদ্যম ও প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করেছে। তাদের সকলকে আমার নিত্য মানসসঙ্গীরূপে এই সুযোগে আর একবার অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

এই নিবন্ধ মুখ্যতঃ যাদের জন্যে পরিকল্পিত, সেই যুবসমাজ এবং বিশেষ করে তরুণ ছাত্রছাত্রীরা যদি এই লেখা পড়ে কিছুমাত্র রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের ভাবাধারায় উদ্বোধিত ও কোনো শ্রেয়ঃ মূল্যবোধে উদ্দীপিত হয় তবে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করবো। যথাসাধ্য সতর্কতা ও প্রয়াস সত্ত্বেও পুস্তকটির এই প্রথম সংস্করণে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ও আনুষঙ্গিক ভ্রান্তি থেকে গেল। সহৃদয় পাঠকদের কাছে সেই ত্রুটির জন্যে শুরুতেই মার্জনা চেয়ে রাখছি। পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলি সাধ্যমতো সংশোধন করবার ইচ্ছা রইলো।

বিনয়াবনত

শুভ ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪। — আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার।

স্থায়ী আবাস—২১৮, ইচ্‌লাবাদ্, বর্ধমান, পশ্চিম বাঙ্‌লা।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা—৭০০০১২

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দী: নবযুগের অভ্যুদয়ের ধারা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় যে নবযুগের উন্মেষ ঘটেছিল, তার মূল লক্ষণটিকে এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, সেটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ। অন্ধ সংস্কার ও আচারের মোহ কাটিয়ে বিচার-শক্তির অনুশীলন, মননবৃত্তির উদ্বোধনই হল এই জাগরণের স্বরূপ। স্বাভাবিকভাবেই যে সুস্পষ্ট প্রবণতার দ্বারা এ যুগ সামগ্রিকভাবে চিহ্নিত, তা হচ্ছে বন্ধন-অসহিষ্ণুতা। বহুযুগ-সঞ্চিত বিচারহীন আচার, মননহীন মন্ত্র, অর্থহীন অনুশাসন ও অকারণ নিয়মতান্ত্রিকতার জড় স্তূপ অপসারণের প্রয়াস, শৃঙ্খল মোচন ও শৃঙ্খলাসাধন, মুক্ত জীবনকে প্রতিষ্ঠার আগ্রহ এ যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের মূল্য সম্বন্ধে অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ও সেই মানবজীবনকে সৃষ্টিশীল করে তোলার তপস্যা এ যুগের ফলশ্রুতি।

নবযুগের মূল লক্ষণ

বাঙালির মধ্যযুগীয় অন্ধ জড়চিত্তের দীর্ঘ-লালিত তামসিক সুপ্তির মূলে বড়ো রকমের কুঠারাঘাত হেনেছিল ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে উনিশ শতকের বাঙালি মনের পরিচয়। বণিক ইংরেজ এবং শাসক ইংরেজ আমাদের অনেক নিপীড়ন, দুঃখ, দুর্গতি ও শোষণের কারণ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমভাবে একথাও সত্য যে, ইংরেজি শিক্ষা সেদিন প্রাচ্যের দ্বারে চিত্তদূত হয়ে এসেছিল। যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষা যেমন একদিকে 'পঞ্জিকার প্রাচীর' ও অর্থহীন অনুশাসন-সর্বস্ব শাস্ত্রের অচলায়তন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু মনকে সন্দিগ্ধ ও অসহিষ্ণু করে তুলেছিল, তেমনি অন্যদিকে আত্মানুসন্ধিৎসার জাগরণের মধ্য দিয়ে জাতির গৌরবময় অতীত ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধেও তাকে সচেতন করেছিল।

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে বাঙালি মনের পরিচয়

এই জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে যিনি প্রথম পৌরোহিত্য করেছিলেন তিনি রাজা রামমোহন রায় [১৭৭২ (১৭৭৪)—১৮৩৩]। এরজন্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, উপনিষদ ও বেদান্ত প্রচার, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাবিধির ব্যবস্থা, পণ্ডিতদের সঙ্গে

শাস্ত্রীয় বিচার, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের পঙ্কোদ্ধার, সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্মসভার উদ্বোধন, মিশনারিদের অপপ্রচার প্রতিরোধ, পাশ্চাত্ত্য মননশীলতা ও শিক্ষার আবাহন প্রভৃতি বিচিত্র বহুমুখী কর্মে অসীম পারদর্শিতার সঙ্গে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। চিন্তায় ও কর্মে তিনিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্বদেশের দ্বারে নূতনের বার্তা বহন করে এনেছিলেন। রামমোহন একদিকে উপনিষদ্ প্রচার এবং প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন; অন্যদিকে খ্রীষ্টান ধর্মের এবং বিশেষভাবে মিশনারিদের অপপ্রচার ও হিন্দুধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রতিরোধের জন্য প্রবন্ধরচনা ও পুস্তিকাপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একদিকে তাঁকে রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ও মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতির কর্মতৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভার' প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রিকা' ও রামমোহনের 'কৌমুদী' একসময় পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র মসীযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে রামমোহনকে কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনারিদের বিরুদ্ধে 'বেদান্তযুদ্ধে' অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। আরবী, পারসী, সংস্কৃত, ইংরেজি, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অধিকার এবং বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় বিভিন্ন ধর্মের মত ও তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা রামমোহনের পক্ষে সহজ হয়েছিল। যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনায় তিনিই প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এই উদ্দেশ্যেই কলকাতায় এসেই তিনি 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আসল কথা, পৌরাণিক হিন্দুসমাজের অন্ধ রক্ষণশীলতা ও মিশনারিদের উগ্র ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রামমোহন যুগপৎ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

রাজা রামমোহন

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। মিশনারিদের কর্মপ্রয়াস সেদিন অনেকক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার রূপ পরিগ্রহ করলেও, তাঁরা এমন অনেক কিছু করেছিলেন যা বাঙালির চিত্তমুক্তির ক্ষেত্রে একসময় যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বাঙলা ভাষার গদ্য ও ব্যাকরণ সৃষ্টি, সংবাদপত্র ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, ইংরেজিশিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতিতে যে আগ্রহ ও

মিশনারিদের ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার প্রচেষ্টা

উদ্যম দেখিয়েছিলেন তার মূল উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার হলেও তাদের চেষ্টা সেযুগে দেশের শিক্ষার উন্মেষে বিশেষ সাহায্য করেছিল। তাছাড়া কোনো কোনো উদারহৃদয় মিশনারি অথবা ইংরেজ যে কেবল শিক্ষাবিস্তারের জন্যই শিক্ষাপ্রদানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তারজন্যে বহু বাধাবিপত্তির সঙ্গে অক্লান্ত নিষ্ঠায় যুদ্ধ করেছিলেন সে কথাও আমাদিকে মনে রাখতে হবে। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার প্রমুখ মনীষীদের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলন বাঙলার সমাজে ও বাঙালির চিন্তার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্থায়ী সুফল প্রসব করেছিল।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটল (১৮২৮)। পরবর্তী ব্রাহ্ম আন্দোলনের বীজ উপ্ত হল এই সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব

দ্বিতীয়তঃ নানা শাস্ত্রীয় বাদানুবাদ ও তর্কের ফলে বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন শাস্ত্রগুলির আলোচনা বৃদ্ধি পেল। নির্বিকল্প বিশ্বাসের বস্তু শাস্ত্র বিচারের বিষয় হয়ে উঠল। রক্ষণশীল সমাজের মধ্যেও ধীরে ধীরে সংস্কারকের দল দেখা দিতে লাগলেন। রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাধাকান্ত দেবও স্ত্রী-শিক্ষার সপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ সহমরণ প্রথা বা সতীদাহ প্রথা নিবারণমূলক আইন বিধিবদ্ধ হল (১৮২৯, ৪ঠা ডিসেম্বর)। একে স্মার্ত পৌরাণিক হিন্দুসমাজে নারীর পৃথক অস্তিত্ব ও মূল্যের স্বীকৃতির প্রথম সূচনা বলতে পারা যায়। রামমোহনের দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী আন্দোলন ছিল এর পেছনে। গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ প্রথাও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ও মেকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা এইসকল আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করেছিল। হিন্দুজাতির ললাট থেকে দুটি দুরপনেয় কলঙ্করেখা মুছে গেল।

চতুর্থতঃ বাঙালিকে খ্রীষ্টান করবার জন্যে কোনো কোন প্রতিক্রিয়াশীল মিশনারির সুপরিকল্পিত প্রয়াস রামমোহনের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে পর্যুদস্ত হল।

পূর্বেই আমরা লক্ষ করেছি যে, সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তার ভিত্তিতে জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা ছিল রামমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই কারণেই স্বদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারার প্রতিষ্ঠার জন্যে রামমোহন

বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 'কমিটি অব্ পাব্লিক্ ইন্স্ট্রাক্সন্' (স্থাপিত ১৮২৩ খ্রীঃ) তদানীন্তন প্রাচ্য-শিক্ষা পক্ষপাতীদের পরামর্শে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা স্থির করেন। রামমোহন চাননি যে এদেশের শিক্ষার জন্তে নির্দ্দিষ্ট একলক্ষ টাকা শুধু প্রাচ্য শিক্ষার উৎসাহদানেই ব্যয়িত হোক্। *পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিক্‌টি* বিশ্লেষণ করে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে রামমোহন একটি পত্র লেখেন। পত্রখানির প্রার্থনা সরাসরি পূর্ণ না হলেও, এই পত্রের ফলে স্থির হয় যে, কলকাতার মধ্যস্থলে যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে তার সঙ্গে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের (১৮১৭ খ্রীঃ) নূতন গৃহও নির্মিত হবে। তদনুসারে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি উভয় কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে রামমোহনের এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লিখেছেন :

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসে রামমোহন

"Whith his prophetic vision, Rammohan had realised long before any of his countrymen did, that India would have to assimilate western science and thought if she wanted to come into her once again."

—'Indian Pilgrim'.

স্বাধীন চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান বাহন সংবাদপত্র প্রচারেও রামমোহন ছিলেন অগ্রণী। তাঁর প্রচারিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), পৃষ্ঠপোষিত 'সংবাদ কৌমুদী' এবং চারটি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরল্ড্' (বাঙলা সংস্করণ 'বঙ্গদূত', ১৮২৯) প্রভৃতি পত্রিকার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংবাদপত্র প্রচারে রামমোহন

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই রামমোহনকে 'চিরকালের মতোই আধুনিক' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

"রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সে কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।"

—'ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়'। চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সং পৃ ৩৬১।

"He tried to reopen the channel of spiritual life which had been obstructed for many years by the sands and debris

of creeds that were formal and materialistic, fixed in external practices lacking spiritual significance."

—'The Religion of an Artist' Page-1.

রামমোহন সম্বন্ধে মনীষী Romain Rolland যা বলেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

"Ram Mohan Ray, an extraordinary man who ushered in a new era in the spiritual history of the ancient continent, was the first really cosmopolitan type in India. During his life of less than sixty years (1774-1833) he assimilated all kinds of thought from the Himalayan myths of ancient Asia to the scientific reason of modern Europe".

—"Life of Ramkrishna", 'The builders of Unity.'

বাঙলার নবজাগৃতির ভূমিতে আর একটি বিশেষ সুরকে সেদিন বহন করে এনেছিলেন হিন্দুকলেজেব তরুণ অধ্যাপক অনন্যপ্রতিভাশালী ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। সেটি হল অপ্রতিহত ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বর। স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধনের যে সাধনা রামমোহন তাঁর সমস্ত কর্মে ও চিন্তায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে করে চলেছিলেন সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রটিকে অধিকতর বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ডিরোজিওর। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবের ফেনিল পানপাত্র নিয়ে এসে এই তরুণ ইউরেশিয়ান শিক্ষক ছাত্রদের সামনে ধরলেন। ছাত্রদের নিয়ে তিনি 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামক সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। ডিরোজিও তার সভাপতি, উমাচরণ বসু সম্পাদক এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ছাত্রেরা উৎসাহী বক্তা, শ্রোতা ও সভ্যরূপে উপস্থিত থাকতেন। সকল নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও অসঙ্কুচিতভাবে বিচার করা ছিল এ সভার লক্ষ্য। অপ্রতিহতভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বতোভাবে উপলব্ধি করতে হবে, এই ছিল ডিরোজিওর মূলমন্ত্র। একদল শিক্ষিত বাঙালি শিষ্যের মনে সেদিন ডিরোজিও এইভাবে মুক্ত স্বাধীন চিন্তা-স্পৃহা উদ্দীপিত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ব্যক্তি স্বাধীনতার উদ্গাতা ডিরোজিও ও হিন্দুকলেজ

ডিরোজিওর এই প্রয়াস সর্বতোভাবে যে সুফল প্রসব করেছিল তা নয়। স্বাধীন চিন্তার অনুশীলনে স্বাভাবিক নিয়মেই সেদিন অনেক তরুণচিত্তের অনেক ভুল-ত্রুটি ঘটেছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সাধনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সীমারেখা অতিক্রম করে স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু ডিরোজিও সেদিন যে কতকগুলি শিক্ষিত যুবককে সংগঠিত ও সম্মিলিত-ভাবে স্বাধীন বিচারে অভ্যস্ত হতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, নবযুগে বাঙালির চিত্ত-মুক্তির ইতিহাসে এ তথ্যের বিশেষ মূল্য আছে।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালির চিন্তার ক্ষেত্রে একটি বড়ো রকমের বন্ধনমুক্তি ঘটেছিল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদ আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। ১৭৯৪ সাল থেকে যে মুদ্রাযন্ত্র সেন্সার করা শুরু হয়েছিল ১৮৩৫ সালে তার সমাপ্তি ঘটল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনে নবযুগের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই একযোগে যোগদান করেছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা নূতন সংবাদপত্র দেখা দিতে লাগল; স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রেও জাতির একটি বৃহৎ পদক্ষেপ ঘটল।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদ আইন

রামমোহনের পর ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন ও কর্মধারার পরিচালনার ভার পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের উপর। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়:

"Rammohan was the visible embodiment of the new awakening and the herald of a new era in India's history. His mantle fell successively on Maharshi Devendranath Tagore (1818-1905), father of the poet Rabindranath Tagore, and Brahmananda Keshav Chandra Sen (1838-1884) and the influence of the Brahmo Samaj grew from day to day".

—'An Indian Pilgrim', Page—1,

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ বিশ জন বন্ধুসহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন (৭ই পৌষ)। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের গতি ও প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল বলা যেতে পারে। রামমোহন মুখ্যতঃ বেদান্তের উপর তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। মহর্ষি অষ্টাদশ শতকের

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি পরিবর্তন

য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও আপন উপলব্ধির উপর 'ব্রাহ্মধর্মকে' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থই তার নিদর্শন। মহর্ষির গ্রন্থে উপনিষদের শ্রুতির যথেষ্ট উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু সেগুলিকে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, তাঁর গ্রন্থের মতামতকে সর্বথা প্রাচীন ঋষিদের মত বলে ধরে নেওয়া যায় কিনা এ সম্বন্ধে অনেক সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু

ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-প্রচেষ্টায় সেদিন মহর্ষির বিশেষ সহায়তা করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)।

মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার (১৮৪৩) সম্পাদক অক্ষয়কুমার (১৮২০-১৮৮৬) সেকালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। বাঙলা ভাষার সৃষ্টিতে, মননমূলক সাহিত্যের বিকাশে এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসসম্মত আলোচনার পথ প্রদর্শনে তাঁর স্থান নগণ্য নয়। তাঁর 'প্রাচীন উপাসক সম্প্রদায়', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'স্বপ্নদর্শন', 'ধর্মনীতি', প্রভৃতি রচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মধর্মের যুগোপযোগী সংস্কার ও রূপণের জন্যে অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণ সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণ বসুর যুক্তিতে ও পরামর্শে বাধ্য হয়ে অনেক চিন্তা ও বাদানুবাদের পর অবশেষে মহর্ষিকে বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা ব্রাহ্মসমাজ থেকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। ফলে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ল। দেবেন্দ্রানুগামীদের চেষ্টায় সমাজের কাজ বিস্তৃততর হল ও নানা স্থলে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের এই প্রভাব ও প্রতিপত্তির আর এক বড়ো প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ালেন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডফ্। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসার পর থেকে দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজের শিক্ষিত তরুণ ছাত্রদের উপরে তিনি বেশ কিছুটা প্রভাব ফেলেছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন

আলেকজাণ্ডার ডফ্

ঠাকুর প্রভৃতি পূর্বেই ডফের চেষ্টায় খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালির উপর খ্রীষ্টধর্মের এই আধিপত্য বিস্তারের প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল মহর্ষির দল। স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিল সংঘর্ষ। আত্মপক্ষের সমর্থনে অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী'তে

প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে লাগল। অবশেষে ডফ্ ও তাঁর সহযোগীদের মতবাদের উগ্রতার জন্যে হিন্দু কলেজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁদের মতান্তর ও মনান্তর দেখা দিল। হিন্দুকলেজের নেতৃবৃন্দ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিকে ডফ্ ডিয়েলট্রি প্রভৃতির বক্তৃতা শুনতে নিষেধ করলেন। স্বাভাবিকভাবে হিন্দু-কলেজের ছাত্র মহলে তাঁদের প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পেল।

নূতন ও পুরাতনের নানা পরস্পরবিরোধী আন্দোলন, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য থেকেই সেদিন বাঙলার সমাজ-ইতিহাসে আর এক বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান পোশাক-পরিচ্ছদে, চেহারায় ও কথাবার্তায় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মতোই জীবন-যাপন করে গেছেন। কিন্তু চিন্তায় ও কর্মে তাঁর বিপ্লবী সংস্কারক সত্তাই বারবার প্রকাশ পেয়েছে এবং সেখানেই তাঁর চরিত্রের ব্যাপকতর পরিচয়। বিদ্যাসাগরের অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি একাধারে সমাজসংস্কার, শিক্ষাপ্রচার, মাতৃভাষার উন্নতি সাধন, আর্তত্রাণ সকল দিকেই নিয়োজিত হয়েছিল।

বালিকা বিধবার ব্রহ্মচর্যের মহিমাকীর্তনে মুখরিত ভারতভূমিতে যেদিন বিদ্যাসাগর এককভাবে বিধবাবিবাহের সপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন সেদিন প্রায় সমগ্র দেশ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অজস্র নিন্দা ও কটূক্তি তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। সকল বিরোধী যুক্তি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে খণ্ডন করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত এবং তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়েছিল (১৮৫৬)। নারী-সমাজের মুক্তির জন্যে প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন রামমোহন। বিদ্যাসাগরের সাধনায় তার আরও অগ্রগতি ঘটল।

একদিকে তিনি যেমন সামাজিক অজ্ঞতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আর্ত, দুঃস্থ ও বিপন্নের অশ্রুমোচনের ব্রতও গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে কেউ ব্যর্থমনোরথ হয়েছে এমন নজির নেই। মাতাপিতার প্রতি অসীম ভক্তি, নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ পৌরুষ, স্বাজাত্যাভিমান, প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং 'কাজের সঙ্গে ভাবের ও ভাবের সঙ্গে মনের সচেতন নাড়ীজালের সজীব বন্ধন' বিদ্যাসাগরকে সেযুগেও অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল। অসামান্য

প্রতিভা, অসাধারণ কর্মশক্তি ও অভূতপূর্ব সহৃদয়তার সমন্বয় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। মধুসূদনের ভাষায় এটাই হল তাঁর চরিত্রে "the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother"-এর একত্র সন্নিবেশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সৈন্যহীন বিদ্রোহী'র সঙ্গে তুলনা করেছেন ('চারিত্রপূজা')। তিনি আরও লিখেছেন :

"তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই, তিনি কাহারও সাড়া পান নাই, অথচ বাধা ছিল পদে পদে।…………তিনি যে শবসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তরসাধকও ছিলেন তিনি নিজে।"—'চারিত্রপূজা'।

সমাজসংস্কারের জন্যে লেখনীচালনার সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যসৃষ্টি এবং শিক্ষাপ্রচারেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। আদর্শ শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনাতে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। বর্ণপরিচয়, কথামালা প্রভৃতি তার প্রমাণ দিচ্ছে। গুরু-গম্ভীর, সুললিত, ছন্দোময়, যতিবহুল বাঙলাভাষা রচনার আদিগুরুর পদ তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বাঙলা গদ্যসাহিত্যের এক বিশেষ দিগ্‌দর্শন। বাঙলার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি বহু গ্রন্থই তিনি রচনা করেছিলেন। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম কলা-নৈপুণ্যের অবতারক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'বাঙলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী' বলে অভিহিত করেছেন ('চারিত্রপূজা')।

সংস্কৃতশিক্ষার সহজতর রীতি উদ্ভাবন বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্তি। তাছাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে (১৮৫১ জানুয়ারী) সংস্কৃত প্রাচীন পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য জাতির জন্যে কলেজের দ্বার উদ্ঘাটন, সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি শিক্ষাসম্বন্ধীয় সংস্কারেও তিনি হাত দেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্যেও বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক চেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর—এই কয়েকটি জেলার স্কুল-ইন্সপেক্টারের পদপ্রাপ্ত হলে (১৮৫৫) নানা স্থানে বালক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণেই শিক্ষাবিভাগের নবনিযুক্ত ডিরেক্টার গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে তাঁর ঘোরতর মতবিরোধ উপস্থিত হয়েছিল এবং ক্রমবর্ধমান মতবিরোধ কর্তৃপক্ষের চেষ্টাতেও মীমাংসিত না হওয়ায় অবশেষে

বিদ্যাসাগরকে ১৮৫৮ সালে তাঁর কর্ম পরিত্যাগ করতে হয়। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে তৎকালীন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্ণর-জেনারেলের মন্ত্রী-সভার অন্যতম সভ্য ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন্ বা বেথুনের নাম অবশ্যউল্লেখ্য। বেথুনের সাধু প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির সহযোগিতা অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল। মদনমোহনকে স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা প্রমাণের জন্য লেখনী ধারণও করতে হয়েছিল। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে বেথুনের নামে প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থাপনা ঘটে। সাম্প্রদায়িকধর্ম-অসম্পৃক্ত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন বেথুন সাহেবই বোধহয় প্রথম করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিরাও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের কর্মত্যাগ করার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি 'মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসান'। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর ইন্স্টিটিউসন্‌টিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে রূপান্তরিত করেন এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তা প্রথম শ্রেণীর কলেজের (বি. এ. ক্লাস) রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালির নিজের চেষ্টায় ও নিজের অধীনে উচ্চ শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। ইংরেজি শিক্ষাকে স্থায়ী করবার প্রথম ভিত্তি স্বাধীনভাবে আমাদের দেশে বিদ্যাসাগরই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন, যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরেজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।"—'বিদ্যাসাগর চরিত'। 'চারিত্রপূজা'।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, চরিত্র ও কীর্তি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে যে উক্তি করেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

"Out of the conflict between the old and the new. between the conservatives and the radicals, between the Brahmos and Pundits, there emerged a new type—the noblest embodiment of which was Pundit Iswar Chandra Vidyasagar. This new type of Indian stood for progress and

for a synthesis of Eastern and Western culture and accepted generally the spirit of reform which was abroad, but refused to break away from Hindu Society or to go too far in imulating the West, as the Brahmos were inclined to do at first. Iswar Chandra Vidyasagar for instance, was brought up as an orthodox Pundit, became the father of modern Bengali prose and protagonist of Western Science and culture, and was a great social reformer and philanthropist, but till the last, he stuck to the simple and austere life of an orthodox Pundit".—'An Indian Pilgrim' Page-19.

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজে নূতন শক্তির সঞ্চার হল। মহর্ষির সাধনার সঙ্গে যুক্ত হল কেশবচন্দ্রের মননশক্তি ও বাক্-বিভূতি। যুবকগণের ধর্মশিক্ষার জন্যে ব্রহ্মবিদ্যালয় (১৮৫৯) স্থাপিত হল। মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬) ও কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১৮৬১) সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীপ্রগতি বিস্তারে তরুণ ব্রাহ্মরা অধিকতর সচেষ্ট হলেন।

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মহর্ষির আত্মপ্রত্যয় ও ডিরোজিওর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় নীতিবাদের একটা অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল বলা চলতে পারে। কলকাতার ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ ও যুবসমাজের উপর কেশবচন্দ্রের সেদিনের অসামান্য প্রভাবের মূলে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, অনুপম বাচন-ক্ষমতা ও ইংরেজি ভাষায় অসামান্য অধিকার।

ব্রাহ্মসমাজের দ্বিধা-বিভক্তি—আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

কিন্তু কেশবচন্দ্র ও কেশবানুসারী তরুণ ব্রাহ্মদের প্রগতিবাদের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলা মধ্যপন্থী দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে দীর্ঘদিন সম্ভব হয় নি। স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ-বিবাহ, পানভোজন সম্পর্কে পুরাতন বিধিনিষেধ লঙ্ঘন, উপবীতহীন এবং অব্রাহ্মণ আচার্যদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রভৃতি নানা সংস্কার-প্রস্তাবকে অকস্মাৎ স্বীকার করে নেওয়া দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হল না। এই বিরোধের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম দ্বিধাবিভক্ত হল। মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজের

নাম হল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ও কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি যে নূতন সমাজ সংগঠিত করলেন তার নাম হল 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'।

নবগঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' জাতিভেদপ্রথা বর্জন, অসবর্ণবিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কারপ্রস্তাব কার্যকর করলেন। তাঁদের আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিন-আইন মতে একপ্রকার অসবর্ণ বিবাহ আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হল। ১৮৭৫ সালের প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে এবং ভক্ত কেশবচন্দ্র তাঁকে দেখে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে পড়েন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দও তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রচারেই কলকাতার শিক্ষিত সমাজ পরমহংসের বিষয় জানতে পেরেছিল। কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে এক বিচিত্র পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি দৈহিক কঠোরতা পালন, স্বপাকভোজন প্রভৃতি আরম্ভ করেন, হিন্দু দেব-দেবীর রূপক ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হন এবং ধর্মজীবনে নানা নূতন সাধনচিন্তা প্রদর্শন করবার চেষ্টা করতে থাকেন।

ব্রাহ্মসমাজের এ ধরণের পরিবর্তন সকলের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি এবং তার ফলে সমাজের মধ্যে নানা মতভেদ ও বিরোধ আরম্ভ হয়েছিল। তারপর আবার যখন ১৮৭৮ সালে আপন অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদের বিবাহের নিম্নতম বয়ঃক্রমসীমা সম্বন্ধীয় স্ব-প্রবর্তিত নিয়ম লঙ্ঘন করলেন তখন বিবাদ আরও জটিলতর হল। ক্রমবর্ধমান মতভেদের অনিবার্য ফলস্বরূপ অবশেষে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটল। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ব্রাহ্মনেতারা এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন এ বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ দেখিয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-এর সভ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের দলের নাম হল 'নববিধান'।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান

ধর্মে ও সমাজে যখন এইরকম আলোড়ন চলছিল তখন স্বাভাবিক নিয়মে বাঙলা সাহিত্য অচল বা স্থবির হয়ে থাকেনি। সেখানেও নূতন ভাঙ্গা-গড়ার পালা আরম্ভ হয়েছিল।

সাহিত্যে নূতন সুর—মধুসূদনের অভ্যুদয়

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) 'শর্মিষ্ঠা' নাটক বাঙলা নাট্য-রচনার বৈচিত্র্যহীন প্রবাহের মধ্যে প্রথম সার্থকতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হল।

'পদ্মাবতী' (১৮৬০) রচনার সময় মধুসূদন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) ও 'বীরাঙ্গনা'য় (১৮৬২) তা উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করল। বিপ্লবী কবি বাঙ্‌লা ছন্দকে পয়ারের চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধন থেকে প্রবহমানতায় মুক্তি দান করলেন। অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা মধুসূদনের রচনাকে নূতন মূল্যে অভিষিক্ত করেছিল। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে স্বাধীনতাপিপাসু বাঙালি তার হৃদয়ের মর্মভেদী হাহাকারের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। চিরাচরিত ধারণায় পরিপুষ্ট পৌরাণিক চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ নূতন জীবনবোধ, আদর্শ ও মানব-রসে উজ্জীবিত হয়ে 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি কাব্যে বাঙালি পাঠকের সামনে নবীনরূপ পরিগ্রহ করল। ভাষা, ছন্দ, প্রকাশভঙ্গি, চরিত্রচিত্রণ—সবকিছুর ক্ষেত্রেই শিল্পী বাঙালি পাঠককে 'নূতন পাত্রে পুরাতন সুরা পরিবেশন করলেন'।

দীনবন্ধু ও নীলদর্পণ

এই সময়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর এক বিপ্লবের সূচনা করেছিল দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯-১৮৭৩) 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক। নীলকরদের পৈশাচিক অত্যাচারে জর্জরিত বাঙ্‌লার চাষীর রক্তাক্ত জীবন এই নাটকে অদ্ভুত বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হল। নানাস্থান ও নানা মানুষ সম্বন্ধে লেখকের নিকট ও নিবিড় অভিজ্ঞতা 'নীলদর্পণ'কে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছিল। নীলদর্পণের মধুসূদন-কৃত ও পাদ্রী লং প্রকাশিত ইংরেজি তর্জমা বিলেতেও কি রকম আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকদের অজানা নেই।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অন্যদিকে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) মহাশয়ের মননমূলক আচার-প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে জাতির সেদিনের নানা সমস্যা আলোচিত হচ্ছিল। জাতির সমস্যা সম্বন্ধে লেখক পাঠক-সাধারণকে জিজ্ঞাসু অবহিত ও সচেতন করে তুলেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙ্‌লা সাহিত্য যখন মধুসূদন, দীনবন্ধু, ভূদেবের রচনার মধ্য দিয়ে নূতন শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে তখন বাঙ্‌লার চিন্তা ও সাহিত্যের ভূমিতে আর-এক মহৎ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিল; তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)। বঙ্কিম-এর আবির্ভাব বাঙ্‌লা সাহিত্যকে অকস্মাৎ কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত করল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হল এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।"—জীবনস্মৃতি।

বঙ্গদর্শনের পূর্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' (১৮৩১), অক্ষয়কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪), 'দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের' (১৮২০-১৮৮৬) 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), প্রভৃতি পত্রিকা তত্ত্ব ও মননের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মৌলিকতা এনেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্কিমের রচনায় রঞ্জনের সঙ্গে মননের, অনুভূতির সঙ্গে বুদ্ধির এমন একটা সামঞ্জস্য হল যা পূর্ববর্তীদের লেখায় দুর্লভ। বাঙ্‌লা ভাষা তাঁর হাতে নূতন শক্তি ও গতি লাভ করল।

বঙ্কিমের লেখনী—রঞ্জন ও মননের সমন্বয়

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটক, নূতন নূতন পত্র-পত্রিকার অভ্যুদয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও উপন্যাস প্রভৃতি এইসময় শিক্ষিতদের মনে একটা প্রবল ভাবের জোয়ার এনে উপস্থিত করেছিল।

বঙ্কিমের রচনায় এতো দিনের দীর্ঘপোষিত নানা পরস্পরবিরোধী চিন্তার দ্বন্দ্ব সৃষ্টিশীল প্রতিভার সংস্পর্শে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পাবার পথ খুঁজে পেল। চিন্তারাজ্যের নানা বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, সংস্কারবাদ ও পুনরুজ্জীবনবাদ সে সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বলয়ে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর গ্রন্থির সৃষ্টি করে চলেছিল। বঙ্কিমের ভাবনা ও মুখর লেখনীতে যুগের সে জটিলতা অধিকতর বাঙ্‌ময় হয়ে উঠল। পাশ্চাত্ত্য যুক্তি ও মননশীলতার প্রতি আগ্রহ এবং স্বদেশের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুগভীর মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ, এই দুই-এর দ্বন্দ্বে ও সমবায়ে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি যুগের মানসিকতাটিকে স্পষ্টতরভাবে পরিচেয় করে তুললো। তাঁর রচনায় এদেশের প্রাচীন ভাবনা, বিশ্বাস ও চরিত্রের যুগোপযোগী নূতন মূল্য অবধারণ, হিন্দু ধর্মকে বিশ্বধর্মের পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখার আগ্রহ সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর কৃষ্ণচরিত, ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থ ও উপন্যাসের নানা চরিত্র তার পরিচয় বহন করছে। একদিকে প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিমুখীনতা ও নবযুগের মানবমূল্যবোধ সম্বন্ধে সুগভীর আগ্রহ,—এই দুই আকর্ষণের মধ্যে স্রষ্টা বঙ্কিমের চিত্ত বার বার আন্দোলিত

বঙ্কিমের রচনায় যুগের জটিলতার শিল্প-রূপায়ণ—নৈয়ায়িক বঙ্কিম বনাম শিল্পী বঙ্কিম

হয়েছে। এই আন্দোলনের স্বচ্ছতর প্রকাশ ঘটেছে সেখানেই, যেখানে শিল্পী বঙ্কিম জীবনের সহজ ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছেন ; কারণ সেই ক্ষেত্রে নৈয়ায়িক বঙ্কিমের সঙ্গে শিল্পী বঙ্কিমের একটি দ্বন্দ্বও প্রকট হয়ে পড়েছে। তাই 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর প্রেম ও নগেন্দ্র-দেবেন্দ্র-হীরার প্রবৃত্তির তীব্রতা ও প্রবলতার ভূমিতে আদর্শবাদী বঙ্কিম বিষবৃক্ষকে মুকুলিত করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন কেমনভাবে সেই 'বিষবৃক্ষের ফল ফলিল'। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি। গ্রন্থশেষে আশা প্রকাশ করেছেন, 'বিষবৃক্ষ' শেষ হল এবং তার ফলে পাঠক-সাধারণের 'ঘরে ঘরে অমৃত ফলিবে'। কিন্তু সকল-কিছু সত্ত্বেও কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর মতোই কুন্দনন্দিনীর যে মানস-সত্যের সমস্যা সুবিপুল সহানুভূতির সঙ্গে গ্রন্থমধ্যে স্বীকৃত হয়েছে তার কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি ; এবং সেই অকারণে অভিশপ্ত জীবন-সত্যের বেদনাই সহৃদয় পাঠকচিত্তকে তীব্র নিবিড় কারুণ্যে ভরে তুলেছে।

বঙ্কিমসত্তার দ্বিধা—নৈয়ায়িক বঙ্কিম ও শিল্পী বঙ্কিম

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৩) উপন্যাসে প্রতাপশৈবলিনীর বাল্যপ্রেম অভিশপ্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছেন, 'বাল্যপ্রেমে বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে'। বিবাহিতা শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি যে প্রেম শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী হতে বাধ্য করেছে তা যে 'পাপ' এবং শৈবলিনী যে 'পাপীয়সী' তা উপন্যাসের খণ্ডগুলির নামকরণের মুহূর্তেই সর্বাগ্রে নৈয়ায়িক বঙ্কিম সুনির্দিষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং সেই পাপ ক্ষালনের জন্যে জীবৎকালেই শৈবলিনীকে দীর্ঘ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়েছেন। শৈবলিনী যে কায়িক পবিত্রতা হারায়নি তাও অবলুপ্তজ্ঞানা শৈবলিনীর মুখ দিয়ে ও নবাবদরবারে ফস্টরের মুখ দিয়ে অতিপ্রাকৃত উপায়ে বা যৌগিক বলের সাহায্যে স্বীকার করিয়ে নিয়ে লেখক একদিকে গ্রন্থমধ্যে যেমন নায়ক চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য পাত্র-পাত্রীকে নিশ্চিন্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি দেহসর্বস্ব পবিত্রতার সুনির্দিষ্ট সংস্কারে অভ্যস্ত সেদিনের পাঠকসাধারণকেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ দিয়েছেন। অবশ্য তার সঙ্গে সুদীর্ঘকাল প্রবল কষ্টসাধ্য ব্রত-আচরণ ও তপস্যা, নিয়ত পতি-ধ্যান ও প্রচুর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে শৈবলিনীর চিত্তের পরিশুদ্ধি অর্জনের চিত্রও তিনি সবিস্তারে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এতো সুচির প্রয়াসসাধ্য পরিশুদ্ধি-অর্জনের

বিস্তৃত পরিচয়ের পরও যখন উপন্যাসের শেষে আমরা শৈবলিনীকে প্রতাপের উদ্দেশ্যে কাতরভাবে বলতে শুনি—

"স্বামী যদি আমায় পুনর্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয় ?"

অথবা—

"আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।·········যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না"—

তখন পবিত্রতালাভের জন্য এই প্রবল কৃচ্ছ্রসাধনার তাৎপর্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের সংশয়ান্বিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক; কারণ শৈবলিনীর এই উক্তিই প্রমাণ করে দেয় যে, গঙ্গার বুকে প্রতাপকে স্পর্শ করে যে নারী একদিন প্রতাপকে বিস্মৃত হওয়ার কঠিন নির্মম শপথ করে উচ্চারণ করেছিল "আজি হইতে তোমাকে ভুলিব।···আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"—সেই নারী-সত্তা নির্মম শপথ উচ্চারণ ও তার পরবর্তী দীর্ঘ উন্মত্ততা ও প্রবল কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যেও প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নি। সকল শপথ ও অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রবলতর জীবন-ধর্মের কাছে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আনন্দমঠ (১৮৮০-১৮৮২) উপন্যাসেও এই ভাবটি দুর্লভ নয়। আনন্দমঠে সন্তানদের স্বাজাত্যবোধ ও ব্রতনিষ্ঠার মহনীয়তা অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল আদর্শবাদিতা ও রণোন্মাদনার ঘনঘটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে একটি সুর বার বার সমগ্র উপন্যাসখানিকে আলোড়িত করে তুলেছে—"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?" 'আনন্দমঠ'-এর আর সকল আবেদনকে স্বীকার করে নিয়েও জীবানন্দ-ভবানন্দের চরিত্রের দৃঢ় আদর্শবাদ ও নিষ্ঠার ধাতব কাঠিন্য কেমন ভাবে এই প্রবলতর জীবনধর্মের কাছে গৌণ হয়ে গেছে তারই স্বীকৃতি কি উপন্যাসখানিকে অন্যতম মহৎ মর্যাদা ও মূল্যে অভিষিক্ত করে নি ?

বঙ্কিমের কোনো ঔপন্যাসিক কৃতির অবধারণ উপরের আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। একদিকে বিধিবদ্ধ আচার, ধারণা ও আদর্শবাদিতার প্রতি আসক্তি, অন্যদিকে জীবন-ধর্মের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি ও মানব-সত্তার মূল্যবোধ—এই

দুই বিপরীত আকর্ষণে দ্বিধান্বিত সেদিনের যুগমানসিকতাটি কেমনভাবে যুগচিন্তার বিশিষ্ট প্রতিভূ একটি সৃষ্টিশীল প্রতিভার সংশয়ের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছিল তারই যৎসামান্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এর মধ্যে।

উনিশ শতকের বাঙালির সাধনায় বঙ্কিমের আরও দুটি বড়ো দান হল, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশসেবার মন্ত্রটিকে দৃঢ়তর ভাবে স্বদেশবাসীর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের সুরটির সঙ্গে বাঙালি মনের পরিচয় ঘটানো। সার্থক সাহিত্যরস সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের লেখনী বাঙ্‌লার ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত করেদিয়েছিল 'বন্দেমাতরম্'-এর উজ্জীবন মন্ত্র। 'বঙ্গদর্শন' শুধু বাঙালির হৃদয় লুঠ করেই ক্ষান্ত হয় নি, জাতির হৃদয়কে তা সমূহরূপে উদ্বোধিত ও সঞ্জীবিত করে তুলেছিল নূতন যুগের মাতৃমন্ত্রে। সে মা হলেন সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা রিপুদলবারিণী দেশমাতৃকা। সন্তানদের চিত্তশতদলে স্বদেশমাতার চিন্ময়ী মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও সেই পূজার উদ্বোধনমন্ত্র উচ্চারণ তথা স্বদেশসেবার সঙ্গে অধ্যাত্ম-জীবনের সেতুবন্ধনের কৃতিত্ব সেদিন নিশ্চিতরূপে ঋষি ঋত্বিক্ বঙ্কিমের। তাই ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সন্ন্যাসীরা বহুল পরিমাণে আদর্শায়িত হয়ে 'আনন্দমঠের' সত্যাশ্রয়ী, সুকঠোরব্রতনিষ্ঠ, স্বদেশসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ আত্মিক্ সম্পদে প্রবল শক্তিশালী সন্তানদলে পরিণত হয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের দেবী চৌধুরাণী বা ভবানী পাঠক প্রভৃতি চরিত্রও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমের চিন্তায় স্বাদেশিকতা ও সাম্যবাদ

বন্দেমাতরম্-মন্ত্র ও স্বদেশের মাতৃমূর্তিকে দেশবাসীর চিন্তায় ও তপস্যায় সুমহৎ আদর্শে মুদ্রিত করার কৃতিত্ব দ্বিধাহীন ভাবে যেমন ঋষি বঙ্কিমের, তেমনি ব্যাপকতর চিন্তাপ্রবাহের পটভূমিকায় বিচার করলে সেদিন সুদূরের নবজাতক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বাঙালির সামান্য শীর্ণ পরিচয়টুকু সংঘটিত করার প্রথম প্রয়াসও বোধ হয় তাঁরই। 'সাম্য' প্রবন্ধ ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর কোনো কোনো অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমের রচনায় স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটবার বেশ কিছু পূর্বেই কিন্তু বাঙালির চিত্তে তার সূচনা দেখা দিয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক, কারণ সার্থক সহৃদয় সাহিত্যিকের মর্মলোকে জাতির নাড়ি-স্পন্দনের অনুরণন অবশ্যম্ভাবী।

সিপাহীবিদ্রোহ (১৮৫৭), নীলকরদের পৈশাচিক অত্যাচার ও নীল বিদ্রোহ, বাঙলার প্রত্যন্তদেশে সাঁওতাল বিদ্রোহ—প্রভৃতি ঘটনাবলীর উত্তেজনা ও আলোড়ন অনেক পূর্বেই বাঙলার জড় সমাজের মূলে নাড়া দিয়েছিল,—সে সময়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৪-১৮৬১) মনস্বিতা ও সাংবাদিকতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হিন্দুপেট্রিয়ট (১৮৫৫ খ্রীঃ—হরিশচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদনাভার গ্রহণ) নামে ইংরেজি সাপ্তাহিকে অগ্নিবর্ষী লেখনী চালিয়ে তিনি দেশের কথা জনসাধারণ ও বিদেশী শাসকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর লেখনী লর্ড ডালহৌসির অযোধ্যাধিকারের সময় অগ্নি উদ্গীরণ করেছিল, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ক্যানিং-এর পৃষ্ঠপোষক হয়ে দেশে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিল ও দেশের সাধারণ মানুষকে সেদিনের রাজরোষ থেকে মুক্তি পেতে অনেকাংশে সহায়তা করেছিল, আবার নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাতেও কুণ্ঠিত হয় নি। হরিশচন্দ্রের সাংবাদিকতাই যে দীনবন্ধু মিত্রকে 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক রচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল তার ঐতিহাসিক নিদর্শন দুর্লভ নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে হরিশচন্দ্রের বিপ্লবী সাংবাদিকতাই সাহিত্যভাষ্য লাভ করেছিল দীনবন্ধুর লেখনীতে। কৃষ্ণনগরের কৃষককন্যা হরমণি Kulchikatta-র কুঠির ছোট সাহেব Archibald Hills-এর দ্বারা অমানুষিকভাবে অত্যাচারিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্র নারী-নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন তাঁর সংবাদপত্রের পাতায়। Rev. Bowmetsch নীল-কমিশনে তাঁর সাক্ষ্যে এ কাহিনী বিবৃত করেন। সে-ঘটনাই মর্মস্পর্শী শিল্পরূপ লাভ করেছে 'নীলদর্পণে' ক্ষেত্রমণির কাহিনীতে। হরিশচন্দ্রকে এর জন্যে নীলকরদের তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং মানহানির অভিযোগে বিচারের কাঠ্‌গড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। তাঁর শেষ জীবন বিড়ম্বনায় ও উৎপীড়নে জর্জরিত। কিন্তু পীড়নের ভীতি সাংবাদিক হরিশচন্দ্রের সৈনিকবৃত্তি ও যোদ্ধ মনোভাবকে নির্জিত করতে পারে নি।

উনিশশতকে স্বদেশ-চিন্তার উদ্বোধনের পটভূমি

সাংবাদিক হরিশচন্দ্র ও হিন্দুপেট্রিয়ট

স্বদেশিকতার এক বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল 'ন্যাশন্যাল পেপার' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠায়। দেশের সকল বিভাগের সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ মেলার যোগ ছিল শিবনাথ শাস্ত্রী এ সম্বন্ধে লিখেছেন

"বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা, কারণ সেই যে বাঙালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।

—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।
নিউ এজ ১ম সং পৃঃ ২৫৭।

১৭৮৮ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র এর সহকারী সম্পাদক। স্বদেশীয় সাহিত্য সঙ্গীত, শিল্প, স্বাস্থ্যচর্চা প্রভৃতি সকলকিছুর পুনর্বিকাশে উৎসাহদানের সাহায্যে জাতীয় স্বাবলম্বন-বৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করে তোলাই ছিল এই মেলার উদ্দেশ্য। সেকালের বহু মনীষীর উৎসাহ ছিল এর পিছনে। ঠাকুর বাড়ির অনেকে এ বিষয়ে উৎসাহের সঙ্গে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা' সম্বন্ধে বলেছেন:

হিন্দুমেলা

"ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই হিন্দু মেলার দশম বার্ষিক উৎসবে (১৮৭৬ খ্রীঃ) বালক রবীন্দ্রনাথ একটি জ্বালাময়ী কবিতা পাঠ করেছিলেন। তখন দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে লর্ড লিটনের প্রেস্ অ্যাক্ট্ আইন বলবৎ থাকায় সে কবিতা কোনো সাময়িক পত্রিকায় স্থান পায় নি। কিছু পরিবর্তন করে সেটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে মধ্যযুগীয় বীরের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিবৃত করা হয়েছিল। এই কবিতাপাঠের উল্লেখও 'জীবনস্মৃতি'তে আছে (পৃঃ ১৪৭)।

জাতীয়ভাবোধের জাগরণের ইতিহাসে আর একটা বড়ো ঘটনা হচ্ছে আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) প্রভৃতির নেতৃত্বে ভারতসভার প্রতিষ্ঠা (ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ১৮৭৬)। দেশের যুবসমাজকে রাজনীতি ও আন্দোলন শিক্ষা দেওয়া ও স্বাজাত্যবোধে অনুশীলিত করা ছিল এ সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। দেশের সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী অংশের চেতনায় এ এক নূতন বিপ্লবের অঙ্কুর তাতে সন্দেহ নেই। সম্মিলিত ও সংগঠিতভাবে ব্যাবহারিক রাজনীতির অনুশীলনেও এটি নবীন পদক্ষেপ। পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল জাতীয় মহাসমিতি (Indian national congress) স্থাপনের বীজ-ও সেদিনের এই প্রয়াসের মধ্যেই সুপ্ত ছিল (১৮৮৫?) একথা আজ সকলেরই জানা।

১৮৭৮ সালের পর থেকে এদেশে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের একটি আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সনাতনধর্ম প্রচার ও কর্মোৎসাহ এবং পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুশাস্ত্রের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি যেমন একদিকে এই পুনরুজ্জীবনবাদের আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির মতো মনীষীদের চিন্তাও সনাতন-ধর্মকে বিশ্বধর্ম ও মঙ্গলধর্মের পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। আচার-জর্জরিত হিন্দুধর্মকে বিচার ও যুক্তির পরিশোধনে আবর্জনা ও মালিন্যমুক্ত করে আদর্শায়িত ভূমিতে প্রতিষ্ঠাদানই ছিল শেষোক্ত প্রয়াসের লক্ষ্য।

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন-প্রয়াস—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র

অন্যদিকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রথমে বোম্বাই নগরে (১৮৭৫), ও পঞ্জাবে (লাহোর নগরে, ১৮৭৭) 'আর্য সমাজের' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থানের উদ্দেশ্য নিয়ে। কর্ণেল আলকট্ ও মাদাম ব্লাভাস্কির (Hebna petrovna Blavatsky) চেষ্টায় বোম্বাই সহরে স্থাপিত হয়েছিল 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'।

আর্য সমাজ, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি

এদিকে বাঙলার বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৩-১৮৮৬)। তাঁর লোকোত্তর চরিত্র ও প্রবল আকর্ষণী ক্ষমতা একসময় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির মতো সেদিনের চিন্তা-বিদ্‌দেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এ কথা সকলেরই জানা। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র ও পুরাণাদির চিন্তাধারাকে আপন জীবনে প্রয়োগ করে তার সত্যতা ও সারবত্তাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াস সেদিনের পুনরুত্থানবাদের আন্দোলনে একটি শক্তিশালী সংযোজন। তার সঙ্গে তাঁর 'যত মত তত পথ' বাণী যুগোপযোগী ও যুগ-প্রয়োজনীয় পরমত-সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়-ধর্মিতার সুরটিকে বহন করে নিয়ে এল। যুগের নানা বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় সংগঠনশীল চিন্তার জাগরণে এই সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের বাণীর-ও নিশ্চয়ই একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বাঙলার ধর্ম ও সমাজ জীবন যখন এইভাবে নানা বিপরীতমুখী সংস্কার-আন্দোলনে আলোড়িত হচ্ছে, বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র যখন বঙ্কিমের

'বঙ্গদর্শন'-এর আত্মপ্রকাশের পর নূতন প্রাণবন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, বাঙ্‌লার জাতীয় জীবন যখন 'হিন্দুমেলা' 'ভারতসভা' প্রভৃতি স্থাপনার মধ্য দিয়ে স্বাজাত্যবোধের মন্ত্রে নূতন করে দীক্ষা লাভ করছে,—এমনসময়ে জাতীয় চিত্তের জাগরণের ত্রিবেণী-সংগমে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রায় একই কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। সেদিন সংস্কার-পুনরুজ্জীবন-সমন্বয়-মানবতাবোধ-সমাজতন্ত্র প্রভৃতি আদর্শ অবলম্বন করে নানা বিচিত্র চিন্তাধারা ও আন্দোলন নানা ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে জাতীয় জীবনে যে বিভিন্ন সংঘাত আবর্ত ও আলোড়নের সৃষ্টি করে চলেছিল, সেগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত এই দুই যুগপুরুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে বিচিত্রতর সামঞ্জস্য, ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য লাভ করে জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ সৃষ্টিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দুই চিন্তানায়কের চিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে সে তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারস্পরিক প্রত্যক্ষ-পরিচয়ের সম্ভাব্যতা এবং পারিবারিক প্রতিবেশ ও পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, উভয়েরই আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। দুজনের জন্মের কালগত ব্যবধান খুবই অল্প। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯৬১, বিবেকানন্দের ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

উভয়েই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসে উভয় পরিবার এক ছিল না। একটি ছিল ব্রাহ্ম, অপরটি হিন্দু। একজন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্র-নাথের কনিষ্ঠ পুত্র, অপরজন সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ সন্তান। বিবেকানন্দের তখন নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। উভয় কলকাতা মহানগরীর সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তর কলকাতার প্রায় এক পাড়াতেই ; তবু উভয়ের কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতার সুস্পষ্ট কোনো নজির পাওয়া যায় না, যদিও এই ঘনিষ্ঠতা না ঘটাই ছিল অস্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'দুই মনীষী' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে উভয়ের সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে যে অনুমান ও মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ-এর সম্ভাব্য পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ-সুবিধা

"রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্র নরেন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আসতেন। সেকালের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র সঞ্জীবনীর সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। তাঁর বিবাহ হয়েছিল রাজনারায়ণ বসুর কন্যার সহিত। এই মহিলার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, তাঁদের সেই বিবাহ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি সঙ্গীত গাওয়া হয় এবং বিবেকানন্দ স্বয়ং তা গেয়েছিলেন। রবীন্দ্র-নাথ তখন ছিলেন তরুণ উদীয়মান কবি। আর বিবেকানন্দ তখন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, প্রতিভাদীপ্ত তরুণ যুবক। সঙ্গীতে ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। সুগায়ক হিসেবে কিছু খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছিলেন। এই সূত্রেই রবীন্দ্র-নাথ রচিত গানগুলি গাইবার ভার পড়েছিল তরুণ গায়ক নরেন্দ্র নামে পরিচিত বিবেকানন্দের উপর। সেই উপলক্ষ্যে তাঁরা নিশ্চয়ই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।" পৃঃ ১৭৮। ১ম সং।

ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠতার সবচেয়ে প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ বিবরণ মিলতে পারে বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু দ্বিপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী রাজা রামমোহনের নাতনীর মেয়ে হেমলতা ঠাকুরের (বড়মা) স্মৃতিকথার মধ্যে। বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের যুক্ত উদ্যোগে ১৯৬৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি পুরী গৌরবাটিশাহি সমুদ্রতীরে তাঁকে যে শ্রদ্ধার্ঘ দেওয়া হয় সেই শ্রদ্ধার্ঘ উৎসবে তিনি যে প্রতিভাষণ দেন সেই স্মৃতিকথা 'পুরোনো কথা' শিরোনামে দেশপত্রিকায় (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রতিভাষণের কিছু অংশ এই সূত্রে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"আমার স্বামী আর স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বাল্যবন্ধু ; একই সঙ্গে এঁরা জেনারেল অ্যাসেম্বলি স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। সন্ন্যাসধর্ম নেওয়ার আগে তিনি প্রায়ই আমার স্বামীর কাছে আসতেন, কিন্তু পরে দেখা-সাক্ষাৎ হতো মধ্যে মধ্যে। এনট্রান্স পাশ করে স্বামী আর পড়লেন না, বিবেকানন্দ কলেজে ভর্তি হলেন। বিবেকানন্দ বাল্য বয়সে আমার স্বামীর কাছে এসেছেন, তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি—সে আমি দেখিনি কিন্তু পরে বিবেকানন্দ আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসেছেন, পরনে গেরুয়া বসন, মাথায় পাগড়ি। আসতেন মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে। আলাপ আলোচনা করে চলে যেতেন।·····

"আমার মনে আছে, শিকাগো পার্লামেণ্ট অফ্ রিলিজিয়ন থেকে ফিরে এসেই বিবেকানন্দ জোড়াসাঁকোতে এসে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করেন।"—শ্রী-রামকৃষ্ণের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ও পরস্পরের গভীর আকর্ষণের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাও তিনি তাঁর স্মৃতিকথার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন এবং তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, উভয়ের এই আকর্ষণ শেষদিন পর্যন্ত অর্থাৎ মহর্ষির তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠতার প্রসঙ্গে ১৩৬৮ সালের মাঘ সংখ্যার 'উদ্‌বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত ডক্টর কালিদাস নাগের 'বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ' নামক প্রবন্ধে এবং ১৩৭০ সালের ফাল্‌গুন মাসের 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধেও বিস্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী হেমলতা ঠাকুরের ('বড়মা') স্মৃতিকথা পাঠ করে নরেন্দ্র-রবীন্দ্রের পরিণত বয়সে অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হওয়ার পর

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি মাত্র। 'দেশ' পত্রিকায় (৩৫ বর্ষ, সংখ্যা ৬, শনিবার ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৭, বাঙলা ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের লেখা "নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য উত্থাপন করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি মিস্ ম্যাক্লিয়ড্‌কে লেখা ভগ্নী নিবেদিতার একটি পত্র থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দেব সাক্ষাৎ পরিচয় সম্পর্কিত তথ্য

বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতার সঙ্গে ঠাকুর পরিবার, ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ও সৌহার্দ্যের প্রসঙ্গ মোটামুটিভাবে আমাদের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। বিবেকানন্দের জীবৎকালেই নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সূচনা। বিবেকানন্দের তিরোধানের পরও তা অটুট ছিল। সময়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও দেখা সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে সে বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয়েছিল। ভগ্নী নিবেদিতা,

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র ও কবি রবীন্দ্রনাথ একদা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অবশ্য বিজ্ঞানাচার্যের পত্নী অবলা বসুর নামও এই বন্ধুগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যরূপে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার অনুরাগিণী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট গল্পের ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে 'কাবুলিওয়ালা' একদা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

নিবেদিতা স্বাভাবিকভাবেই এক সময় ব্রাহ্মদের চিন্তা ও ঔৎসুক্যকে বিবেকানন্দের কর্মপ্রচেষ্টার দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপক বসু প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই জন্যেই তিনি সরলা

ব্রাহ্মদের চিন্তা ও ঔৎসুক্যকে বিবেকানন্দ-মুখী করবার জন্যে নিবেদিতার প্রয়াস :— চা-এর আসর

ঘোষাল, মোহিনী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাদি করতে তৎপর হয়েছিলেন ও সেই উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক চা-চক্রের আয়োজন করতে চেষ্টা করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক চা-চক্র অনুষ্ঠিত না হলেও শেষ পর্যন্ত এক ঘরোয়া চা-চক্রের আয়োজন হয়েছিল এবং ব্রাহ্ম নেতৃগোষ্ঠীর সঙ্গে

সেদিন রবীন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই আসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোরম চড়া স্বরে তিনটি গান গেয়েছিলেন। সেগুলির অন্ততঃ একটি ('এসো শান্তি') তিনি ঐদিনের উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে রচনা করেছিলেন।

এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য মোটেই সাধিত হয় নি তা বলাই বাহুল্য। পরবর্তীকালের ইতিহাসই তার প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সে প্রসঙ্গ অবতারণার প্রয়োজন নাই। আমরা অধ্যাপক বসু প্রদত্ত বিবরণ থেকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চা-এর আসরে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা জানতে পারি। তিনি নিবেদিতার মিস্ ম্যাক্লিয়ড্‌কে লেখা (৩০ জানুয়ারী ১৮৯৯) যে পত্রাংশটি তথ্য হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন তা আমরাও উদ্ধৃত করছি:

মিস্ ম্যাক্‌লিয়ড্‌কে লেখা নিবেদিতার পত্র

"He is just divine. Almost every day I take a meal with him and yesterday he came to the party. On saturday also I had a sort of unarranged party. Mrs. P. K. Ray and young Mr. Mukherji, Mr. Mohini and the poet and presently Swami with Dr. Sirkar. It was quite a brilliant little gathering for Mr. Tagore sang 3 of his own composition in a lovely tenor, and Swami was lovely······

At this moment the evensong gongs and bells are sounding in the hours all round me. It is the hour that they call 'candle light'—the hour of worship—I cannot forget the lovely poem 'Come O Peace' (Escho Santi)—with its plaintive minor air that Mr. Tagore composed and sang for us the other day at this time."

এই তথ্য উদ্‌ঘাটনের পর অনিবার্যভাবে যে প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দেয় তা হল, ঐ আসরে রবীন্দ্রনাথ কি বিবেকানন্দের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন? এ সম্বন্ধে আমরা অধ্যাপক বসুর মন্তব্যই উদ্ধৃত করছি:

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ কোনো আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এরূপ প্রমাণ অনুপস্থিত

"এই চা-পান সভায় 'মহাসিংহের প্রদর্শনী' উত্তমভাবে হয়েছিল সন্দেহ নেই, নিবেদিতা সংক্ষেপে তা জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের গানেও তিনি অভিভূত, কিন্তু বিবেকানন্দ বাঙ্‌ময় থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন?

বলা শক্ত সেই সভায় আলোচ্য বিষয় কি ছিল, আলোচনায় কে কে অংশ নিয়েছিলেন, নিবেদিতা সে কথা বলেন নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিবেদিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার যে রকম অনুরাগিণী হয়েছেন, তাতে মনে হয়, সৌজন্য বিনিময়ের অতিরিক্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলে তিনি নিশ্চয় লিখতেন। এখানে একটি কথা জানানো যায়, ঠাকুরবাড়ি বা ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশার সংবাদ নিবেদিতা মিসেস্ ওলিবুল্‌কে বেশি লিখতেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁকে লেখা কোনো চিঠি আমরা পাইনি।”

রবীন্দ্রনাথ কি নিবেদিতার কাছে স্বামীজী বিষয়ে কোনো উক্তি কখনো করেছিলেন? এ বিষয়ে অধ্যাপক বসুর বক্তব্য :

“রবীন্দ্রনাথ নীরব ছিলেন, হয়তো নীরব থাকতেই চেয়েছিলেন, অন্তত নিবেদিতার কাছে স্বামীজীর বিষয়ে এমন কিছু বলেন নি যা তিনি মিস্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে চিঠিতে লেখা প্রয়োজন মনে করেছেন।”

রহস্যময় নীরবতা

নিবেদিতার সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁর সম্মুখে স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা কি রহস্যজনক নয়? এই নীরবতার চেয়ে সোচ্চার আর কি হতে পারে! দুই যুগপুরুষের পরস্পরের সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা এই সকল তথ্যাদি থেকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় অনুমান নির্ভর

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সান্নিধ্যের প্রত্যাশা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক হলেও এই বিষয়ে আমাদের কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করতেই হচ্ছে, কারণ এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেন নি। তাছাড়া প্রথম যৌবনে এই ঘনিষ্ঠতার কথা অথবা পরবর্তীকালে উভয় চিন্তা-নায়কের কর্মসাধনার মধ্যে সংযোগ সম্পাদনে ভগিনী নিবেদিতার সচেতন প্রয়াসের প্রসঙ্গ স্বীকার করে নিলেও কালের অগ্রগতির সঙ্গে তা যে কোনো স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে নি তা আমরা সকলেই জানি। বরং পরবর্তীকালে উভয়ের পরস্পরের সম্পর্কে রহস্যময় নীরবতা আমাদিকে কিছুটা বিস্মিত করে। হয়তো পরবর্তীকালে উভয়ের বাস্তব যোগসূত্রের অভাব ও পরস্পরের মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সংশয় দুজনকে সমীপবর্তী হতে বাধা দিয়েছিল। অথচ প্রত্যক্ষতঃ দুই বিপরীত ধ্যান-ধারণায় দীক্ষিত দুটি আত্মা সাধন-জীবনের সমাপ্তিতে যে উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য খুঁজে

পাওয়া কঠিন। সেখানে দুই ভারতপথিক চিরন্তন মানবসত্যেই উপনীত হয়েছেন, মানবাদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

উভয়ের বংশানুক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ছিলেন যেমনি ধনী তেমনি বিলাসী। আয় করতেন অজস্র, ব্যয়-ও করতেন দুহাতে। ইংরেজ বণিক ও রাজপুরুষেরাও তাঁর বাগানবাড়ির জল্‌সায় নিমন্ত্রণ পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকতো। খানা-পিনা ও নাচগানের এলাহি আয়োজন ছিল সেখানে। বিলাতে বেড়াতে যান; সেখানে তাঁর দান-খয়রাত দেখে লোকে তাঁকে 'প্রিন্স্' আখ্যা দিয়েছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাচরণ প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করবার কিছুদিন পরেই সন্ন্যাস নিয়ে সম্পূর্ণভাবে সংসার ত্যাগ করেছিলেন।

দুর্গাচরণ

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় ঠাকুর পরিবার প্রাচীন হিন্দুধর্মের অধিকাংশ সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের (১৮৪৩) পর থেকে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে যুগান্তর এসেছিল। আচার-অনুশাসন-ক্রিয়া-কর্ম সবই সেখানে বিরল হয়ে উঠেছিল। সে যুগের ধনী হিন্দু গৃহের বারো মাসে তেরো পার্বণ, পূজা, উৎসব সকলই দেবেন্দ্রনাথ বন্ধ করে দেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই তাঁর পরিবার 'সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি।' (অবতরণিকা। রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড)। প্রায় পূর্বসংস্কারহীন পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এ পরিবারে। উনিশ শতকে বাঙ্‌লার প্রগতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ঠাকুর বাড়ি। সে বাড়ির আবহাওয়া ছিল সাহিত্য-গান-অভিনয় প্রভৃতি আনন্দ কোলাহলে ভরপুর। দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা, দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনা, সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন—সবকিছু মিলে সেদিন ঠাকুর পরিবার সাধারণ সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবার থেকেও অনেকখানি স্বতন্ত্র ছিল।

নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন কলকাতা উচ্চ আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণি। ইংরেজি ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, আয় করতেন প্রচুর, ব্যয় করতেন অত্যন্ত বেশি, সঞ্চয় করতেন না কিছুই।

নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তের অধিকারী এই মানুষটি গান ভালো জানতেন, কবিতা অত্যন্ত ভালবাসতেন; এবং যতদূর জানা যায় জীবনকে তিনি ভোগের আদর্শেই গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান সমাজের আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল বলে শোনা যায়। ধর্মকে তিনি জীবনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন অথবা বিশিষ্ট কোনো ধর্মাচরণের প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল এমন কোনো সুস্পষ্ট নজির নেই। কিন্তু তাহলেও তিনি ধর্মে ও আচরণে হিন্দু ধর্মেরই অন্তর্গত ছিলেন, হিন্দু ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েন নি। মাতা ভুবনেশ্বরী চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে ছিলেন অনন্যসাধারণ, কর্মে ছিলেন সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। ধর্ম বিশ্বাসে তিনি ছিলেন পুরোপুরি হিন্দু। হিন্দু মেয়েদের সংস্কার আছে, ইষ্টদেবতার কাছে মানত করলে মনোমত সন্তান পাওয়া যায়। কথিত আছে, ভুবনেশ্বরী বিশ্বেশ্বরের কাছে পুত্রকামনায় মানত করেছিলেন। প্রসন্ন বিশ্বেশ্বর স্বপ্ন দেন, তিনি তাঁর গর্ভে সন্তান হয়ে আসছেন। যথাসময়ে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে 'ভৃত্যরাজতন্ত্রের অধীনে'। ধনীগৃহের শিশুরা সাধারণতঃ ঝি-চাকরের হাতে মানুষ হত, এটাই ছিল সে সময়ের রেওয়াজ। বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী মা সারদা দেবী সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তার ফলে মা-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের নিবিড় সংযোগ ঘটবার অবকাশ অল্পই এসেছিল। তাছাড়া, তিনি কৈশোরেই মাতাকে হারিয়েছিলেন (১৮৭৫)।

বিশ্বনাথ দত্ত

ভুবনেশ্বরী দেবী

নরেন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান হলেও মা-এর সঙ্গে তাঁর জীবনের সংযোগ ঘটেছিল নিবিড় ভাবে। মা-এর সাহচর্য ও স্নেহের প্রভাব তাঁর উপর গভীরভাবে পড়েছিল এবং মা-এর ব্যক্তিত্ব তাঁর পরবর্তী জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল একথা তাঁর জীবনীকার মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

নরেন্দ্রের জীবনে মাতৃপ্রভাব

পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ যে দুই পরিবারের সন্তান ছিলেন তাদের মনোভাব ও বিশ্বাসের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেকখানি। তবে উভয়ের মধ্যে একটা মিলও ছিল। দুজনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন বংশে যাদের সম্পূর্ণ গোঁড়া বা সনাতনপন্থী বলা যায় না। তাছাড়া দুজনেরই পূর্বপুরুষেরা ইংরেজি শিক্ষা ও য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা ও ধর্মচিন্তা রবীন্দ্রনাথের উপর

গভীর প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় ধর্ম সম্বন্ধে যে গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন সেটি 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে সুপরিচিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, বাঙ্‌লা গদ্যের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের দান স্বল্প হলেও নগণ্য নয়। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় তাঁকে 'বাঙ্‌লা গদ্যের একজন প্রথম ভালো লেখক' বলে উল্লেখ করেছেন (বাঙলা সাহিত্যের কথা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ২১১)। তাঁর 'আত্মচরিত' ও 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে ভাষার প্রসাদগুণ ও আন্তরিকতা কোনোটিই বিরল নয়। 'ব্রাহ্মধর্ম' পুস্তকটি থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মচিন্তার অনেক উপকরণই সংগ্রহ করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে বলেছেন :

ব্রাহ্মধর্ম। রবীন্দ্র-জীবনে পিতৃপ্রভাব

"৭ই পৌষ হল দেবেন্দ্রনাথের জীবনের পুণ্য দিন; সেদিন তিনি তাঁর সত্যধর্মকে পেয়েছিলেন, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আর, সেদিনটা রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ছিল তেমনি পবিত্র—জীবনের শেষ সাতুই পৌষ পর্যন্ত এই দিনটি তিনি স্মরণ করেছেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থটি ছিল কবির নিত্যসঙ্গী, তাঁর সাধক-জীবনের আশ্রয়—সেখান থেকে পেতেন তাঁর অধ্যাত্মজীবনের শক্তি ও সম্বল, আনন্দ ও বীর্য"।

—রবীন্দ্রজীবন কথা ১ম সং। পৃঃ ৬।

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থখানির উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

"এই 'ব্রাহ্মধর্ম' বইখানি যে কেবল হিন্দুর ধর্মচিন্তার উৎকৃষ্ট সংগ্রহপুস্তক তা নয়, বিশ্বধর্মের ভূমিকা-রূপেও তাকে গ্রহণ করতে কারও বাধা না হতে পারে"।

—'রবীন্দ্র জীবন কথা'। পৃঃ ৬।

প্রকৃত প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনা ও ঠাকুর বাড়ির সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত-সাধনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যদিয়ে অসীম ব্যাপ্তি ও সুবিপুল তাৎপর্য লাভ করে পূর্ণতা পেয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথও জন্মসূত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনজীবী পিতা বিশ্বনাথের কাছ-থেকে একদিকে যেমন লাভ করেছিলেন তীক্ষ্ণ বিচারবোধ ও যুক্তিশীলতা, অন্যদিকে তেমনি পেয়েছিলেন তাঁর স্পর্শকাতর তীব্র অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত ও সঙ্গীতের উপর অধিকার। মাতার ব্যক্তিত্ব ও ধর্মপ্রাণতার প্রভাবও তাঁর উপর কম ছিল না। পিতামহ দুর্গাচরণের তীব্র সংসার-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবৃত্তি

নরেন্দ্রের চরিত্রে সম্ভাব্য নেপথ্য পারিবারিক প্রভাব

অলক্ষ্য-গোপনে তাঁর রক্তে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল কি না, কে বলতে পারে?

বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। বিদ্যালয়ের নিয়মিত লেখাপড়ায় রবীন্দ্রনাথ বেশিদূর অগ্রসর হন নি, একথা সকলেরই জানা। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি ছিলেন 'ক্লাসে না ওঠা ছেলে'। বালককে ধরাবাঁধা পুঁথি পড়ানোর সকল পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি স্বদেশে সকল চেষ্টা অসার্থক হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জনের জন্যে তাঁকে বিলেতেও পাঠানো হয়েছিল (১৮৭৮)। কিন্তু সে প্রয়াসও সফল হয় নি। বিদ্যায়তনের চার দেওয়াল সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন অসহিষ্ণুতা। আনন্দবর্জিত এই শিক্ষার বন্দীশালা সম্পর্কে তাঁর প্রতিকূল মনোভাব পরবর্তী জীবনের নানা লেখাতে ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য বাড়িতে শিক্ষার ক্ষেত্রে চিত্তের 'সর্বোদয়ের' ব্যবস্থার বিরাম ছিল না। সেজদা হেমেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। সে শিক্ষার আসরে বাঙ্‌লা-ইংরেজি-গণিত-ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে শুরু করে কুস্তি, জিমনাষ্টিক, ড্রইং, সঙ্গীত পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে নি।

ছাত্রজীবনে নরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারলেও, ছাত্র হিসাবে স্কুল বা কলেজে কোথাও তাঁকে নিতান্ত সাধারণের কোঠাতে ফেলা যেতো না। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, জিজ্ঞাসু চিত্ত ও ব্যক্তিত্ব সকল সময়ে অধ্যাপকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। স্বাস্থ্যচর্চা বা সঙ্গীত-নৈপুণ্য কিছুতেই তিনি পিছিয়ে ছিলেন না।

এক বিষয়ে অবশ্য বিদ্যার্থী রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের একটা বড়ো মিল ছিল। উভয়েই পাঠ্য বই-এর চেয়ে বাইরের বই পড়তে বেশি ভালোবাসতেন। পাঠ্য বই-এর নিরূপিত তালিকা উভয়েরই বৃহৎ মনের পক্ষে এতো সঙ্কীর্ণ ছিল যে, তা তাঁদের তৃপ্তিও দেয় নি, ধরেও রাখতে পারে নি। পূর্বেই আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রেই আদি ব্রাহ্ম-সমাজের চিন্তা ও বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম-সমাজ বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম-সমাজকে পুনরায় জাগিয়ে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ঐ সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন,

আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ

শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর মতো মনীষীরাও এক সময়ে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ব্রাহ্মধর্মের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তখন ব্রাহ্মধর্মের সপক্ষে লেখনী ধরতে হয়েছিল। এই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন রবীন্দ্রনাথের সাময়িক পত্রের আসরে অনেক কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। অবশ্য এ বিরোধ স্বাভাবিক ভাবেই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে লিখেছেন:

"এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন"।

—'জীবনস্মৃতি'।

কিশোর নরেন্দ্রনাথও একসময়ে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় নিয়মিত যোগ দিতেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে যখন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি অধিকতর প্রগতিবাদীদের প্রয়াসে ১৮৭৮ সালে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হল তখন তিনি তার সভ্য-তালিকায় নাম লিখিয়েছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ সভ্য নরেন্দ্রনাথ

তার ফলে সেদিন তিনি সবচেয়ে অধিক প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, একথা মেনে নিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের ছাত্র এবং যুক্তিবাদের ভক্ত নরেন্দ্রনাথের পক্ষে সেদিন ব্রাহ্ম সমাজের চিন্তধারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল নেতারা ইউরোপীয় যুক্তিবাদের ভক্ত ছিলেন। তাঁরা মূর্তিপূজা, অবতারবাদ, গুরুবাদ, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। নারী-শিক্ষার প্রসারের জন্যে তাঁরা সে-সময়ে চেষ্টা করেছিলেন। এই সকল সংস্কারমুক্ত চিন্তা ও প্রগতিশীল কর্মধারা শিক্ষিত সমাজের উপর সেদিন স্বাভাবিক নিয়মে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নরেন্দ্রনাথ—একই সমাজের দুই গোষ্ঠীর দুটি তরুণ। প্রত্যক্ষতঃ সেদিন তাঁদের ব্যবধান খুবই অল্প। ইতিহাসের ধারায় সেদিন দুই ব্যক্তিত্বের এই ব্যবধান যদি ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণতর ও স্বল্পতর হয়ে আসতো, তাহলে আশ্চর্যের

বিষয় কিছুই ছিল না, বরং সেটাই ছিল খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরের ঘটনা ও ফলশ্রুতি দিয়ে বিচার করলে তার ঠিক্ বিপরীতটাই যে সেদিন ঘটেছিল, এ কথা সকলেরই জানা।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন আদি ব্রাহ্ম সমাজেরই একজন ছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বকে এ ধরণের কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে দেখা কঠিন। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম যে বিস্তার ও তাৎপর্য লাভ করেছিল তাকে কোনো গোষ্ঠীর সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বিচার করা সম্ভব নয়, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নরেন্দ্রনাথ তাঁর তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসা ও প্রবল আধ্যাত্মিক পিপাসা নিয়ে সমাজের মধ্যে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। তিনি এমন একজনকে পেতে চেয়েছিলেন যিনি তাঁর সকল প্রশ্নের মীমাংসা, সকল সন্দেহের নিরসন করে দিতে পারবেন। সেই সত্যদ্রষ্টার সন্ধানে তিনি পাগলের মতো চারিদিকে ঘুরেছেন। এমনিভাবেই একদিন অকস্মাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণের। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ খুব সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে (১৮৮১, নভেম্বর)। পাড়ার নামজাদা গাইয়ে নরেন্দ্রনাথ সেদিন নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁকে গান শোনাবার জন্যে। তারপর তাঁদের সেই প্রথম পরিচয় কেমন ভাবে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, কি প্রকারে তাঁদের সাধারণ অন্তরঙ্গতা নিবিড়তর আত্মিক সম্পর্কের পর্যায়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং কি ভাবে সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের সন্তান 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'-এর উৎসাহী সভ্য নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দে রূপ লাভ করেছেন, তা তাঁর জীবনী-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ

কবিগুরু রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও ধর্মগুরু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ,—প্রত্যক্ষতঃ মনে হয়, তাঁরা জীবন-সাধনা ও ধ্যান-ধারণার দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রত্যন্তে দাঁড়িয়ে আছেন; একজন জীবনমুখী কবি, অপর জন জীবনবিমুখ সন্ন্যাসী। একজন বলেছেন, 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', অন্যজন বাস্তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বৈরাগ্যসাধনাকে আপন জীবনের অন্যতম ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ-এর আপাত বৈষম্য

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্র-নাথের অনুসন্ধান-সাপেক্ষ সাম্য

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। দুজনের চিন্তা ও কর্মকে গভীর ও আন্তরিক ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, উভয়ে অনেক জায়গায় পরস্পরের অতি কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের আপাত বিরোধ ও বৈষম্যের অন্তরালে তাঁরা অনেক স্থলে নিকটতম সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন। তাঁদের চিন্তা ও কর্মসাধনার বিশিষ্টতার আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁদের এই প্রচ্ছন্ন ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই মহাচরিত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ,—একজন জীবনশিল্পী কবি, যাঁর প্রধান ব্রত বাণী-সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনের জয়গান গাওয়া; অপরজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, যাঁর সাধনা প্রত্যক্ষতঃ জীবন-বিমুখ মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

একজনের কাজ সাহিত্য-সৃষ্টি। সাহিত্য হচ্ছে মায়ার জগৎ,—বিচিত্রের প্রকাশ সেখানে; কবি হচ্ছেন সেই 'বিচিত্রের দূত'।

অপরজন বৈদান্তিক। বিচিত্রকে মায়া বলে অস্বীকার করে অদ্বিতীয় একের আরাধনার তাঁর সিদ্ধি-প্রত্যাশা। একজন রূপের মধ্য দিয়ে অরূপকে, ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে চিরন্তনকে আবিষ্কারের ও প্রকাশের সাধনা করেন; অপজন ক্ষণিককে, খণ্ডকে অস্বীকার করে অখণ্ডে আত্মবিলীন করতে প্রয়াসী হবেন, এটাই স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যাশিত।

রূপ ও অরূপ

চরিত্রনীতির এই বিপরীতমুখীনতার জন্যে, দুই মহাপুরুষ সমসাময়িক হলেও প্রাথমিক বিচারে অগ্রসর হয়েছিলেন বিভিন্ন পথে। জীবনে একের সঙ্গে অপরের আলাপ পরিচয় ও আলোচনাদি হয়েছিল কি না সে বিষয়ে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। বিবেকানন্দের ধর্ম-বিজয় সমসাময়িক ভারতের চিত্তকে আশ্চর্যভাবে মথিত করলেও রবীন্দ্রনাথের **সমকালীন রচনায় তার প্রত্যক্ষ পরিচয় বিরল**। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের **সমসাময়িক** উক্তি দুর্লভ। এই আশ্চর্যরকম নীরবতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পারস্পরিক নীরবতা

উভয় ব্যক্তিত্বকে পাশাপাশি রাখলে তাদের বৈষম্যটাই প্রথমে চোখে পড়ে বেশি। দুই মহাচরিত্র প্রাচীন ভারতীয় সাধনা-ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও কবির দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মপ্রচারক সংঘস্রষ্টা সন্ন্যাসীর থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। পৈত্রিক সাধনা ও পারিবারিক ঔপনিষদিক সংস্কৃতিসূত্রে কবির বক্তিগত জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্মবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ পাবার সুযোগ পেয়েছিল; ব্রহ্মবাদীর সহজজ্ঞান থেকে তিনি ভারতের অন্তর্নিহিত

ঐক্যের সন্ধান করেছিলেন। কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অনেক সময়ে তিনি যে মহৎ বাণী প্রচার করেছেন, লৌকিক ত্যাগাদর্শের সমারোহে কবি-জীবনে তা প্রকাশ পায়নি। তার কারণ জীবনশিল্পীরূপে বিশ্বসংসারকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণে ও সম্ভোগেই ছিল তাঁর স্বভাবসঞ্জাত প্রবণতা,—বৈরাগ্যসাধনা নয়, জগতকে মায়া বলে জীবনকে বঞ্চনা নয়। তাই রবীন্দ্র-মননে ও সাহিত্যে একদিকে যেমন ত্যাগাদর্শের প্রশস্তি আছে, অন্যদিকে তেমনই নেতিমূলক বৈরাগ্য-চর্চার সম্বন্ধে অনাসক্তি এবং পার্থিব জীবনের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ ও মমতাও ঘোষিত হয়েছে।

কবি ও সন্ন্যাসী

বিবেকানন্দ দার্শনিক হিসেবে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের দৃষ্টি নিয়ে জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি বৈরাগ্য-সাধনের উপর অনেক স্থলে প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আপন জীবনে বাস্তবে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং উৎসাহী অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু ত্যাগোন্মুখ তরুণ সম্প্রদায়কে সংগ্রহ করে সন্ন্যাসীসংঘ গঠন করেছেন।

বিবেকানন্দ গুরুর মন্ত্রশিষ্য এবং শিষ্যদের মন্ত্রগুরু। ধর্মগুরু হিসেবে তিনি বিশ্বপূজ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে গুরু নন, গুরুর শিষ্যও নন; তাঁর কাজ ধর্মপ্রচার নয়, সন্ন্যাস গ্রহণও নয়। তবু তিনি কবিগুরু হিসেবে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন, মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণে সমগ্রজাতি তাঁকে 'গুরুদেব' আখ্যায় ভূষিত করেছে।

গুরুবাদ

কবি আদর্শের স্রষ্টা, অনুভূতিকে ভাষায় রূপদান তাঁর স্বভাবধর্ম। সন্ন্যাসের শুষ্ক আধ্যাত্মিকতা তাঁর শিল্পী-চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেনি। কবি সুন্দরের পূজারী; রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের স্পর্শ পেয়ে তিনি কৃতার্থ। বর্ণে, গন্ধে, গানে, রূপের আড়ালে যে অরূপ-বীণা লুকিয়ে বেজে চলে, তাকে আত্মসাৎ করে তিনি আত্মহারা, তাকে বাণীবদ্ধ করে তিনি ব্রতসিদ্ধ। পক্ষান্তরে অদ্বৈত-বাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বস্তু-বিশ্বকে মায়া এবং ভ্রম বলে অস্বীকার করতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। নির্বিকল্প অরূপের সাধনায় সিদ্ধি-প্রত্যাশায় সীমাকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি অসীমের মধ্যে আত্মনিমজ্জনের প্রচেষ্টায় উন্মুখ।

কিন্তু উভয়ের চরিত্রের এইরূপ বিচারে তাদের প্রবণতার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় ধরা পড়ে না। সে পরিচয়ের জন্যে আমাদের আর একটু গভীরে যাওয়া প্রয়োজন।

নিবিড় অনুধাবনে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়ের চারিত্রিক প্রবণতার মধ্যে একটি আপাত অন্তর্দ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধ প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরেই অল্পবিস্তর স্ব-বিরোধ বিদ্যমান। তবে মহৎ প্রতিভার মধ্যে সে বিরোধ অধিকতর তীব্র, তীক্ষ্ণ, গভীর ও তাৎপর্যময়। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ সংযোজিত হয়েছে। এখানে শুধু দুজনের অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বৈষম্যটুকু বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পার্থক্য

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস মূলতঃ রূপ ও অরূপ এই দুই বিপরীত কোটির আকর্ষণে আন্দোলিত। একদিকে রূপের চিত্রশালার আহ্বান, অন্যদিকে অরূপের বাঁশির নিরুদ্দেশ-যাত্রার ডাক—কোনোটিকেই কবি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ছবি ও গান তাঁকে সমানভাবে টেনেছে। চিত্তভরে তিনি বিশ্বকে দেখেছেন ও দৃশ্যজগতের নানা বৈচিত্র্যের মালা গেঁথেছেন নিবিড় মমতা ও স্থৈর্যে। কিন্তু আপন অজ্ঞাতেই একসময়ে মন মুক্তি পেয়েছে নিরাকারের রাজ্যে, নৈর্ব্যক্তিকতার অসীমে, 'আইডিয়া'র জগতে। এই কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির দ্বিধাকে কবি আত্মপ্রকৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার চিহ্নিত করেছেন।

বিবেকানন্দের চিত্তও দুই বিপরীত প্রবণতার আকর্ষণে পুনঃ পুনঃ বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হয়েছে। একদিকে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাসা, বৈদান্তিকের নির্বিকল্প সমাধি-আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সর্বমানবের মঙ্গলকামনায় বিশাল কর্মযজ্ঞে আত্মোৎসর্গের প্রবল প্রেরণা। দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েরই হৃদয় বিশেষ ও নির্বিশেষের মধ্যে আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের আন্দোলনের উদ্ভব ও পরিণতির বৈপরীত্য প্রণিধানযোগ্য।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, কবির স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রকেই তাঁর সাহিত্যে ধরতে চেষ্টা করেছেন। শুরু করেছেন তিনি ব্যক্ত ও বিশেষকে নিয়ে, কিন্তু তাঁর বন্ধন-অসহিষ্ণু ভাবুক মন শেষ পর্যন্ত লাভ করেছে অব্যক্ত ও নির্বিশেষকে,—সগুণকে আকাঙ্ক্ষা করে অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন নির্গুণকে, 'concrete' থেকে যাত্রার সূচনা করে উত্তীর্ণ হয়েছেন 'abstract'-এর মধ্যে।

পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ বেদান্তকে দার্শনিকতার সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত করে প্রত্যক্ষতঃ সন্ন্যাস-জীবনে বিশেষকে মায়া বলে অভিহিত করেছেন এবং

একমাত্র নিরাকার নির্বিশেষকেই চরম ও পরম বলে বরণ করতে চেয়েছেন। অখণ্ড-উত্তরণের সাধনায় খণ্ডকে তিনি অস্বীকার করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

কিন্তু তাঁর সহজাত নিবিড় মানব-প্রেম তাঁকে সেই নির্বিকল্প সমাধিতে স্থির থাকতে দেয়নি। পীড়িত আর্ত মর্তমানুষের আহ্বান, এই গ্রহের ক্রন্দন তাঁকে নৈর্ব্যক্তিকতার নভোচারিতা থেকে সবলে টেনে নামিয়ে এনেছে কঠিন মাটির বুকে কর্মযোগের মধ্যে। তাঁর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাসা নির্বিশেষ মানবমুক্তির প্রবল দাবিতে বিলীন হয়ে গেছে। এই ভাবেই 'Abstract' থেকে 'Concrete'-এর মধ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। একজন 'Concrete' থেকে 'Abstract'-এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন, অপরজন 'Abstract' থেকে 'Concrete'-এর মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বিবেকানন্দ 'Concrete'-এর মধ্যে নেমে এসেছেন, কিন্তু কখন? মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন:

"He came to it after, not before he had mastered the Absolute."

—'The Life of Vivekananda and the Universal Gospel.'

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে ও বাণীতে পৌরুষের দীপ্তিকে আমরা অনেক স্থলে তীব্র প্রখরতায় ঝলসে উঠতে দেখেছি। কিন্তু রবীন্দ্র-বাণীতে সেই পরুষ উজ্জ্বলতার পশ্চাতে একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রসাধিত ছন্দ ও সঙ্গীতের ঝঙ্কার অনুশীলিত শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে যায়। আসল কথা, আপনার গোপন গভীরে তিনি কবি ও শিল্পী—এই তাঁর সবচেয়ে খাঁটি পরিচয়। তাই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে প্রকাশনীয়কে রসরূপে অভিষিক্ত করতে তিনি কোনো সময়েই কার্পণ্য করেন নি। তিনি যা প্রকাশ করেছেন তাকে সকল সময়ে শব্দচয়নে-সুরে-লয়ে উপযুক্ত বিন্যাসে বাজিয়ে তুলেছেন।—আপন বাণী-সাধনার ভূমিকাটিকে তিনি সর্বাগ্রে স্মরণ রেখেছেন। কবির নিজের ভাষায় তাঁর আত্মপরিচয়:

উভয়ের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য

"আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগলো আমার···।"

—'আত্মপরিচয়'। শতবার্ষিক
সংস্করণ, রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড।

"জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে দেখার ঔৎসুক্যকে নিত্য পূর্ণ করবার আবেগ আমি অনুভব করছি। এ দেখা তো নিষ্ক্রিয় আলস্যপরতা নয়। এই দেখা ও দেখানোর তালে তালেই সৃষ্টি।"

—'আত্মপরিচয়'।

রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১০ম খণ্ড।

বিবেকানন্দের সুমহৎ শৌর্য, তাঁর রচনার ওজস্বিতা ও দৃপ্ত বীরবাণী সম্বন্ধে নূতন করে বলবার কিছু নেই। তাঁর অতুল কর্মশক্তি একদিন দেশ ও দশের সকল জড়তা ও সুপ্তি দূর করবার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। তাঁর বাণী তাঁর কর্ম-সাধনারই অংশ-বিশেষ। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের ও অপ্রতিহত দুর্নিবার প্রাণশক্তির আবেগ তাঁর বাণীর রূপ ধরে বিপুল বেগে এসে আমাদের আত্মার মূল ধরে নাড়া দেয়। এই নাড়া দেওয়াটাই সেখানে প্রধান কথা। সেই দুর্বার গতির স্বতঃস্ফূর্ততায় সচেতন প্রসাধনের পারিপাট্য অথবা সযত্ন বিন্যাস বাক্‌ভঙ্গিমায় গৌণ হয়ে গেছে। বক্তব্যের পশ্চাতে পুঞ্জীভূত দুর্বার প্রাণশক্তিই সেখানে প্রকাশের একটি অনন্যসাধারণ রীতিকে (Style) সজীব করে তুলেছে।

সাহিত্যের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে তাই যদি বলা যায় মূলতঃ 'Lyrical'; তবে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বকে আখ্যা দিতে হয় 'Dramatic'; কারণ 'Drama'-র মূল কথাই হল 'Action'; অসংখ্য ভাবসংঘাতসঞ্জাত অজস্র সক্রিয়তাই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ-লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা দল গঠনে সমর্থ হন নি। তিনি নীতিগত ভাবে সম্প্রদায়-সৃষ্টির বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। তাছাড়া তাঁর চারিত্রিক কাঠামোও ছিল দল-গঠনের পরিপন্থী। মানুষকে ব্যাবহারিক অর্থে পরম আত্মীয় করবার জন্যে যে ধরণের হৃদয়াবেগ থাকা প্রয়োজন কবির মধ্যে তার অভাব ছিল। একটা জায়গা পর্যন্ত তিনি মানুষকে কাছে টানতে পারতেন, সেটা সম্পূর্ণ বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষেত্রে। মননের সূত্রে তাঁর নিবিড় সাহচর্য-লাভ যাঁদের সাধ্য ছিল তাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে হয়তো পরিতোষ লাভ করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তা ছিল আয়ত্তাতীত। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে অথবা ঘনিষ্ঠ হতে সচেষ্ট হয়ে কেউ তৃপ্ত হতে পারে নি, এ

রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক মানবপ্রীতি

সত্য তাঁর জীবনীকার স্পষ্টই স্বীকার করেছেন। কবির এই কঠোর নৈর্ব্যক্তিক মানব-প্রীতির জন্যে তাঁর অন্তরে কেউ স্থায়ী বাসা বাঁধতে পারে নি। তাঁর স্বভাবের সদাচলমান ধর্ম ও সদাপরিবর্তনশীল মনোবৃত্তি ছিল এর মূলে।

যাদের কথা তাঁর সাহিত্যে ব্যক্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে কবির একাত্মতা ভাবের জগতে, তারা তাঁর 'আইডিয়ার' ক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল। এর মধ্যেই ছিল তাঁর কবিসত্তার মুক্তি, এই ছিল তাঁর সাধনা ; অন্তরে তিনি শুধু অভিজাত ছিলেন না, তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। এরকম চরিত্রের মানুষ দল বা সম্প্রদায় গঠন করতে পারে না, সংঘ স্মৃষ্টিও তার পক্ষে কঠিন হয়।

কবির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাছে অন্য ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন না দিয়েও থাকতে পেরেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ও বিশ্বাস, এমন-কি বিরুদ্ধ মত পোষণ করেও অনেক ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে বাস করে গেছেন এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়, যা ঐ শ্রেণীর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সম্ভব বলে মনে হয় না। 'স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের' এই বৈশিষ্ট্যই বিশ্বভারতীকে বৈচিত্র্য দান করেছে। বিচিত্রমতের সংস্পর্শে এসে এখানকার মানুষ 'কালচার্ড' বা সমঝদার হয়ে উঠেছে।

বিবেকানন্দের চরিত্রে প্রবল নৈর্ব্যক্তিক মুক্তি-পিপাসা তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল, তা তো আমরা সকলেই জানি। সে-পথে তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ পথিক। কিন্তু তাঁর অনুরাগকোমল প্রশস্ত হৃদয় তাঁকে আত্মসর্বস্ব মুক্তি-কামনার ঊর্ধ্বচারিতা থেকে আকর্ষণ করে সবলে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল নিপীড়িত, আর্ত বুভুক্ষু দীর্ণচিত্ত জনতার মধ্যে। মানব-মুক্তির আহ্বানে নির্বিকল্প সমাধির মোহভঙ্গ হতে তাঁর বিশেষ বিলম্ব হয় নি।

তিনি নির্দিষ্ট মতবাদ ও প্রণালীতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিয়ে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বা সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। ত্যাগের জন্যে কর্মের জন্যে একদল মানুষ সর্বদাই উন্মুখ, কেবল আহ্বানের জন্যে তাদের প্রতীক্ষা। তারা নেতৃত্ব চায় না, নেতা বা গুরুকে অনুসরণ করে সার্থক-জীবন হতে চায়। নির্দিষ্ট মতবাদের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ, নেতা বা গুরুর প্রতি অটুট ভক্তি তাদের আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং সম্বল। এই নেতা-অনুগামী কর্মপিপাসুরা গভীর আন্তরিকতা নিয়ে নবীন সন্ন্যাসীর বজ্রদীপ্ত আহ্বানে তাঁর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

সংঘস্রষ্টা বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের অকপট আবেগের তীব্রতা সেদিন যুবসমাজে এক নবীন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। বিবেকানন্দের চরিত্রে মানুষকে নিবিড়ভাবে নিকটে আকর্ষণ করবার উপযোগী হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি। গণনেতৃত্বের জন্যে চরিত্রে বিভিন্ন গুণের যে দুর্লভ সমন্বয় প্রয়োজন তা বিবেকানন্দের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ জীবনশিল্পী কবি হয়েও জনতার নিবিড় প্রত্যক্ষ সাহচর্যের অধিকার অল্পই লাভ করেছেন। তাঁর আভিজাত্য ও প্রকৃতিগত নিঃসঙ্গতা এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বের গভীরতা ও সুদূরপ্রসারিতাকে স্বীকার করার সঙ্গে 'জনসংঘাতমদিরার' তীব্র প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর স্পর্শকাতরতাকেও আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। জনতার বাস্তব সান্নিধ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও এই কারণে তাঁকে অধিকাংশ সময় প্রত্যক্ষ গণসংযোগের কাজে মধ্যপথ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে আত্মনির্বাসন তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমষ্টি-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপে আত্মসচেতন ছিলেন। জনতার অন্তঃপুরের সিংহদ্বারে কবির ব্যাকুল বাঁশি বারবার বেজে উঠেছে :

"হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়াছ যে ভার
তোমার সিংহদুয়ারে।"

কিন্তু অন্তঃপুরে অবারিত প্রবেশের ছাড়পত্র কোথায়?

'ঐকতান' কবিতায় এই ব্যর্থতাবোধই রূপ পেয়েছে অন্যভাষায় বিচিত্রতর তাৎপর্যে। দূরের থেকে আভাষে ইঙ্গিতে যতটুকু জানা যায়, মনন এবং কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে তাকে নবীনতর ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেই কবিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাতে মর্মের সংযোগ ঘটে হয় তো, কিন্তু কর্মের সংযোগে মনের মতো করে কাছে টানতে না পারার বেদনা ও অতৃপ্তি বিস্মৃত হওয়া যাবে কি করে? দিগন্তবিহীন প্রশস্ত পথেই তাই পথিকের বাঁশি বেজে চলে :

"যেদিন জগতে চলে আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে

দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা।”

—‘এবার ফিরাও মোরে’। ‘চিত্রা’।

অন্যদিকে বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষতঃ ত্যাগধর্মাশ্রয়ী সন্ন্যাসী হলেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কর্মযজ্ঞের আসরে জনতার সঙ্গে নিজেকে একাঙ্গ করে দিতে পেরেছিলেন। তাপসমনের দুরূহ গভীর নিঃসঙ্গতা, অদ্বৈতবাদীর নিবিড় মানসিক একাকীত্ব অনেক সময়েই নেপথ্যচারী হয়েছে ‘নরনারায়ণের’ প্রতি গভীর প্রেমের প্রভাবে। সমষ্টি-সত্তার মধ্যে আত্মনিমজ্জনের যে চর্চায় হৃদয়ের উষ্ণতায় সকলকে কাছে টানবার অধিকার পাওয়া যায়, সে চর্চাতেও বিবেকানন্দ সিদ্ধকাম হতে পেরেছিলেন। বিবিক্ত চিত্তের অবশ্যই এ এক আশ্চর্য অনুশীলন, আশ্চর্যতর সার্থকতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই মহাচরিত্রের প্রকৃতিগত ঐক্য

আবির্ভাবের দিক্ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, ভারতের দুটি জাগ্রত আত্মা সমসাময়িক। উভয়েরই জন্ম কলকাতায়, জোড়াসাঁকো ও সিমলা, শহরের এপাড়া ওপাড়া, মাইল খানেকের মধ্যে,—একজনের ১৮৬১ সালের ৭ই মে, অপরের ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের চেয়ে প্রায় বৎসর দেড়েকের বড়।

সমসাময়িক আবির্ভাব

উভয়ের চরিত্র ও চিন্তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে প্রথমেই যেটি বিস্ময়ের সঞ্চার করে সেটি হল উভয়ের চিন্তার ব্যাপকতা ও অপরিমেয় বিষয়-বৈচিত্র্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সম্ভাব্য কোনো সমস্যাই বোধ হয় তাঁদের জিজ্ঞাসার বাইরে থাকতে পারে নি এবং সেই সকল প্রত্যক্ষ সমস্যার অন্তর্নিহিত মৌলিক বিপর্যয়টিকে তাঁরা সযত্নে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন বলেই সমাধানে পৌঁছতে তাঁদের দিক্‌ভ্রান্তি ঘটে নি এবং সমস্যাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করতে গিয়ে তাঁরা একদেশদর্শিতার দ্বারা কবলিত হন নি। সমস্যাগুলি যে একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এ সত্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিচারে তাঁদের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই বিচ্ছিন্নভাবে সমাধানের পশ্চাতে তাঁরা ছুটে বেড়ান নি, সেখানেও তাঁরা কেন্দ্রবিন্দুতেই উপনীত হতে প্রয়াসী হয়েছেন।

চিন্তার ব্যাপকতা ও সর্বাঙ্গীণতা

দুজনের সুদূরচারী বিপুল চিত্ত-শক্তির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল তাঁদের বিশাল হৃদয়। তীক্ষ্ণ যুক্তি ও তীব্র অনুভূতি, নিপুণ বিশ্লেষণশক্তি ও অভূতপূর্ব বিরচনক্ষমা প্রজ্ঞা, শাণিত বুদ্ধি ও গভীর সহমর্মিতার সমন্বয় উভয়ের চরিত্রকে দুর্লভ ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। তাঁরা যতো বড়ো জ্ঞানী; তার চেয়ে কম বড়ো ভক্ত ছিলেন না।

বর্তমান ভারতের দুই গৌরব-মুকুটমণি জাতির অতীত সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও তপোবন-জীবন একদা উভয়কে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতের মধ্যে

দেশকাল-নিরপেক্ষ শাশ্বত পরিশুদ্ধ জীবনাদর্শের সন্ধানে তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। প্রবীণ প্রাজ্ঞ ভারতকে অর্বাচীন স্বদেশ-সত্তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হতে দেখবার আন্তরিক প্রেরণায় সনাতন জীবনযাত্রার সঙ্গে বিশ্বজনীন নির্বিরোধ জীবনাদর্শের একটি যোগসূত্র খুঁজে বের করতে উভয়েই চেষ্টা করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের মধ্যে সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন জীবনাদর্শের সন্ধানী দুই পুরুষ

মুক্ত সত্তার অন্যতম লক্ষণ হল তার গতিশীলতা ও বিস্তার-প্রবণতা। প্রকৃত মুক্তচিত্ত পুরুষ সময়ের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টির সঙ্গে অধিকতর আত্মপ্রসারের পথে এগিয়ে চলেন। সাধারণ প্রাকৃত মন তার অজস্র স্বার্থবোধ ও ব্যক্তিগত মোহ নিয়ে সময়ের সঙ্গে নিজেকে আরও বেশি সঙ্কুচিত করে আনে, অজস্র সংস্কার ও অভ্যাসের খোলসে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। এখানেই বোধ হয় জিজ্ঞাসু মনের সঙ্গে সাধারণ মনের একটা বড়ো পার্থক্য। অভিজ্ঞতা কাউকে দেয় স্থাবরতা, কাউকে দেয় জঙ্গমত্ব। অভিজ্ঞতা কারও কাছে ভার হয়ে ওঠে, কারও বা চলার ধার বাড়িয়ে দেয়, পায়ের ছন্দকে আরও রমণীয় করে তোলে, পথকে করে দেয় আরও প্রশস্ত।

নদী যেমন সঙ্কীর্ণ গুহামুখ-নিঃসৃত হলেও নিজেকে সেই অল্পপরিসরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে ক্রমশঃ উন্মুক্ত সমতলে নিজের পথ করে নেয় এবং অন্তিমে নিঃসীম সমুদ্রের অসীমে মুক্তিলাভ করে, মুক্তচিত্ত পুরুষও সেই রকম প্রথমে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়, ধর্ম, সমাজ বা দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করলেও ক্রমে সমস্ত সঙ্কীর্ণ পরিচয়কে পশ্চাতে ফেলে রেখে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বিশ্বমানবতায় উত্তীর্ণ হন।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চরিত্রে এই আত্মবিস্তার-প্রবণতাই তাঁদের জীবন ও বাণীকে প্রবল গতিশীলতা দান করেছে। তাঁরা যে বিশেষ ধর্মে, সমাজে, দেশে বা কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্যকে স্বীকার করেও নিজেদের চিন্তাকে তাঁরা সুদূর অতীতে-অনাগতে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁরা বিশ্বমানবমনের সঙ্গে একাঙ্গ হবার সাধনা করে গেছেন।

আত্মবিস্তার প্রবণতা

উভয়ের মধ্যেই তাই তীব্র স্বীকরণ ও বিকিরণ শক্তি সক্রিয়। বিশাল বিশ্বের ভাবধারার যা কিছু গ্রহণীয় বলে তারা মনে করেছেন তাই 'হংসৈর্যথা-ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' গ্রহণ করেছেন, তারপর তাদিকে নিজেদের প্রতিভার

জারকরসে জারিত করে যুগোপযোগী নূতন ধারায় উৎসারিত করেছেন। এই হচ্ছে মহাপুরুষদের কাজ। তাঁরা কোনো সৃষ্টিছাড়া নূতনের সৃষ্টি করেন না, চিরপুরাতন সত্যকে নবরূপে আবাহন করে আনেন মাত্র। বিবেকানন্দের ভাষায়:

স্বীকরণ ও বিকিরণ শক্তি

"The same thoughts that we have been calling ours, and ours alone, were present hundreds of years ago, in others, and sometimes even in a better form of expression than our own."

—'Bhakti or Devotion'. Complete Works.

১ম সং, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ— ৪৩।

সমগ্র অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে আত্মসাৎ করে যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের আদর্শ উভয় চিন্তানায়ক আমাদের সামনে রেখে গেছেন তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে আমরা কতদূর সফল হতে পারছি অথবা পারবো তার বিচার করবে আগামী দিনের ইতিহাস। মানুষের ইতিহাস নিঃসন্দেহে উত্তর-সাধকদের সেই সাফল্যের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রত্যেকটি মানুষের দুটি সত্তা আছে। প্রথমটি, যখন সে *নিজেকে নিয়েই সম্পূর্ণ;*—তখন সে *নিঃসঙ্গ, অন্য-নিরপেক্ষ—এটি তার* ব্যষ্টি-পরিচয়। দ্বিতীয়টি হল তার সমষ্টি-পরিচয়, যেখানে বিশ্বের আর সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়ে তার যাচাই হয়। এই ব্যষ্টিসত্তা ও সমষ্টিসত্তার দ্বন্দ্ব অল্পবিস্তর *প্রতিটি চিন্তাশীল* মানুষের জীবনেই *দেখা দেয়;* বিশেষ করে জিজ্ঞাসা যাঁদের গভীর, চিত্তশক্তি যাঁদের ব্যাপক, যুগচিন্তায় যাঁরা নেতৃত্ব দান করেন, জাতীয় জীবন-যজ্ঞে যাঁদের ভূমিকা ঋত্বিকের, তাঁদের মধ্যে এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা সমধিক।

ব্যষ্টিসত্তা ও সমষ্টিসত্তা

রবীন্দ্র-মানসে এই দ্বন্দ্বের স্বরূপটি রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকদের কাছে অবিদিত নয়। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গ্রন্থে এই দ্বন্দ্বটি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকেরা এই দ্বন্দ্বটি নিয়ে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। এ দ্বন্দ্ব রূপ ও অরূপ, তথ্য ও সত্যের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এই সংশয়ের বীজ রবীন্দ্র-মানসের গভীরে নিহিত। সাহিত্যে সেই দ্বিধারই সংক্রমণ। কবির নিজের ভাষায় বলতে গেলে:

"আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে

বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেই জন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা আর একদিকে দেশের প্রতি দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ!"

—চিঠিপত্র। পঞ্চমখণ্ড।

আর একখানি পত্রে কবি লিখছেন:

"আমি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখ দুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে শেলির 'Skylark' আর একটা ওয়ার্ডস্বার্থের 'Skylark',—একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে আর একজন অনন্তসুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতঃই একজন সম্পূর্ণনতার আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে দুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্য-ব্যাকুল, পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক করে অনুভব করে।"

—চিঠিপত্র। ৫ম খণ্ড।

দেখা যাচ্ছে, কবি আপন অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অন্তরের বৈরাগী মানুষটার সঙ্গে অনুরাগী মানুষটার সংঘাতে অনুশীলিত চিত্ত দীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত। আসক্তি ও বিবিক্তির এই দ্বন্দ্ব বড়ো বিচিত্র। মনের অন্তর্মুখী বৈরাগী সত্তা সমস্ত খণ্ডতাকে তুচ্ছ করে অখণ্ডের অভিমুখে ধাবিত হতে চায়, সীমার সঙ্কীর্ণ বন্ধন ছিন্ন করে অসীমের সুরটুকুকে ধরতে চায়; আবার যে অনুরাগী সত্তা পৃথিবীর সকল তুচ্ছতা খণ্ডতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পেতে চায় সে সবলে কঠিন মাটিতে আকর্ষণ করে নামিয়ে আনে। আকর্ষণ-বিকর্ষণে দোলাচল, ক্ষতবিক্ষত; তবু মুগ্ধচিত্ত বলে ওঠে:

"এই তো ভালো লেগেছিল
পাতায় পাতায় আলোর নাচন";

হয়তো পরক্ষণেই আবার অনন্তভিয়াষী বৈরাগী গেয়ে ওঠে :

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী"।

বিবেকানন্দের চিন্তায় ও চরিত্রেও অনুরূপ একটি দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ মেলে। একদিকে তাঁর অন্তরের সর্বত্যাগী নৈর্ব্যক্তিক মুক্তিকামী সন্ন্যাসী-প্রকৃতি পার্থিব বন্ধন সম্বন্ধে অপরিমিত পরিমাণে অসহিষ্ণুতা ব্যক্ত করেছে। অনন্ত-পিপাসু সে সত্তা বিশেষ ও খণ্ডকে অস্বীকার করে নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে আত্মনিমজ্জন কামনা করেছে। অন্যদিকে তাঁর প্রেমিক সত্তা, তাঁর বিশাল স্পর্শকাতর হৃদয় তাঁকে আত্মসর্বস্ব মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় অবিচল থাকতে দেয়নি। পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ-পীড়ন, এই গ্রহের অজস্র ক্রন্দন তাঁর ভাবসমাধির আসন টলিয়ে দিয়েছিলো। সমষ্টির মুক্তি-কামনা তাঁকে টেনে এনেছিল অরূপ-ভাবনা থেকে কর্মক্ষেত্রের মধ্যে।

বৈরাগী ও অনুরাগী সত্তা

এ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিমানসে কর্ম ও স্বপ্নের দ্বন্দ্ব,—একদিকে বিশ্বে ধর্মের বিজয়-কেতন উড্ডীন করবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাসা। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ এই দ্বি-সত্তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন :

"It pursued him every night from his adolescence, not consciously but subconsciously, through the ardent and conflicting instincts of his nature, with conflicting Desires—the Desire to have, to conquer, to dominate the earth, the Desire to renounce all earthly things in order to possess God.

The struggle was constantly renewed throughout his life."

—'The life of Vivekanada and the Universal Gospel.'

Complete works, ১ম সং, পৃ-৯।

রোমাঁ রোলাঁ তাঁর পুস্তকে এটিকে 'Dream' এবং 'Action'-এর দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ পূর্বোদ্ধৃত পত্রে যাকে 'কর্মের প্রতি আসক্তি ও চিন্তার প্রতি আকর্ষণ', এই দুই-এর দ্বন্দ্ব বলে নির্দেশ করেছেন, রোমাঁ রোলাঁ তাকেই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে 'Action' এবং 'Dream'-এর দ্বিধার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অবশ্য ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের

বিভিন্নতার জন্যে উভয়ের আত্মদ্বন্দ্বের প্রকৃতিগত পার্থক্যও যথেষ্ট ঘটেছে, একথা বলা বাহুল্য। দুজনের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের আলোচনা-সূত্রে সে বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বপ্ন ও কর্মের দ্বন্দ্ব

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মের একটি বৃহৎ অংশ নিয়োজিত হয়েছিল জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার-প্রচেষ্টায় ; ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়,—সকল ক্ষেত্রেই স্বদেশকে তাঁরা প্রাচীনের চিরাভ্যস্ত জড়ত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সংস্কার-আন্দোলন অবশ্য নূতন কিছু নয়,—উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই এ আন্দোলন নানা ধারায় প্রকাশ পেয়েছে। নবযুগের সংস্কার-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য সংযোজন হল, এ প্রয়াসে যথোচিত পরিমাণে ইতিমূলকতা সঞ্চার করা। এ বিষয়ে পূর্বসূরীদের অনেকে নঙাত্মক পন্থা অবলম্বন করার ফলে সংস্কার-আন্দোলনের বৃহৎ অংশ ভারসাম্য হারিয়েছিল বলা চলে। তাঁরা বর্জনের জন্যে এতো তৎপর হয়েছিলেন যে, অর্জনের দিকে আর মনোযোগ দিতে পারেন নি। প্রাচীনকে ভাঙবার বিষয়ে অতি-সচেতনতা নবীনকে গঠন করবার সম্বন্ধে তাঁদিকে উদাসীন করে তুলেছিল। পাশ্চাত্ত্যের চোখ-ধাঁধানো ভাবধারার অভিঘাত যে এই আত্মবিস্মৃতির প্রধান কারণ, তা বলাই বাহুল্য। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ নূতন যুগের সংস্কার-আন্দোলনকে এই নেতিমূলকতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা নিছক বর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান না করে সংগঠনের উপর সমধিক মনোযোগ আরোপ করতে চেষ্টিত হলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, ভাঙার নেশা একবার পেয়ে বসলে গড়ার কথা আর মনে থাকে না। অথচ আসল লক্ষ্য হল গঠন, ভাঙন হল তার আনুষঙ্গিক উপলক্ষ্য মাত্র ;—কিন্তু উপলক্ষ্যই অনেক সময় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, গুরুত্বটা পড়ে ভুল জায়গায়। পূর্বাচার্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সংস্কারের ক্ষেত্রে এই সত্যটি সর্বদাই স্মরণে রাখতে চেষ্টা করেছেন যে, ভাঙন কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, তার সার্থকতা নূতনের সংগঠনের পরিপূরকতায়। এই সূত্রে বর্জন ও গ্রহণ বিষয়ে সতর্ক বিচার ও পরিমিতি-বোধের প্রয়োজনীয়তার উপরেও তাঁরা জোর দিয়েছিলেন। জীর্ণ প্রাচীনকে মোহ-মুক্ত মন নিয়ে পরিত্যাগ অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু প্রাচীনমাত্রই পরিত্যাজ্য নিশ্চয়ই নয়। প্রাচীনের মধ্যে নির্বিশেষ দেশকালের সত্য হিসাবে যা শ্রদ্ধেয়

বর্জন ও অর্জন, সংস্কার ও সংগঠন। ইতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ও ধ্রুবমূল্যে অভিষিক্ত তা অবশ্যই রক্ষণীয় ; সেই প্রাচীনের দৃঢ় কঠিন ভিত্তির উপরেই আগামী নূতনের অভিষেক। আবার অনিবার্য নূতনকে অপরিমেয় উৎসাহে অবশ্যই বরণ করতে হবে। কিন্তু নূতনের নাম ধরে যা আসবে তাকেই বিনা বিচারে গ্রহণ করলে, সে তো আর এক ঘোর তামসিকতা ! তাই জাগ্রত মননে সতর্ক থাকতে হবে, যেন নূতনের চাকচিক্যময় মোহন ছদ্মবেশে এসে কোনো জীর্ণ গলিত বিকলাঙ্গ সর্বনাশা বিকৃতি আমাদের জীবনকে গ্রাস করতে না পারে।

মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-সাধনায় যে-সকল ভারত-পথিক পৌরোহিত্য-করেছেন তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নাম অবশ্যই পরিপূর্ণ ভাস্বরতায় প্রদীপ্ত থাকবে। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলবুদ্ধিকে যা বিপর্যস্ত করে, অন্তরাত্মাকে যা শৃঙ্খলিত করে তার বিরুদ্ধে উভয় চিন্তানায়ক বিদ্রোহ করেছেন। গণ্ডি বা বন্ধন যে-কোনো ছদ্মনামে যতো মোহন বেশেই আসুক না কেন, তাকে তাঁরা স্বীকার করেন নি। দুই মহাচরিত্রের চিন্তাধারার আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আমরা দেখতে পাবো, উভয়ে নানা সূত্রে মানুষের অন্তরের অবরোধ-উন্মোচন ও চিত্তের পূর্ণ উদ্বোধনের সাধনাই করে গেছেন। অবশ্য কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবলম্বিত পন্থা কোনো কোনো সময়ে পরস্পরের থেকে বহুলাংশে বিভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। মহৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশে এ স্বাতন্ত্র্যের মূল্য অনস্বীকার্য।

মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধক

খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে দুই চরিত্রের মধ্যে যে সকল আপাত বিরোধ চোখে পড়ে সেগুলি এসে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে উভয়ের অসীম মানব-প্রেমের মধ্যে ; সেখানেই তাঁদের চরিত্রের পূর্ণ পরিচয়। তাঁদের সুবিপুল তত্ত্ব-সাধনা ও কর্ম-প্রচেষ্টাও সেখানেই পূর্ণতা লাভ করেছে,—মানবকল্যাণ যেখানে শেষ কথা। তাঁদের সহজাত সুগভীর মানবপ্রীতি তাঁদিকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবনধারা থেকে বিচ্যুত করে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসের দিগন্তবিহীন প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ,—দুজনেই যুগচিন্তাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। যুগচিন্তার নিয়ামক হিসেবে উভয়কেই যুগাচার্য বা যুগপ্রবর্তক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ধর্মগুরু, সমাজ-সংস্কারক, স্বদেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী, দার্শনিক, কবি বা সাহিত্যিক—যে কোনো অভিধায় তাঁদিকে

মানবপ্রেম

অভিহিত করলে অন্যায় হবে না মোটেই ; যদিও কোনো বিশেষ অভিধা কোনো বিশেষ একজনের পক্ষে অধিকতর প্রযোজ্য হওয়া স্বাভাবিক। তাঁদের প্রতিভা ও চরিত্রের ব্যাপকতাই এর দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। সঙ্গীত-রচনা ও সুরারোপে উভয়েরই দক্ষতা ছিল (অবশ্য সাহিত্য ও সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক চর্চার কথা স্বতন্ত্র ও বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক)। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনমনীয় পৌরুষের দৃপ্ত বাণীতে উভয়ের লেখনী মুখর। উভয়ে একাধারে ভাবুক ও কর্মী।

দুজনের চরিত্রে, বিশেষ করে ধর্মাদর্শে, জীবনদর্শনে ও বাস্তব জীবনাচরণে ব্যবধানটাই প্রথমে বড়ো বেশি করে চোখে পড়ে ; মনে হয় যেন চরিত্রনীতির এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে মূল্যবোধের দুই বিপরীত প্রান্তে দুজন দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু গভীরে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সকল বাহ্যিক বিরোধ সত্ত্বেও দুটি চরিত্রের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মিল ছিল। স্বভাবতঃই এই অন্তরঙ্গের ঐক্য তাঁদের চিন্তাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং বহুলাংশে স্বাজাত্যও দান করেছে। সেইজন্যে ধর্ম, সমাজ, স্বদেশ, বিশ্বমৈত্রী, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের চিন্তা ও মতামতের মধ্যে অনেক স্থানে আশ্চর্যরকম মিল লক্ষ করা যায়,—চিন্তাধারার এই সমধর্মিতার মূলে আছে একদিকে নবযুগের উত্তরাধিকার, এবং অন্যদিকে উভয়ের প্রকৃতিগত ঐক্য।

উভয়ের চিন্তার সমধর্মিতা পরবর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মচিন্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুক্ত ধর্মবোধ

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ,—একজন কবি, অপরজন সন্ন্যাসী। বাহ্যতঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জীবনদর্শন ও ধর্মাদর্শের দুই বিপরীত প্রান্তে দুই চিন্তানায়ক দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, চিন্তাধারার গভীরে তাঁরা অনেক জায়গায় পরস্পরের অতি সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। —বর্তমান অধ্যায়ে উভয়ের ধর্মচিন্তা পাশাপাশি রেখে এই সত্য কিছুটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ঔপনিষদিক ভাবধারা

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে পারিবারিক এবং বিশেষ করে পৈত্রিক সূত্রে ঔপনিষদিক ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কবির জন্মগ্রহণের পূর্বেই তাঁর পরিবার হিন্দু সমাজের সকল সঙ্কীর্ণ সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের পরিবেশে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। তার ফলে শিশু কবির মন জড় সংস্কারের জঞ্জালে জড়িত না হয়ে মুক্ত পারিপার্শ্বিকতায় বেড়ে ওঠবার অবকাশ পেয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথও যখন কলেজে পড়েন তখন দেখতে পাই, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন উৎসাহী যুবক সদস্য, সুকণ্ঠের জন্যে সকলের প্রিয়। কিন্তু তাঁর ধর্মপিপাসু মন যে কারণেই হোক্, ব্রাহ্ম সমাজের সাধন-প্রণালীতে তৃপ্ত হয় নি। তাঁর বয়স যখন মাত্র উনিশ বৎসর, সেই সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন ও ক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট দীক্ষা লাভ করেন।

এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস (১৮৮৩, রচনা ১৮৮১-১৮৮২), 'কালমৃগয়া' নাটক (১৮৮২), 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) কাব্য প্রভৃতি রচনা ও 'বালক' পত্রিকা (১৮৮৫) পরিচালনার মধ্য নিয়ে আলসে-বিলাসে, ভাব-উচ্ছ্বাসে, সৌন্দর্য-চর্চ্চায় দিন কাটছে।

পরমহংসদেবের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ হতে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বেশে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। অবশেষে খেতরির

মহারাজা ও দক্ষিণভারতের কয়েকজন ভক্তের উৎসাহে ও উদ্‌যোগে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করবার জন্যে যাত্রা করেন ও সেখানে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যে বক্তৃতা দান করেন (১৩০০ আশ্বিন, ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর) তা সর্বজনপরিচিত। সেখানে তিনি বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণাই করে এসেছিলেন। এরপর তিনি ইউরোপের নানা দেশে নানা সময়ে যে বক্তৃতাদি করেছিলেন তার মধ্যেও প্রধানতঃ বৈদান্তিক ধর্মকে বিশ্বজনীনতার পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখবার আগ্রহই চোখে পড়ে।

পরিব্রাজক ধর্মবিজেতা বিবেকানন্দ

লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে উপনিষদ বা বেদান্তের ভাবধারার মধ্যে ভারতের শাশ্বত নির্বিরোধ জীবনাদর্শের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। সেই সনাতন জীবনাচরণের সঙ্গে বিশ্বজনীন নির্বিরোধ একটি জীবন-ভাবনার যোগসূত্র খুঁজে বার করবার পরোক্ষ প্রয়াস সেখানে অনুপস্থিত নয়। 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যের কবিতা, নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতে (১৩০৮ বৈশাখ, ১৯০১ খ্রীঃ) প্রকাশিত তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রভৃতি তাঁর সেই প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবনের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল শ্রদ্ধা ও আগ্রহ তাঁর নানা লেখায় নানা সময়ে ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন জীবনাচরণকে বর্তমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখবার আকাঙ্ক্ষাতেই এক সময় তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন :

ঔপনিষদিক ভাবধারায় বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের সন্ধান

"নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

—'নৈবেদ্য'।

এবং 'সভ্যতার অন্তহীন আড়ম্বর' ও 'অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্ঘর লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধা'-র মধ্যে যে 'শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ' তাও অশেষ আস্থায় উচ্চারণ করেছিলেন। সমসাময়িক ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনও (১৩০৮, ৭ই পৌষ) সংশয়হীনভাবে এই মানসিকতারই পরিচয় দিচ্ছে।

ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, সহস্র সংস্কারে বিদীর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ধর্মজীবনকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ও সংহত করবার প্রয়াসে

অতীতের একটি প্রবুদ্ধ ধ্রুবপদী শাস্ত্রীয় সংহিতার চিন্তাসূত্রের সমর্থন-প্রত্যাশাতেই এক সময়ে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বেদান্ত-উপনিষদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

অতীতের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবোধ এক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে কাজ করেছে। তাছাড়া তাঁদের চিন্তা ও চেষ্টা সহসা যাতে শাস্ত্রমুখী জনমানসের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা না হারায়, সে বিষয়েও তাঁরা কিছুটা সচেতন হয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, সমগ্র ঊনবিংশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনকে মূলতঃ শাস্ত্রভিত্তির উপর গড়ে তোলার প্রবণতার মূলেও এই সত্যই কাজ করেছে।

ঊনবিংশ শতকের ধর্মান্দোলনের শাস্ত্র-মুখীনতার কারণ

তাই রামমোহন 'বেদান্ত যুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে আপন অনুভূতির সমর্থনে উপনিষদের শ্লোক যথেচ্ছ উদ্ধৃত করেছেন, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রীয় শ্লোক সন্ধান করে সেটিকে সবলে আঁকড়ে ধরেছেন, আর বিবেকানন্দ 'ব্যাবহারিক বেদান্ত'কে ('Practical Vedanta') জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ঘোষণা করে জাতির জাগরণমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধর্মবিকৃতির প্রধান কারণ মননহীন নিয়ম-সর্বস্বতা ও সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসের জঞ্জাল অপসারণই ছিল ধর্মমুক্তির আসল কথা। তাই শাস্ত্রীয় সংহিতার সমর্থন সংগ্রহের আগ্রহ তাঁদের চিন্তায় ও উক্তিতে এক সময়ে প্রকট হলেও তা স্ফীত বা বৃহৎ হয়ে ওঠেনি, বরং ধীরে ধীরে ক্ষীণ ও গৌণ হয়ে এসেছে। যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্রে ধর্মজীবনকে দাঁড় করিয়ে প্রমুক্ত জাতীয় চিত্তের বিস্তৃত উর্বর ভূমিতে সৃষ্টিশীল চিন্তার চর্যা ও কর্ষণ প্রত্যাশা করে অন্ধ তামসিক পৌরাণিক নিষ্ঠার প্রতি উভয় চিন্তানায়ক কতখানি নির্মম হয়েছেন, তাঁদের চিন্তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সেটাই এই সূত্রে মুখ্য কথা ও প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

বিবেকানন্দ অন্ধ বিশ্বাস, অর্থহীন মন্ত্র, বিচারহীন আচারাদির প্রতি যে কি রকম খড়্গহস্ত ছিলেন তা তাঁর নানা উক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তার কিছু নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

"Every system, therefore, which weakens the mind, makes one superstitious, makes one mope, makes one desire all sorts

of wild impossibilities, mysteries and superstitions, I do not like, because its effect is dangerous. Such systems never bring any good ; such things create morbidity in the mind, makes it weak, so weak that in course of time it will be almost impossible to receive truth or live up to it."

অর্থহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

—'The freedom of the soul', London, 5th Nov., 1896. Complete works, ১ম সং, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২০১।

"Think of the last six hundred or seven hundred of years of degradation, when grown-up men by the hundreds have been discussing for years whether we should drink a glass of water with the right hand or the left, whether the hand should be washed three times or four times, whether we should gargle five or six times. ....We are just 'Do no't touchist !' Our religion is in the kitchen. Our God is the cooking-pot, and our religion is 'Do not touch me, I am holy'.............

"It is a sure sign of softening of the brain when the mind can not grasp the higher problems of life, the originality is lost, the mind has lost all its strength, its activity and its power of *thought*, and *just tries to go round and round the smallest curve it can find*."

—'Reply to Manamadura address'.
Complete Works, ১ম সং, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৬৭।

উপরের উক্তিতে বিবেকানন্দ 'ছুঁৎমার্গ' বা অস্পৃশ্যতাকে কি রকম তীব্র কষাঘাত করেছেন, বিশেষভাবে তা লক্ষণীয়।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দণ্ডহস্ত বিবেকানন্দ

লৌকিক আচার যে ধর্মের উৎস নয় তা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন :

"The greatest mistake made is that ignorant people always think that this local custom is the essence of our religion...... This you have always to remember, that because a little custom

is going to be changed, you are not going to lose your religion, not at all."

—'Reply to the address at Madura'.
Complete Works, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৭৩।

"Superstitions are all materialism, because they are all based on the consciousness of body, body, body. No spirit there. Spirit has no superstition—it is beyond the vain desires of the body."

—'Is Vedanta the future religion'?
Sanfrancisco, April-8, 1900.
Complete Works, অষ্টম খণ্ড, পৃ ১৩৩।

অন্ধ সংস্কার বস্তু-সর্বস্বতার নামান্তর

দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ অন্ধ সংস্কারকে বস্তুসর্বস্বতার নামান্তর বলে মনে করেছেন এবং সেগুলিকে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার বা আত্মিক সাধনার প্রবল পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন। সত্য ধর্মের লক্ষণ কি? বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন:

"And here is the test of truth, anything that makes you weak physically, intellectually and spritually, reject as poison; there is no life in it, it can not be true. Truth is strengthening. Truth is purity, truth is all knowledge; truth must be strengthening, must be enlightening, must be invigorating.……

"Give up these weakening mysticism, and be strong. Go back to your Upanishads, the shining, the strengthening, the bright philosophy, and part from these mysterious things, all these weakening things. Take up this philosophy; the great truths are the simplest things in the world, simple as your own existence. The truths of the Upanishads are before you. Take them up, live up to them, and the salvation of India will be at hand."

—'My plan of campaign'. Complete Works,
তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২২৪—২২৫।

এখানে দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ উপনিষদের মুক্ত সহজ আনন্দ-ধর্ম গ্রহণের মধ্যেই ভারতের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন।

উপনিষদের আনন্দবাদ, ভারতের মুক্তি

ধর্মকে পুঁথির প্রাচীরে আবদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট উক্তি করেছেন :

"You will find that astrology and all these mystical things are generally signs of a weak mind ; therefore as soon as they are becoming prominent in our minds, we should see a physician, take good food, and rest."

—'Man, the maker of his destiny'.
Complete Works, অষ্টম খণ্ড, পৃ ১৮৪।

অর্থহীন আচারাসক্তি দুর্বল মনের পরিচায়ক

লক্ষ করবার বিষয়, বিবেকানন্দ পঞ্জিকার অচলায়তনের প্রতি অন্ধ আসক্তিকে আমাদের দুর্বল দেহ ও অসুস্থ মনের অহেতুক ভীতির ফলশ্রুতি বলেই নির্দেশ করেছেন। পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম অর্থাৎ এককথায় দেহের ও মনের স্বাস্থ্যই হল, এই ভূতের ভয়, অদ্ভুতের অনুশাসন ও অকারণের অন্ধ অনুজ্ঞার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায়।

বিবেকানন্দ আরও বলেছেন :

"True religion comes not from the teaching of men, or the reading of books ; it is the awakening of the spirit within us, consequent upon pure and heroic action."

—'Indian religious thoughts'. Complete Works,
চতুর্থ খণ্ড, পৃ ১৮৬।

"I do not call it a religion so long as it is confined to books and dogmas.······Move onward and carry into practice that which you are very proud to call your religion, and God bless you."

—১৭নং পত্র, Washington, 27th Oct., 1894.
Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ৩৯।

বিকৃত পৌরোহিত্যের স্বার্থবোধ এবং যুগসঞ্চিত স্বেচ্ছাচার, নিপীড়ন ও প্রতারণা ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে কতখানি বিষাক্ত ও পঙ্গু করে তুলেছিল

সে সম্বন্ধে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন ছিলেন। তাই পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বাণী ঝলছে উঠেছিল। 'দুষ্টু পুরুত'-গুলোকে তাড়াতে না পারলে ধর্মের মুক্তির কোনো আশা নেই, এ কথা তিনি জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন :

বিকৃত পৌরোহিত্যকে কষাঘাত

"Sitting down these hundreds of years with an ever-increasing load of crystallised superstitions on your head, for hundreds of years spending all your energy upon discussing the touchableness or untouchableness of this food or that, with all humanity crushed out of you by the continuous social tyranny of ages,—what are you ?·········Is there not water enough in the sea to drown you, books, gowns, university-diploma s, and all ?··

"Come, be men ; kickout the priests who are always against progress, because they would never mend, their hearts would never become big. They are the offspring of centuries of superstitions and tyranny.·········Come out of your narrow holes and have a look abroad. See how nations are on the march."

—Yokohama, 10th July, 1893.

৩নং পত্র, Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ৮।

বিবেকানন্দ অত্যন্ত খেদ করেই বলেছিলেন :

"Well, do you think there is any religion left in India ? The paths of Knowledge, Devotion, and Yoga—all have gone, and now there remains only that of 'Do n't touchism'.······The whole world is impure, and I alone am pure. Lucid Brahmajnanam ? Bravo, Great God ; Now a days Brahmajnanam is neither in the recesses of the heart, nor in the highest heaven, nor in all beings ;—now He is in the cooking pot."

—দশ নং পত্র, 1894. Complete Works, সপ্তম খণ্ড, পৃ ৪১৮।

অন্ধ আচার এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে অনুরূপ তীব্র বিদ্রোহের নজির রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বিবেকানন্দের মতো প্রবল বন্ধন-

অসহিষ্ণুতার মনোভাব সেখানে সমভাবে সক্রিয়। উভয়ের চিন্তার স্বাজাত্যও লক্ষণীয়। তার কিছু দৃষ্টান্ত নীচে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"মানুষ যতোবারই কৃত্রিম আচার পদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার সুবিধা মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে, ততোবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে।"

—'ধর্মশিক্ষা'। শিক্ষা।

রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১১শ খণ্ড।

"মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে, কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে তুলেছে। ....ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নূতনকে আনে সেই নূতনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজো করে।

"এই জন্যেই ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন ঝড় হয়। তবে মুক্তি।"

—'অমৃতের পুত্র'। শান্তিনিকেতন, দ্বিতীয় খণ্ড।

বিকৃত আচার ও শাস্ত্রসর্বস্বতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ

'সোনার তরী' কাব্যের 'দেউল' কবিতাতেও এই ভাবটিই পরিস্ফুট।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে কবি পুঁথি ও শাস্ত্রসর্বস্বতার সমালোচনা করে লিখলেন:

"মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনা বাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যাস যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না।"

"মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধি-বিধানে এই কথাটা যে দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এই জন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং

সেইদেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।"

—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর।
রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১৩শ খণ্ড।

ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র, এ দুটি যে এক জিনিস নয় তা কবি জোরের সঙ্গে বার-বার ব্যক্ত করেছেন:

"মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধু ধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয় ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতো বড়ো অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"

ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র

—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর।
রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১৩শ খণ্ড।

পঞ্জিকার প্রাচীর

"ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যতো বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না।"

—'ছোটো ও বড়ো'। কালান্তর।

এই জন্যেই যে 'পঞ্জিকার প্রাচীর' আমাদের খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে কবি ধুলিসাৎ করতে চেয়েছেন ঃ

"আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষভাবে উদ্‌যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।"

—'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'। শিক্ষা।
রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১১শ খণ্ড।

সংস্কারের প্রাকারের উপর, সম্প্রদায়গত ধর্মমোহের উপর, সংকীর্ণ আচারের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাতের কথা রবীন্দ্র-বাণীতে বারবার প্রকাশ পেয়েছে ঃ

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মরে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর ;
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
ধর্মমোহ শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।
বিধর্ম বলি মারে পর ধর্মেরে
নিজধর্মের অপমান করি ফেরে ;
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে।
পূজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এযে শয়তান ভজা।
হে ধর্মরাজ, ধর্ম-বিকার নাশি,
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে,
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে ;—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

—'ধর্মমোহ'। পরিশেষ।

'অচলায়তন' নাটকে কবি এই 'ধর্মকারার প্রাচীরে' বজ্র হানার কথাই

ব্যক্ত করেছেন। 'তাসের দেশ' নাটকে কবি মননহীন নিয়মসর্বস্বতা এবং অন্ধ মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তিকে কঠোর আঘাতে, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, দুজনেই সংকীর্ণ সংস্কার ও বিচারহীন আচারের বিরুদ্ধে দণ্ডহস্ত হয়েছিলেন, কারণ উভয়েই জাতীয় চিত্তের তামসিকতার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। এই তামসিকতা আবার অনেক সময়ে আসে সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে; অন্ধচিত্তের স্থবিরতাকে ও অসাড়তাকে সমাহিত চিত্তের চরম বিবিক্তি বলে ভুল হয়, নিষ্প্রাণতাকে মনে হয় সংযম। কিন্তু স্রোতোহীন অবরুদ্ধ জলাশয়ের নিথর নিস্পন্দতা এবং অসীম সমুদ্রের স্থির অটল গাম্ভীর্য তো এক জিনিস নয়। যে তামসিক বৃত্তি প্রবল তীব্রতায় আত্মপ্রকাশ করে তাকে চেনা যায়, তার প্রত্যক্ষ জোরের মূর্তিটার সঙ্গে লড়াই করাও বোধ হয় কিছুটা সহজ। কিন্তু সত্ত্ব-গুণের ছদ্মবেশে যে তমোগুণ চিত্তকে গ্রাস করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো প্রাণশক্তিকে আহরণ করার চেয়েও অধিক দুরূহ তাকে আবিষ্কার করবার প্রাথমিক পর্যায়। কারণ, প্রত্যক্ষতঃ বাইরে থেকে তখন উভয়কেই এক মনে হয়। বিবেকানন্দ তাই অলস মন্থর জীবনবিমুখ চিত্তবৃত্তিকে, তামসিক নিষ্প্রাণতাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করে বলেছেন:

তামসিকতা ও সাত্ত্বিকতা

"Inactivity as we understand it in the sense of passivity, certainly cannot be the goal. Were it so, then the walls around us would be the most intelligent; they are inactive. Clods of earth, stumps of trees would be the greatest sages in the world; they are inactive. Nor does inactivity become activity, when it is combined with passion. Real activity, which is the goal of Vedanta, is combined with eternal calmness, the calmness which cannot be ruffled, the balance of mind which is never disturbed, whatever happens. And we all know from our experience in life, that is the best attitude for work."

—London, 10th Nov. 1896.,
'Practical Vedanta (Part-1)',
Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৯০।

"The fall from Sattva brings one down headlong into Tamas. That is what happened to them. Do you think that a man who does not exert himself at all, who only takes the name of Hari, shutting himself up in a room, who remains quiet and indifferent even when seeing a huge amount of wrong and violence done to others before his very eyes, possesses the quality of Sattva? Nothing of the kind, he is only enshrouded in dark Tamas."

—Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-২৬৮।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন :

"সত্ত্বপ্রধান অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃ-প্রাধান্যে ভালোমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, একথার জবাব দাও, নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়—'ফলেন পরিচীয়তে'। সত্ত্ব-প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি মহাবীর্যের পিতা।"

—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', ১৮শ সংস্করণ। পৃ-১২।

বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে এইজন্যে বলেছেন :

"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজ অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে; সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"

—'ভাববার কথা'।

রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে অনুরূপ উক্তি করেছেন :

"জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি তো লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচলপ্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে তাহাই শান্তি। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।"

—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'। ধর্ম।
রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১২শ খণ্ড।

সাত্ত্বিকতার ছদ্মাবরণে যখন তামসিকতা জাতির মজ্জায় প্রবেশ করে তখন তার ফল হয় অত্যন্ত শোচনীয়। বিকৃত তথাকথিত সংযমের সাধনায় জাতীয় চিত্ত তখন চরম আত্মপ্রতারণাকে বরণ করে নিয়ে জড় বা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। চিত্তের এই নির্জীবতা ও নির্বীর্যতাকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে কঠিন আঘাতে জর্জরিত করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথার অবতারণা করা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই বুদ্ধদেবের প্রতি শুধু অসীম শ্রদ্ধাশীলই ছিলেন না, তপস্বী গৌতমের মৈত্রী ও করুণার আদর্শে তাঁরা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ সত্যের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁদের নানা উক্তি ও রচনায়। বিবেকানন্দ তাঁকে বিরল অবতারের আসনে বসিয়েছেন :

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

"Rama, Krishna, Buddha, Chaitanya, Nanak, Kabir and so on are the true Avataras ; for they had their hearts broad as the sky."

—Complete Works, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৫৪। ১২২ নং পত্র।

'জ্ঞানযোগ'-এ কর্মজীবনে বেদান্তের ভূমিকা প্রসঙ্গে, চিকাগো বক্তৃতায় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ('Buddhism, the fulfilment of Hinduism') এবং বিভিন্ন সময়ে 'ভারতের মহাপুরুষগণ', 'জগতের মহত্তম আচার্যগণ' সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যে-সকল উক্তি করেছেন তার মধ্যে বুদ্ধদেবের চিন্তা, কর্ম ও সত্যানুসন্ধানের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। বুদ্ধদেবকে তিনি 'ধর্মজগতের ওয়াশিংটন' বলে অভিহিত করেছেন ('দেববাণী'), কারণ 'তিনি সিংহাসন জয়

করেছিলেন শুধু জগতকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিন জাতির জন্য করেছিলেন'।

যে "রাজপুত্র 'তারিলাগি' পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বিরাগী পথের ভিক্ষুক", সেই ভগবান তথাগতের করুণাঘন আদর্শের জয়গানে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বহু অংশই যে মুখর এবং অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত, এ কথা নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালের বৌদ্ধদের ত্যাগসর্বস্ব উদাসীনতাকে সর্বথা সমর্থন করেন নি। অর্বাচীন বৌদ্ধদের নেতিমূলক জীবন-বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ডমুখীনতা এই দুই চিন্তানায়কের প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল।

বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য' প্রবন্ধে বলেছেন, "বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গ ই প্রধান হল।"

—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', অষ্টাদশ সংস্করণ, পৃ-৭।

বুদ্ধদেবের সাত্ত্বিকতা ও অর্বাচীন বৌদ্ধদের তামসিকতা

সেটা কখন ঘটলো?—"খামখা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক্ না ওদিক্। যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক্ উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে।"

—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' ১৮শ সংস্করণ, পৃ—৮।

তিনি আরও বললেন, ঃ

"ঐ জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি, —দেশশুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না, আজ হাজার বৎসর।"

—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', ১৮শ সং, পৃ-১৩।

'পরিব্রাজক' প্রবন্ধেও লেখক বৌদ্ধধর্মের জীবনবিমুখ ঔদাসীন্য ও কর্মকাণ্ডবহুল তান্ত্রিকতার অর্বাচীন রূপটির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তাকে জর্জরিত করেছেন।

—'পরিব্রাজক', দশম সংস্করণ, পৃ-৫৭-৫৮।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' অনুসরণ করতে গিয়ে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 'হিন্দু ধর্মের বিদ্রোহী সন্তানটির সাধনার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে যথার্থই লিখেছিলেন ঃ

"ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—

সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথা পালনের দ্বারা নহে—এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন।"

—'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'। ইতিহাস, ১ম সং, পৃ ৩৪-৩৫।

কিন্তু কর্মকাণ্ডের আচার ও অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার তামসিকতা থেকে মুক্তির বার্তা নিয়ে যার আগমন ঘোষিত হয়েছিল, ইতিহাসের ধারায় সেই "বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনো কালেই করে নাই" ('ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস, ১ম সং, পৃ—৩৫) এ তথ্যটিও সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। 'অচলায়তন' নাটকে নাম, সঙ্কেত ও রূপকের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আচার-সর্বস্ব অন্ধতার রূপটির প্রতি কবি ইঙ্গিত করেছেন।

তথাগতের আদর্শের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও এবং সেই আদর্শের দ্বারা বহুলাংশে অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে ইতিহাসের ধারায় ধর্ম ও সমাজ জীবনে বৌদ্ধদের পরবর্তী ভূমিকার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছেন; কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবকে সর্বথা অনুসরণ করে চলতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার কথা বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত তাঁর 'Buddhism, the Fulfilment of Hinduism' ভাষণেও (26th Sept., 1893) স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

—(Vol.-1, Complete Works).

আসল কথা, হৃদয়হীন অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার শৃঙ্খল থেকে সমাজের মুক্তি-কামনায় শাক্যসিংহ যে মৈত্রী-করুণাঘন সাত্ত্বিক ধর্মচেতনায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে অনেক বৌদ্ধ সেই সত্যচর্যা থেকে বিচ্যুত হয়ে কর্মবিমুখ তামসিক তান্ত্রিকতায় মগ্ন হয়েছিলেন। কঠোর শুষ্ক কৃচ্ছ্রসাধনা ও ধারাবাহিক স্থবির অভ্যাসের স্তূপের অন্তরালে তাঁদের চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়ধর্ম চাপা পড়ে গিয়েছিল। পূর্ণতার সাধনায় পথভ্রান্তি রিক্ততার মরু-মরীচিকায় চিন্তা ও কর্মকে দিশাহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক।

বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও করুণাদর্শের মূলে ছিল যে বিশাল হৃদয়ের বিস্তার, যে অসীম প্রেম, তা অর্বাচীন কালে সম্যক্‌রূপে অনুসৃত হতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ বৌদ্ধদের এই বিচ্যুতি এবং অভাবের দিক্‌টার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

রাজসিকতার সাহায্যে তামসিকতার বিনাশ না ঘটালে সাত্ত্বিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। তাই উভয়েই জাতিকে ওজস্বী ও রজোগুণ-সম্পন্ন হবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন; কাপুরুষতাকে কেউই সাত্ত্বিকতার লক্ষণ বলে মনে করেন নি। বীর সন্ন্যাসীর কণ্ঠে নানা প্রসঙ্গে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে বারবার: "মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর," কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই দুর্বলতাই 'মানুষ' হওয়ার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। তিনি স্পষ্টই বলেছেন:

তামসিকতা ও রাজসিকতা

"অন্যায় কোরো না, অত্যাচার কোরো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ।"

—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', ১৮শ সং, পৃ—১০।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

—'নৈবেদ্য'।

বামাচারের বিরুদ্ধে উভয় চিন্তানায়ক তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। লৌকিক শক্তিপূজাকে তাঁরা প্রীতির চোখে দেখতে পারেন নি; কারণ, এ সাধনাতে বিচার-বুদ্ধির স্থান নেই; এই জীবন-বিমুখ তামসিক তান্ত্রিকতায় সত্য ও নিত্য ধর্ম ব্যাহত, লোভ তার লক্ষ্য, হিংসা তার পূজা-উপচার। এখানেও উভয়ে চিন্তার তামসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন দেখতে পাই।

বামাচার

বিবেকানন্দ বলেছেন:

"Give up this filthy Vamachara that is killing your country. ......When I see how much the Vamachara has entered our society, I find it a most disgraceful place with all its boast of culture. These Vamachara sects are honey-combing our society in Bengal. Those who come out in the day-time and preach most loudly about Achara, it is they who carry on the horrible

debauchery at night, and are backed by the most dreadful books. ......The Bengalee Shastras are the Vamachara Tantras. They are published by the cart-load and you poison the minds of your children with them, instead of teaching them your Shrutis. Fathers of Calcutta, do you not feel ashamed that such horrible stuff of these Vamachara Tantras, with translations too, should be put into hands of your boys and girls, and their minds poisoned, and that they should be brought up with the idea that these are the Shastras of the Hindus? If you are ashamed, take them away from your children, and let them read the true Shastras, the Vedas, the Gita, the Upanishads."

—'The Vedanta in all its phases.'

'Complete Works' তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩৪০—৩৪১।

রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুরূপ মত পোষণ করেছেন :

"একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটি কথা ভাববার আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন কি, নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তি-পূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলার জয় থেকে শুরু করে জ্ঞাতিশত্রুর বিনাশ-কামনা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তি-পূজায় স্থান পায়। একদিকে দেব-চরিত্রের হিংস্রতা, অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা.........।"

—'শক্তিপূজা'। কালান্তর।

'মালিনী' নাট্যকাব্য, 'রাজর্ষি' উপন্যাস বা 'বিসর্জন' নাটক, 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধ ('কালান্তর') প্রভৃতি নানা রচনার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধ তামসিক শক্তি-সাধনার বিরুদ্ধে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে লেখনী চালনা করেছেন।

চিন্তার তামসিকতার মূলে আছে বুদ্ধিবৃত্তির ভীরুতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বুদ্ধিবৃত্তির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা"। ('শিক্ষার মিলন'। কালান্তর।)

অর্থহীন সংস্কারের সহস্রপাকে শৃঙ্খলিত মনের বন্ধনদশা দূর করবার একমাত্র

উপায় হল বুদ্ধির মুক্তি। যুক্তিহীন আচার-সর্বস্বতার মূলোচ্ছেদ ঘটতে পারে বিচার-বোধের জাগরণের মধ্য দিয়ে। মনের মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাইরে আসতে পারছে না; তাই আত্মশক্তির সুপ্তিভঙ্গের কথা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে। বুদ্ধিনিষ্ঠা অর্থাৎ যুক্তি-বোধের জাগরণের প্রয়োজনীয়তা বিবেকানন্দের বাণীতে আত্যন্তিক প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

বুদ্ধির ভীরুতাই তামসিকতা

"Religion must become broad enough. Everything it claims must be judged from the standpoint of reason. Why religions should claim that they are not bound to abide by the standpoint of reason, no one knows. If one does not take the standard of reason, there can not be any true judgement, even in the case of religions. ....Referring to books will not do. Where is the standard by which you can compare? There must be some independent authority, and that can not be any book, but something which is universal; and what is more universal than reason?"

—'Practical Vedanta (Part-III)', London 17th Nov. 1896;
Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৩৩।

"We should therefore follow reason, and also sympathise with those who do not come to any sort of belief, following reason. For it is better that mankind should become atheist by following reason than blindly believe in two hundred millions of gods on the authority of any body. What we want is progress, development, realisation. No theories ever made men higher. No amount of books can help us to become purer. The only power is in realisation, and that lies in ourselves and comes rom thinking. Let men think. A clod of earth never thinks; but it remains only a lump of earth. The glory of man is that he is a thinking being. It is the nature of man to think and

there in he differs from animals. I believe in reason and follow reason having seen enough of the evils of authority, for I was born in a country where they have gone to the extreme of authority."

—'Practical Vedanta (Part III)', London 17th Nov. 1896 ; Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৩৪।

মানসিক দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই আমাদের জাতীয় চিত্তের জড়ত্ব, সকল বিকৃতি ও অসুস্থতার মূলে ; সেই দুর্বলতার রন্ধ্রপথেই মনের অচলায়তনে বাসা বেঁধেছে যতো অন্ধ সংস্কার এবং বিচারহীন বিশ্বাস। জাতীয় জীবনের এই অসুস্থতা থেকে নিরাময়তার জন্যে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন আত্মশক্তির উপর সুমহৎ আস্থা। বিবেকানন্দ বললেন :

"What we want is strength, so believe in yourselves. We have become weak, and that is why occultism and mysticism come to us, these creepy things. ....Make your nerves strong. What we want is mucles of iron and nerves of steel. We have wept long enough. No more weeping, but stand on your feet and be men. It is a man-making religion that we want. It is man-making theories that we want. It is man-making education all round that we want."

—'My plan of campaign'. Complete Works, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-২২৪।

বীর সন্ন্যাসী আত্মশক্তির নির্ভীক উদ্বোধনমন্ত্রই ঘোষণা করেছেন ; তিনি সেই ধর্মকেই কামনা করেছেন যা পূর্ণ মানুষ গড়ে তুলবে।

আত্মশক্তির উদ্বোধন

রবীন্দ্রনাথও এই বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবোধের উজ্জীবনের বাণী বার বার উচ্চারণ করে গেছেন। তিনি স্পষ্টই বললেন :

"দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে বসাতে হবে।"

—'সত্যের আহ্বান'। কালান্তর।

"মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড

বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি।"

—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর।

ঋষি-কবির কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়েছে অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের-প্রতাপমুক্ত আত্মার সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আবাহন-মন্ত্র:

"ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো'।"

—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে মন্ত্রতন্ত্রের সম্বন্ধে তীব্র বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সকল মন্ত্রের প্রতি তাঁদের মনোভাব প্রতিকূল নয়। যে মন্ত্র অভ্যস্ত শব্দের পুনরাবৃত্তিমাত্র, যার সঙ্গে জ্ঞানের কোনো যোগ নেই সেই 'মননহীন মন্ত্র' সম্বন্ধেই তাঁদের এ সকল উক্তি প্রযোজ্য।

বিবেকানন্দ বলেছেন:

"Sacrifices, genuflexions, mumblings and mutterings are not religion. They are only good if they stimulate us to the brave performance of beautiful and heroic deeds, and lift our thoughts to the apprehension of the divine perfection."

—'Indian religious thoughts'. Complete Works,

চতুর্থ খণ্ড, পৃ-১৮৭।

তন্ত্রমন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত বিবেকানন্দের মতের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"মন্ত্র জিনিষটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয় মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি।"

—'মন্ত্রের বাঁধন'। শান্তি নিকেতন (৮)।

রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, পৃ—৪২৩-২৪।

"মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননের সাহায্য করা।"

—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় ; বিশ্বভারতী সং,
পৃ—৫০৬-৭।

সঙ্কীর্ণ, বিকৃত, মোহগ্রস্ত ধর্মাদর্শের চেয়ে যে নাস্তিকতাও কাম্য ও বরণীয় এ মত বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পোষণ করতেন :

"I would rather see every one of you rank atheist than superstitious fools, for the atheist is alive, and you can make something out of him. But if superstition enters, the brain is gone, the brain is softening, degradation has seized upon the life.······Avoid all mystery. There is no mystery in religion",

—'The work before us'. Complete Works,
৩য় খণ্ড, পৃ—২৭৮।

"We should therefore follow reason, and also sympathise with those who do not come to any sort of belief, following reason than blindly believe in two hundred millions of gods on the authority of any body. What we want is progress, development,, realisation"

—'Practical Vedanta (Part-III)', Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৩৪।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ধারণাই ব্যক্ত করেছেন ; তিনি 'ধর্মমোহ' কবিতায় ('পরিশেষ') বলেছেন :

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।"

বিকৃত আস্তিকতার চেয়ে যে নাস্তিকতাও ভালো, তা রবীন্দ্রনাথ একবার রোমাঁ রোলাঁকেও কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"As a matter of fact, to-day Indian religious life suffers from the lack of a wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion. Even a vogue of atheism may do good to India to-day. ……It will sweep away all obnoxious undergrowths in the forest and the tall trees will remain intact. At the present moment even a gift of negation from the West will be of value to a large section of the Indian people".

—Rolland and Tagore.

ঐ একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মনীষী কবি তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের জ্যাঠামশায় চরিত্রটিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে অঙ্কিত করেছিলেন একথা সহজেই বোঝা যায়।

নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সংস্কারপন্থীর দল যেমন একদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক অর্থহীন অনুশাসন ও আচারাদির মোহকে দূর করবার জন্যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, অন্য দিকে তেমনই একটি শিক্ষিত রক্ষণশীল গোষ্ঠী হিন্দুধর্মের আচার ও অনুশাসনমাত্রেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, একথা উনবিংশ শতকের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে ধর্মের পুনরুজ্জীবনের নামে যুক্তিহীন অন্ধ আচারগুলিকেও বৈজ্ঞানিক বুলি বা দার্শনিক্ ব্যাখ্যা দিয়ে 'যেনতেন প্রকারেন' শোধন করে শিক্ষিত সমাজের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে গিয়ে অনেক সময়েই যে তাঁরা যুক্তির স্থলে অপযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের সে প্রয়াস কোনো কোনো স্থলে হাস্যকর হয়ে পড়েছিল তা বলাই বাহুল্য। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উক্তি ও রচনায় এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করেছিলেন; কারণ আপন ধর্ম ও সমাজের আবর্জনাগুলিকেও নানা উপায়ে সমর্থন করার ও সেগুলির অনুকূলে সমর্থন সংগ্রহ করার প্রচেষ্টার মূলে যে গোঁড়ামির পরিচয় মেলে তার পশ্চাতেও আছে একধরণের মানসিক মোহ এবং তৎসঞ্জাত বুদ্ধিবৃত্তির আচ্ছন্নতা।

বিচারহীন আচারের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উদ্ভট ব্যাখ্যার প্রতিবাদ

বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' প্রবন্ধে স্পষ্টই প্রশ্ন তুললেন:

"তোমাদের আহাম্মকিগুলিকে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে?"

—প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্য, ১৮শ সংস্করণ, পৃ—১৮।

'The work before us' প্রবন্ধে তিনি বললেন :

"There is the man educated, but a sort of monomaniac, who wants to explain the omen of this and that. He has philosophical and metaphysical, and Lord knows what other puerile explanations for every superstition that belongs to his peculiar race, or his peculiar gods, or his peculiar village. Every little village superstition is to him a mandate of the Vedas, and upon the carrying out of it according to him, depends the national life. You must be beware of this."

—'The work before us'. Complete Works,
৩য় খণ্ড, পৃ—২৭৮।

"Shame on humanity that strong men should spend their time on these superstitions, spend all their time in inventing allegories to explain the most rotton superstitions of the world".

—'The work before us'. Complete works,
৩য় খণ্ড, পৃ—২৭৯।

'আর্যামি' এবং তা থেকে সমুদ্ভূত এই মনোভাবকে সমভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নানা লেখায় তিনি প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে এই মানসিকতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছিলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল, ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল।

"যখনি আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনি তাঁহারা বিপদকে উপস্থিত মতো ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন।"

—'ধর্মশিক্ষা'। শিক্ষা।

কিন্তু মানুষ যে প্রাচীন অভ্যাসের আবরণে আপনার মঙ্গলকে সকল সময় আড়াল করে রাখে অথবা জড় সংস্কারের স্তূপে আপন শ্রেয়ঃ তপস্যার সমাধি ঘটায় তাও নয়; অনেক সময় সে আপনার নানা রচনাবাহুল্যের দ্বারা,

সঞ্চয়ের আতিশয্যের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করতে গিয়ে আপনার চেয়ে বড়োকে হারায়। কোথাও সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা, কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে বসে। উপকরণ ততক্ষণই সার্থক যতক্ষণ তা অন্তঃকরণের বিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু যখন তা স্ফীত হয়ে পাষাণভারের মতো অন্তরের উপর চেপে বসে তার উৎসমুখকে অবরুদ্ধ করে দেয়, তখন তা মানবাত্মার পূর্ণতা-প্রয়াসকে ব্যাহত ও খণ্ডিত করে। অতিবস্তুতান্ত্রিকতা যে আত্মিক সাধনা তথা ধর্ম-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে প্রচণ্ড বাধা হিসাবে উপস্থিত হতে পারে, এ সাবধান-বাণী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উচ্চারণ করেছেন।

বস্তুতান্ত্রিকতার আতিশয্য ধর্মজীবনের বাধা

বিবেকানন্দ বলেছেন:

"Man can not always think of matter, however pleasurable it may be.······It is very well that we should take care of this world. But if too much attention to the spiritual may affect a little our practical relations, too much attention to the so-called practical hurts us here and here after. It makes us materialistic.

—'The necessity of religion'. Complete works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৬৪।

"In our sight, here in India, there are several dangers. Of these, the two, scylla and charybdis, rank materialism and its opposite, arrant superstition, must be avoided."

—'The work before us'. Complete Works,
৩য় খণ্ড, পৃ ২৭৮।

উপকরণের আতিশয্য যে ধর্ম-জীবনের বাধা, বস্তু-সর্বস্ব সভ্যতা যে আত্মিক সাধনাকে বিপর্যস্ত করছে, এ সাবধান-বাণী রবীন্দ্রনাথও পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেছেন:

"অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।"

—'শিক্ষার বাহন'। শিক্ষা।

"উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।"

—'শিক্ষার বাহন'। শিক্ষা।

"একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি···।"

—'শিক্ষার মিলন'। কালান্তর।

"একরোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি এক ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌচচ্ছে?"

—'শিক্ষার মিলন'। কালান্তর।

মানবাত্মার সাধনা রিক্ততাতেও নয়, বহুলতাতেও নয়, তার সার্থকতা পূর্ণতায়।

সঞ্চয়ের আধিক্য, বস্তুতান্ত্রিকতার বাহুল্য মানুষের আত্মাকে কেমনভাবে সংকীর্ণ ও বদ্ধ করে তুলতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের নাটকেও প্রদর্শিত হয়েছে। 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাচ্য বিচারহীন আচারের দ্বারা আচ্ছন্ন ও আত্মবিস্মৃত, পাশ্চাত্ত্য বস্তু-সর্বস্বতার ভারে রুদ্ধশ্বাস। এর জন্যে চাই কি?—চাই পূর্ব এবং পশ্চিমের চিত্তের সম্মিলন। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই উভয়ের মুক্তি সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে, বস্তু ও আত্মার পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে। আত্মার বিকাশে বস্তু যে-পরিমাণে আনুকূল্য করে তাই দিয়েই তার সার্থকতার বিচার। লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে উপলক্ষ্য যতখানি সহায়তা করবে তার সাহায্যেই উপলক্ষ্যের উপযোগিতা নিরূপিত হবে।

পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন চাই

জাতির ধর্মজীবন তথা সমাজ-জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রাচ্যের স্থাবরতা ও পাশ্চাত্ত্যের জঙ্গমশক্তি, পূর্বের সাত্ত্বিকতা ও পশ্চিমের রাজসিকতা এই দুই-এর সম্মিলন চাই, একথা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ব্যক্ত করেছেন।

বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ

"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্ত্যে সেই প্রকার সত্ত্ব-

গুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"

—'বর্তমান সমস্যা'। ভাববার কথা।

"Can you become an occidental of occidentals in your spirit of equality, freedom, work and energy, and at the same time a Hindu to the very backbone in religious culture and instincts ? This is to be done and we will do it. You are all born to do it."

—পত্র, ২৪ জানুয়ারী, ১৮৯৪। Complete Works,
পঞ্চম খণ্ড, পৃ—২৬।

পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের জন্যেই পূর্বপশ্চিমের মিলনের প্রয়োজন। বিবেকানন্দ স্পষ্টই বললেন :

"The West is groaning under the tyranny of the shylocks, and the East is groaning under the tyranny of the priests ; each must keep the other in check."

—Reply to the address at Paramakudi.
Complete Works, তৃতীয় খণ্ড, পৃ—১৫৮।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন তা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় :

"অল্পদিন পূর্বে বাঙলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

—'পূর্ব ও পশ্চিম'। সমাজ ;
রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১৩শ খণ্ড, পৃ—৫৫।

এই পূর্ব-পশ্চিমের সাধনার সম্মিলনের কথা রবীন্দ্র-বাণীতে বারবার ব্যক্ত হয়েছে ; কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন :

"পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক্ মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যতো-কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে।"

—'পূর্ব ও পশ্চিম'। সমাজ।

তাই তিনি বললেন :

"পশ্চিম মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে ; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা ; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর, পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে।...এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব, আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।"

—'শিক্ষার মিলন'। কালান্তর।

দেখা যাচ্ছে, বাঁচবার তাগিদেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয় প্রয়োজন, পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের মধ্য দিয়ে মানব-সমাজের চিত্তমুক্তির বৃহৎ ক্ষেত্র রচিত হতে পারে, এ সত্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিশেষভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং সেই জন্যেই জনমনে তাঁদের এই উপলব্ধিকে নানাভাবে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়

১

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি,—ভারতীয় ধর্মসাধনায় এই তিনটি মুখ্য মার্গ বলে স্বীকৃত। ব্যক্তিগত প্রবণতা ও 'অধিকারিভেদ' অনুসারে এদের যে-কোনো একটিকে অবলম্বন করে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া চলতে পারে বলে অনেক সাধক মহাপুরুষ-শ্রেণীর ব্যক্তি বা ধর্মগুরু মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ অথবা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তাঁরা এই তিন পথের কোনোটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতে পারেন নি; তাই তাঁরা এ বিষয়েও সমন্বয়বাদী হয়ে উঠেছেন। তাঁরা চেয়েছেন ত্রিবেণী-সঙ্গম, অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়; কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, এরা পরস্পরের পরিপূরক, এদের সামঞ্জস্যেই সাধন-পন্থার পূর্ণতা।

এদের একের অনুপস্থিতিতে অপরের বিকারাশঙ্কা স্বাভাবিক; কারণ এই অনুপস্থিতির পরিণতি হল ভারসাম্যের অভাব, এবং সেই ভারসাম্যের অভাবে পথিকের পদস্খলন ও পথ-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। প্রেম বা ভক্তিরসের অভাবে জ্ঞানের পথ কঠোর শুষ্ক কৃচ্ছ্রতার উষর মরুতে পরিণত হয়। আবার জ্ঞানহীন ভক্তি রস-সাধনার বিকৃতিতে ভাবালুতা-সর্বস্ব পঙ্কিল মত্ততায় পর্যবসিত হবে এটাই স্বাভাবিক। জ্ঞানহীন কর্ম উপকারের চেয়ে অপকারের কারণ হয় বেশি, কারণ কর্ম সেখানে কোনো মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা ধ্রুব লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না; কর্মহীন জ্ঞান বন্ধ্যা, মানব সমাজের কোনো উপকারে আসে না, শুধু পুঁথির কলেবর আর অকারণ তর্কের পরিধি বাড়িয়ে চলে। নিষ্ঠাশূন্য বা ভক্তিহীন কর্ম সাফল্যলাভ করে না, কারণ সেখানে কর্মের সঙ্গে অন্তরের কোনো যোগ নেই; আর নিষ্ঠা ও কর্মহীন ভক্তি অলস কল্পনা বা ভাবাবেগের নামান্তর মাত্র।

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির বিকৃতি ও তার অপনোদন

এই তিনের মিলনেই পূর্ণতা। যে কর্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রেমের দ্বারা প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে ওঠে সেই কর্মই শ্রেয়ঃ সৃষ্টির উৎস হয়ে দেখা দেয়।

বিবেকানন্দ তাই বললেন :

"By trying to force people into narrow limits you degrade them into animals and unthinking masses. You kill their moral life. What is now wanted is a combination of the greatest heart with the highest intellectuality, of infinite love with infinite knowledge.·········Existence without knowledge and love cannot be ; knowledge without love, and love without knowledge cannot be. What we want is the harmony of Existence, Knowledge and Bliss Infinite. For that is our goal. We want harmony, not one-sided development. And it is possible to have the intellect of a Shankara with the heart of a Buddha. *I hope we shall all struggle to attain to that blessed* combination."

—'Maya and Freedom'. Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—১৪৩।

"What we want is head and heart combined. The heart is great indeed ; it is through the heart that come the great inspirations of life. I would a hundred times rather have a little heart and no brain, than be all brains and no heart. Life is possible, progress is possible for him who has heart, but he who has no heart and only brains, dies of dryness.

"At the same time we know that he who is carried along by his heart alone, has to undergo many ills, for now and then he is liable to tumble into pitfalls. The combination of heart and head is what we want.···········Let everyone have an infinite amount of heart and feeling, and at the same time an infinite amount of reason."

London, 27th Oct. 1896.
—'God in everythings'. Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—১৪৫।

"What I want to propagate is a religion that will be equally acceptable to all minds; it must be equally philosophic, equally emotional, equally mystic, and equally conducive to action."

—'The ideal of a universal religion'.

Complete works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৮৫।

"It is not given to all of us to be harmonious in the building up of our characters in this life; yet we know that that character is of the noblest type in which all these three—Knowledge and Love and Yoga are harmoniously fused."

—'Bhakti Yoga'. Complete works, ৩য় খণ্ড, পৃ—৩৩।

"A man may be intellectual, or devotional, or mystic, or active; the various religions represent one or the other of these types. Yet it is possible to combine all the four in one man, and this is what the future humanity is going to do."

—'My Master', Complete Works, ৪র্থ খণ্ড, পৃ—১৭৪।

"I agree with you so far that faith is a wonderful insight and that it alone can save, but there is the danger in it of breeding fanaticism and barring further progress.

"Jnanam is all right, but there is the danger of its becoming dry intellectualism. Love is great and noble, but it may die away in meaningless sentimentalism.

"A harmony of all these is the thing required."

—'What we believe in'.

Complete works, ৪র্থ খণ্ড, পৃ—৩০২।

দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ সকল পথের মর্যাদা ও মূল্যকে স্বীকার করেও বারবার তাদের সমন্বয়ের উপর জোর দিচ্ছেন। বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়, বিবেকানন্দ 'The ideal of a universal religion' প্রবন্ধে ধর্মকে 'equally philosophic, equally emotional, equally mystic and equally conducive to action' হয়ে উঠতে হবে বলেছেন, কারণ তিনি ধর্মকে 'equally acceptable to all minds' অর্থাৎ সর্বজনীন রূপে প্রত্যক্ষ করতে

চেয়েছেন। বিশ্বজনীন ধর্মের রূপ কল্পনা করতে গিয়ে তিনি এই সমন্বয়কে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেছেন। এই সমন্বয়ই যে মানুষের আগামী যুগের তপস্যা এই কথা ব্যক্ত করে 'My master' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বললেন, 'this is what future humanity is going to do'.

প্রেম-ভক্তি মার্গের সু-উচ্চ ভাবকে বিবেকানন্দ বড়ো বলে স্বীকার করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ভক্তির বিকৃতির কুফল সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হয়েই কথা-প্রসঙ্গে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

"Through the preaching of that love broadcast, the whole nation has become effeminate—a race of women."

—Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ—২৬০।

এই বিকৃতি রোধ করবার উপায় কি ? বিবেকানন্দ বললেন ঃ

"Worship God with Bhakti tempered with Jnana. Keep the spirit of discrimination along with Bhakti."

—Complete Work, পঞ্চম খণ্ড, পৃ—২৬৩।

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সম্মিলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একই রকম মত পোষণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই জন্যে কৃচ্ছ্রসাধনাকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার-বিচারকে মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে ; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ করে রাখে ; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে,—এই জন্য সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয় ; নিয়ম-পালনের একটা অহঙ্কার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়ম পালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।"

—'রসের ধর্ম'। শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড।

জ্ঞানের সঙ্গে রসের তথা কঠিনের সঙ্গে কোমলের সম্বন্ধটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব ভাষায় নির্দেশ করেছেন :

"এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না ; কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরম রূপ হত, তাহলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ঙ্কর মরুভূমি হয়ে থাকতো।

"এর সমস্ত কাঠিন্যের উপর একটা রসের বিকাশ আছে ; সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেই খানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থক রূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

স্থিতি ও গতির সমন্বয়

"অর্থাৎ নিত্য স্থিতির উপর একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতু-পাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ—তার চলাফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

"রস জিনিসটি সচল। সে কঠিন নয় বলে সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে। এই জন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলেছে, এই জন্যেই কেবল সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এই জন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।......আমাদের ধর্ম-সাধনার মধ্যেও এই রসময় গতি-তত্ত্বটি না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমনকি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেটিও নষ্ট হয়। ...... কাঠিন্য ধর্ম-সাধনার অন্তরাল-দেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়, —সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়।......ধর্ম-সাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য চলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায়, অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্ম-সাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্য বিকাশ।"

—'রসের ধর্ম'। শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড।

সাধনায় কঠিনের সঙ্গে কোমলের, নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেমের, স্থিতির সঙ্গে গতির, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সম্মিলনের প্রয়োজন আছে। ভক্তি যথাযথ পরিমাণে জ্ঞানমিশ্রা না হলে তা অহেতুক উচ্ছ্বাস বা আবেগ-বিহ্বলতায় পরিণত হতে বাধ্য। প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ

"প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক্ আছে যেটা প্রধানতঃ রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রস-সম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিবারাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি। ......মানসিক রসের বিকৃতিতেই আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন সে আর বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হয়ে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না।"

—'বিকারাশঙ্কা'। শান্তিনিকেতেন, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ,
রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ—৪৭৮-৮১।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের বহুপরিচিত

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদ ধারা
নাহি চাহি, নাথ।......"

ইত্যাদি পংক্তিগুলির মধ্যেও কবির ঐ একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

রস বস্তুই জগৎকে গতিশীল করে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে তার প্রবাহ উচ্ছৃঙ্খল নয় ঃ

"অমৃতের নীচের তলায় সত্য বসে রয়েছেন, তাকে একেবারে বাদ দিয়ে সেই আনন্দলোকে যাবার জো নেই।"

—'হিসাব'। শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, রবীন্দ্ররচনাবলী,
বিশ্বভারতী সং, ১৩শ খণ্ড।

ভক্তিসাধনায় জ্ঞানের কাঠিন্যের মতো কর্মসাধনাতেও জ্ঞানের ভিত্তির বিশেষ উপযোগিতা আছে; কারণ জ্ঞানহীন কর্ম-সাধনা কোনো সুশৃঙ্খল সুনির্দিষ্ট মঙ্গলবোধের দ্বারা চালিত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন:

"যে-কোনো সমাজেই কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।"

—'চরকা'। কালান্তর।

'জাগরণ', 'সামঞ্জস্য' প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যেও (শান্তিনিকেতন, ১২শ খণ্ড, দ্রষ্টব্য) কবি ধর্ম-জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তার দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন।

'অচলায়তন' নাটক, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস প্রভৃতি রচনার মধ্যে কবির জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়-তত্ত্বটি সার্থক রস-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের পারস্পরিক পরিপূরকতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা এ বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে সমন্বয়বাদী ছিলেন। এদের যে-কোনো একটির অনুপস্থিতিতে অপরের ভারসাম্যের অভাবজনিত স্বাভাবিক বিকার-প্রবণতাটিকে তাঁরা সুচিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং এই বিকারাশঙ্কার অপনোদনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে এই তিনের সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তার দিকটি সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অখণ্ডবোধ, বিশ্ববোধ ও মানবতাবোধ

ভারতীয় ধর্ম-জীবনের মূল লক্ষ্য কি? এককথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে, বেদান্ত বা উপনিষদ্‌কে যদি ভারতের সুচির বহু-যুগাতিশায়ী ধর্মানুশীলনের চরম প্রাপ্তি বা ফলশ্রুতি হিসেবে ধরা যায় তবে ধর্মসাধনার শীর্ষদেশে যে কেন্দ্রবিন্দুটি পরমপ্রাপ্তির লগ্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তা হচ্ছে অখণ্ডবোধ। সকল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্যকে, অজস্র আপাত বিরোধের মধ্যে সুমহৎ সামঞ্জস্যটিকে অনুধ্যানের অক্লান্ত নিরন্তর প্রয়াস ভারতের ঔপনিষদ ধর্মচিন্তাকে বিশেষত্ব দান করেছে।

মানুষ যখন নিজেকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে তখনই সে বিচিত্রের সঙ্গে আপনার সংঘাতকে অনিবার্যভাবে আমন্ত্রণ করে আনে এবং সেই দ্বন্দ্বে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে দুঃখ, বিরোধ ও অশান্তি। এই বিরোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ একের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত ও উপলব্ধি করার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি, বিশ্বের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ যোগেই চিত্তের পরিপূর্ণতা।

বিবেকানন্দ বেদান্তকে তাঁর ধর্মচিন্তার মূল সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এ সত্য তাঁর লেখায় স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর রচনায় নিজেকে 'বৈদান্তিক' বলে ঘোষণা করেছেন এ রকম দৃষ্টান্ত মোটেই দুর্লভ নয় ('I am a Vedantist')। অবশ্য এ ধরণের কোনো বিশেষ মতবাদের গণ্ডিতে বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বকে বেঁধে দেওয়া যায় না। প্রতিটি মতের মণিকোঠায় তাঁর চিন্তার প্রসার ঘটেছে ও সকলকিছু থেকে সার সত্যটুকু সংগ্রহ করতে তাঁকে কোনো বাধা পেতে হয় নি। জীবনের বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনার সংক্রমণ ঘটেছে এবং বিভিন্ন মতবাদের মিছিলে তাঁর মন অংশ গ্রহণও করেছে। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার প্রধান ভিত্তি হিসেবে যে তিনি বেদান্তকেই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর রচনাবলী পড়লে এ সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। সকল আপাত-প্রতীয়মান দ্বন্দ্বের মধ্যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'কে উপলব্ধির বাণী বৈদান্তিক বিবেকানন্দের কণ্ঠে বিপুল প্রত্যয়ের সঙ্গে ধ্বনিত হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন:

বৈদান্তিক বিবেকানন্দেব অদ্বৈতানুভূতি

"He alone lives, whose life is in the whole universe, and the more we concentrate our lives on limited things, the faster we go to-wards death".

—'The real nature of man (vol-11)',
Complete works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৮০।

"He who sees in this world of manifoldness that one running through all, in this world of death, he who finds that One Infinite Life, and in this world of insentience and ignorance, he who finds that One Light of Knowledge, unto him belongs eternal peace."

—'Maya and the conception of God'.
Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—১১৭।

অখণ্ডবোধ ও প্রেম

কিন্তু এই বিশ্ববোধের তথা অদ্বৈতবোধের স্ফূর্তি হবে কোন্ পথে ? সে পথ হচ্ছে প্রেমের পথ। প্রেমই মানব-সত্তাকে সকল বিরোধ থেকে পরম ঐক্যানুভূতির মধ্যে, আত্মবিচ্ছেদ থেকে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে পারে। 'Practical Vedanta' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ তাই বললেন :

"Love is truth, and hatred is false, because hatred makes for multiplicity. It is hatred that seperates man from man; therefore it is wrong and false. It is the disintegrating power; it separates and destroys.

"Love binds, love makes for that oneness"

—'Practical Vedanta (Part-1)',
Complete works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩০২।

বিস্ময়ের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, 'বিচিত্রের দূত' রবীন্দ্রনাথের বাণীতেও এই অখণ্ডবোধের তত্ত্বটি বারবার ধ্বনিত হয়েছে। রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের প্রসাধন-কলার জগতে বিচিত্রের লীলা যে কবি ছন্দ ও সুরের অদৃষ্টপূর্ব কারুকার্যে রঞ্জিত করে সাহিত্যে গ্রথিত করেছেন, তিনিই আবার জীবনে বহু বিবিধের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন গভীর সামঞ্জস্যটিকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে তাকে অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন :

রবীন্দ্র চিন্তায় অখণ্ডবোধ

"যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখা প্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমান করিতে থাকে তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবর্জিত তোমারই পথ; আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি,. তবে কোনোমতেই আমি ব্যর্থ হইব না।"

—'ধর্মের সরল আদর্শ'। ধর্ম।

রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১২শ খণ্ড।

"খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যে মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে।"

—'প্রাচীন ভারতে একঃ'। ধর্ম।

"উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি সর্বমেবাবিবেশ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি "

—'ধর্ম প্রচার'। ধর্ম।

"যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তরূপে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানতঃ বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা ....ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।"

—'তপোবন'। শিক্ষা।

রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ১১শ খণ্ড।

"The only way of attaining truth is through the interpenetration of our being into all objects. To realise this great harmony between man's spirit and the spirit of the world was the endeavour of the forest-dwelling sages of ancient India".

—'Individual and Universe'. Sadhana.

"In the search we gradually become aware that to find out the One is to possess the All.

—'Soul Consciousness'. Sadhana.

"……Man's individuality is not his highest truth ; there is that in him which is Universal."

—'The problem of Evil', Sadhana.

এই অদ্বৈতানুভূতির জন্যে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজনীয় জিনিসটি কি? এ সম্বন্ধেও বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের, দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কোনো বৈষম্য নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন, এই ঐক্যানুভূতির ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হল প্রেম। প্রেমই সর্বাত্মক মিলনকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে এবং সেই মিলনেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতার লগ্নটি নিহিত। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন:

অদ্বৈতানুভূতি ও প্রেম

"Therefore love is the highest bliss that man can attain to for through it alone he truly knows that he is more than himself, and that he is at one with the All."

—'Soul Consciousness'. Sadhana.

দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই খণ্ড থেকে অখণ্ডে, বিচ্ছিন্ন থেকে পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়াকে আত্মার চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। চিত্তের এই ব্যাপ্তি, আত্মার এই সম্প্রসারণের প্রধান বাধা কি? সে বাধা হল আসক্তি। অংশের প্রতি আসক্তি মানুষকে পূর্ণের সম্বন্ধে উদাসীন করে রাখে। মনের এই বন্ধন মানুষকে কর্মের উপর তার পূর্ণ অধিকার থেকে বিচ্যুত করে।

বিবেকানন্দ এই জন্যে কর্মব্রতীকে আসক্তিশূন্য হতে উপদেশ দিয়েছেন। ত্যাগ অর্থাৎ আত্মনিরপেক্ষ কর্মসাধনার কথা তাঁর বাণীতে নানা প্রসঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। 'Work and its secret' ভাষণে (১৯০০) তিনি বলেছেন:

"We came here to sip the honey, and we find our hands and feet sticking to it. We are caught, though we came to catch. We came to enjoy ; we are being enjoyed. We came to rule ; we are being ruled. We came to work ; We are being worked……We want to get everything from nature, but we

find in the long run that nature takes everything from us, depletes us, and casts us aside."

—'Work and its secret', Complete Works, ২য় খণ্ড, পৃ—২।

"Work constantly, but be not attached; be not caught. Reserve unto yourself the power of detaching yourself from everything, however beloved, however much the soul might yearn for it, however great the pang of misery you feel if you were going to leave it; still reserve the power of leaving it whenever you want."

—'Work and its secret'. Complete works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—২-৩।

তিনি বললেন:

"With all its failures and success, with all its joys and sorrows, it (life) can be one succession of sunshine, if we only are not caught."

—'Work and its secret'. Complete Works, ২য় খণ্ড, পৃ—২।

এই অনাসক্ত হয়ে কর্ম-সাধনার তাৎপর্যটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনুরূপ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে:

আত্মসম্প্রসারণের বাধা আসক্তি

"অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে, নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হইনে।"

—'ত্যাগ'/শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড। রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, ১৩শ খণ্ড, পৃ—৪৬২।

দেখা যাচ্ছে, কর্মের ক্ষেত্রে ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উপলব্ধি, করেছিলেন; কিন্তু ত্যাগের নাম করে রিক্ততাকে প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। এই ত্যাগের সাধনা পূর্ণতার সাধনা। এ তপস্যা নঞাত্মক নিঃস্বতায় মানুষকে প্ররোচিত করে না। ত্যাগের এই ইতি-মূলকতার স্বরূপটি প্রকাশ করে বিবেকানন্দ বলেছেন:

আসক্তি দূর করবার জন্যে চাই ত্যাগ

"Ask therefore, nothing in return ; but the more you give, the more will come to you. The quicker you can empty the air out of the room, the quicker it will be filled up by the external air."

—'Work and its Secret'. Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৫।

এই পূর্ণতা-প্রয়াসী ত্যাগের ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

যথার্থ ত্যাগ রিক্ততা আনে না, আনে পূর্ণতা

"এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্যে, ক্ষণিককে ত্যাগ আনন্দের জন্যে, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্যে, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্যে। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।"

—'তপোবন'। শিক্ষা।

"এ কথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে।······অন্তরে প্রেম বলে সত্য পদার্থটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনায় সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীব যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।"

—'শিক্ষার মিলন'। শিক্ষা।

অন্তরেব 'প্রেম বলে সত্য পদার্থটির' সাধনাই হল প্রকৃত বৈরাগ্যের তপস্যা।

অখণ্ডবোধ বা পরিপূর্ণ একের উপলব্ধির মধ্যে জীবনাচরণের চরম সার্থকতা নিহিত, এ সত্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে, তা আমরা লক্ষ করেছি। এই ঐক্য উপলব্ধির পথে যা বাধা হিসেবে দেখা দেয় তাকেই রবীন্দ্রনাথ পাপ আখ্যা দিয়েছেন। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার উপযোগিতা, যাকে যথাকালে বাহির হতে মরতে দেওয়া উচিত ছিল, তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই নিজে হাতে পাপকে সৃষ্টি করা।

পাপ কি ?

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "অংশের প্রতি আসক্তি বশতঃ সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।"

—'তপোবন'। শিক্ষা।

বৈদান্তিক বিবেকানন্দ বা উপনিষদ্‌-রসপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের কারও চিন্তায় বা ধর্মাদর্শে এই পাপবোধ কিন্তু কোনোদিন প্রাধান্য পায় নি। খ্রীষ্টধর্মের কর্মকাণ্ড-প্রধান অংশে পাপবোধ যে অর্থে একটি বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছে, সেই অর্থে এই বোধ হিন্দুধর্মের জ্ঞানকাণ্ডের উপর প্রধানতঃ ভিত্তি করে যে মনীষীদের চিন্তাধারা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁদের ভাবনায় স্থান পাওয়াটাও স্বাভাবিক নিয়মেই প্রত্যাশিত নয়। সকল পরিস্থিতিতে সদামুক্ত মানবাত্মার বিজয়বার্তা ঘোষণা করা যাঁর স্বভাবধর্ম সেই বৈদান্তিক বিবেকানন্দ আত্মার হীনতাবোধকে সত্য বলে স্বীকার করবেন কি করে? মানুষকে পাপী বলে অভিহিত করাটাই তাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো পাপ। পাশ্চাত্ত্যের ধর্ম-মহাসভায় প্রাচীন প্রাচ্য ঋষিদের মতো তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন 'তোমরা অমৃতের পুত্র':

হিন্দুধর্মে পাপবোধ গুরুত্ব পায় নি

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth—sinners! It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature.······Ycu are souls immortal, spirit free, blest and eternal; Ye are not matter, Ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter." —At the Parliament of religions; Paper on Hinduism. Complete Wcrks, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯।

হিন্দুধর্মে পাপবোধ বা আত্মার কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির উপরে গুরুত্বদানের অভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই মনোভাবকে সশ্রদ্ধ সমর্থন জানিয়ে জীবন সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের মূল দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধে লিখেছেন:

"বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়। বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়।"

—'ধর্মের সরল আদর্শ'। ধর্ম।

উভয় যুগনিয়ামকের চিন্তায় অদ্বৈতানুভূতি জীবন-সাধনার শীর্ষবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তা আমরা লক্ষ করেছি। সকল কিছুকে সমন্বিত করে প্রত্যক্ষ করা, বিশ্বকে আপন করে দেখবার এই প্রবল প্রবণতার মূলে আছে উভয়ের তীব্র গভীর মানবতাবোধ। বিশ্বমানবের

মানবতাবোধ

কল্যাণ তাঁদের ধর্ম তথা সকল চিন্তার শেষ কথা। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তার মূল সূত্রটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সকল কিছু আনুষঙ্গিককে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত তাঁদের ধর্মে এই মানবকল্যাণের দিক্‌টিই সবচেয়ে বৃহৎ ও মহৎ হয়ে উঠেছে; আর যাকিছু এসেছে তার মধ্যে, তা ঐ কল্যাণব্রতেরই অঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই মানুষ হল সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ মানুষের এই কল্যাণ-ব্রতের প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে নিপীড়িত অত্যাচারিত মানবগোষ্ঠীর বেদনা ও মুক্তির বার্তাও সেই আধ্যাত্মচিন্তায় বড়ো হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

'Practical Vedanta' ভাষণে (১৮৯৬) মানবতার পূজারী সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে নিঃসংশয়িত মুক্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছিল:

"The only God to worship is the human soul, in the human body.······The moment I have realised God sitting in the temple of every human body,······that moment I am free from bondage, everything that binds vanished, and I am free."

—'Practical Vedanta (Part-II)', Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩১৯।

"You may invent an image through which to worship God, but a better image already exists, the living man. You may build a temple in which to worship God, and that may be good, but a better one, a much higher one, already exists, the human body."

—'Practical Vedanta (Part-II)', Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩১১।

তিনি নানা প্রসঙ্গে তাঁর পত্রাবলীতে লিখেছেন:

"Let these people be your God—think of them, work for them, pray for them incessantly—the Lord will show you the way."

—১৯নং পত্র, Complete Works ৫ম খণ্ড, পৃ—৪৫।

"If you want any good to come, just throw your ceremonials over board and worship the Living God, the Man-God,—every being that wears a human form,—God in His universal as well as individual aspect."

—৭০নং পত্র, Complete Works,
৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ—২৭৯।

পীড়িত নিঃস্ব মানুষের জন্যে গভীর আর্তি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনীতে :

"I do not believe in a God or religion which cannot wipe the widow's tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth. However sublime be the theories, however well-spun may be the philosophy,—I do not call it religion so long as it is confined to books and dogmas.—Move onward and carry into practice that which you are very proud to call your religion, and God bless you."

—১৭নং পত্র, Complete Works,
পঞ্চম খণ্ড, পৃ—৩৯।

"May I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sumtotal of all souls—and, above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship."

—পত্র নং ৬৫, Complete Works,
পঞ্চম খণ্ড, পৃ—১০৬।

মানব-প্রেমিক তাপসের কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হয়েছে 'দরিদ্রনারায়ণের' মুক্তির বার্তা।

বিবেকানন্দ একদিন মেঘমন্দ্রিত স্বরে সকলকে আহ্বান করে যা বলেছিলেন, দীর্ঘযুগ অতিক্রম করে বহুবিবৃত ও বহুশ্রুত হয়ে সেই সুপরিচিত পংক্তিগুলি দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ সুরে আমাদের কানে আজও বেজে ওঠে :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,

জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

নিপীড়িত নর-দেবতার সঙ্গে কর্মের সূত্রে এক হবার আহ্বান রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও বারবার ধ্বনিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের কয়েকটি গীতিকবিতার সুপরিচিত কতকগুলি পংক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে :

“যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।”

“ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারোমাস।
রৌদ্রজলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;

তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধুলার পরে।
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে,
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি,
কর্ম যোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।"

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে
বিধাতার রুদ্র রোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
....
....
"শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করনা, নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"
—'গীতাঞ্জলি।'

'মানসী' কাব্যে 'কবির প্রতি নিবেদন' কবিতার মধ্যেও 'নরনারায়ণের' উল্লেখ লক্ষ করা যায়। দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ নির্বিশেষ মানব-সত্তার উপাসনার উদ্দেশ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়েছেন কবি তাঁর 'Religion of Man' (হিবার্ট লেকচার, অক্সফোর্ড)

নরনারায়ণ

বা 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩০-এর কমলা লেকচার, ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত) অভিভাষণে। এখানে কবির উপাস্য হয়ে উঠেছেন যে মানুষ তাঁর সম্বন্ধে কবি ভাষণের প্রস্তাবনায় বলেছেন :

"সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে, 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে,

স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।"

—'মানুষের ধর্ম', ভূমিকা।

এই মানব, এই দেবতার উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার উত্তুঙ্গ শীর্ষসীমান্ত, এখানেই সে চিন্তার পরিপূর্ণতা। ...

লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়ের ধর্মসাধনার প্রবণতাটি মূলতঃ এই মানবতাবোধের দিকেই প্রসারিত। মানবকল্যাণ-নিরপেক্ষ ধর্মসাধনা সেখানে স্বীকৃত নয়। একহিসাবে এই মানব-মুখীনতা ভারতীয় ধর্মসাধনা তথা কালের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্বের সকল শ্রেয়ঃ ধর্মচিন্তার বিশেষত্ব বলা চলে। এ সম্বন্ধে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-চিন্তা' প্রবন্ধ থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ধর্মে মানবগৌরবের ক্রমপ্রসার

"মধ্যযুগের রামানন্দ থেকে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারত-পথিকদের ধর্মে ভগবানের স্থান উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু, এটাও লক্ষ করবার বিষয় এই যে, অন্তরের শুচিতা এবং সব মানুষের ঐক্যবোধ ও কল্যাণচেষ্টাই ওই ধর্মের মূল কথা, এই ঐক্যবোধ ও কল্যাণব্রতের অবলম্বন হিসাবেই ভগবানের সাধনা। আরও লক্ষণীয় এই যে, রামানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যতই

আধুনিক কালের দিকে এগিয়ে আসা যায় ততই দেখা যায় তাঁদের ধর্মে মানুষের গৌরব ক্রমেই বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথে এসে দেখি সে ধর্ম 'মানুষের ধর্ম' নামেই অভিহিত হয়েছে; মানুষের মধ্যে ভগবানের যে প্রকাশ তার সাধনাতেই এ ধর্মের সার্থকতা। মানুষের জীবন ও কল্যাণ-নিরপেক্ষ ভগবানের আরাধনা এ ধর্মে অস্বীকৃত।"

—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১১শ খণ্ড ১১শ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃ—৩২।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় ভারতীয় ধর্মসাধনার সার সত্য মানবতাবোধ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশ লাভ করেছে। নরদেবতার পূজা সেখানে সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, 'মানুষের ধর্ম' সেই ধর্মসাধনার শেষ কথা।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সীমা ও অসীম

প্রতীক উপাসনা, গুরুবাদ, অবতারবাদ

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার অনুসরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ও কবির দৃষ্টিভঙ্গির বৈষম্যের দিক্‌টাই বেশি চোখে পড়া স্বাভাবিক। সীমা ও অসীমের তত্ত্ব প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির এ ব্যবধান প্রকটতর বলে মনে হতে পারে। ত্যাগব্রতী তাপস প্রত্যক্ষতঃ বিচিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি, খণ্ডকে মায়া বলে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। বহুকে উত্তীর্ণ হয়ে পরম একের মধ্যে আত্মনিমগ্ন হওয়াই সেখানে চরম সাধনা। পক্ষান্তরে, কবি নিজেকে 'বিচিত্রের দূত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর জগৎ রূপের জগৎ, তাঁর সাধনা রসের সাধনা, দৃশ্যে গন্ধে গানে যে সুন্দরের আসন পাতা তারই স্পর্শে তাঁর চিত্ত মুখর, তারই প্রশস্তি তাঁর সৃষ্টির মর্মমূলে। সেই মুখরতা, সেই প্রশস্তির রূপায়ণ তাঁর সাহিত্যে। সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণরূপে সম্ভোগ শিল্পীর আদর্শ। তাই খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তনের স্পর্শলাভের আগ্রহ তাঁর শিল্প-সাধনার কেন্দ্র-মূলে নিহিত। জীবনাচরণে সকল অসঙ্গতিকে উত্তীর্ণ হয়ে অখণ্ডউপলব্ধির ঐকান্তিক কামনা রবীন্দ্রবাণীতে অপরিসীম আস্থার সঙ্গে সকল সময়ে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সে ঈপ্সার সঙ্গে বিচিত্রের রস-আস্বাদনের আগ্রহের কোনো বিরোধ ঘটেনি। শিল্পীর দৃষ্টিতে বিচিত্রের মধ্য দিয়েই অখণ্ড মূর্ত হয়ে উঠেছে।

খণ্ড ও অখণ্ড

অদ্বৈতানুভূতির প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণের বশবর্তী হয়ে বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সীমার বন্ধনকে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং বিচিত্রের বিশ্বকে মায়া বলে অভিহিত করে স্পষ্টই বলেছেন :

অদ্বৈতপিপাসা

"I can not but consider that this theory of Maya, this statement that it is all Maya, is the best and only explanation."

—'Maya and Illusion'.

Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—১০০।

অনন্তের সম্বন্ধে প্রবল তৃষ্ণাবোধকে ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।"

—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'। ধর্ম।

এই অদ্বৈত-পিপাসা ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। অদ্বৈতের সন্ধানের সূত্রে যে জীবনজিজ্ঞাসু "this theory of Maya, this statement that it is all Maya, is the best and only explanation" এই উক্তি করতে পারেন, সেই বিবেকানন্দের চিন্তাকে প্রত্যক্ষতঃ জীবনবিমুখ বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই জগৎকে, ইহলৌকিক জীবনকে তিনি মায়া বলে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, মায়াবাদকে সর্বোত্তম ও একমাত্র ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন এবং সেই চিন্তার বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিগত জীবনে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন ও দেশের যুবসমাজকে সেই ধর্ম গ্রহণে ব্যগ্র উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীসংঘ গঠন করে তুলেছেন ;— বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মকে এই তাৎপর্যে বিচার করলে তাঁর সম্বন্ধে উপর্যুক্তরূপ ধারণা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক এবং মুক্তি-পিপাসু বৈদান্তিকের সম্পর্কে সাধারণে আমরা মোটামুটিভাবে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই মায়াময় বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। তিনি যে ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি আত্মসর্বস্ব মুক্তিচিন্তা সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেন নি। আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত স্বার্থবোধহীন একদল যুবককে মানবকল্যাণের ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ছিল সে প্রয়াসের মূল লক্ষ্য। সন্ন্যাস-সাধনা ছিল সেই ব্রতের জন্যে আত্মপ্রস্তুতির প্রাথমিক পর্বমাত্র। এ হচ্ছে নিজেদিকে ব্রতের ভার বহনের যোগ্য করে তোলার তপস্যা। এই উদ্দেশ্যেই বৈদান্তিক মায়াবাদের সাহায্যে বস্তুবিশ্বের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা ও অসারতাবোধকে বিবেকানন্দ সেদিনের তরুণ কর্মযোগীদের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জীবনবিমুখ ত্যাগধর্ম বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মুক্তিচেষ্টা বিবেকানন্দের সমর্থন লাভ করে নি বলেই অর্বাচীন বৌদ্ধদের মোক্ষ-সর্বস্ব চিন্তাধারাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, বরং ধিক্কৃত করেছেন তা আমরা পূর্বেই দেখেছি (প্রথম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। একসময়ে এই চিন্তা

বিবেকানন্দের সম্প্রদায়সংগঠন

ভারতের ইতিহাসে গণজীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে এ তথ্যটিও বিবেকানন্দ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

বেদান্তের জীবনমুখী রূপ

বস্তুতঃ বেদান্তের জীবনমুখী রূপটিকে বিবেকানন্দ নূতন করে আবিষ্কার করেছিলেন। ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্তকে প্রয়োগের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি তার প্রত্যক্ষতঃ চরম নেতিমূলক ঔপপত্তিক রূপটি থেকে ইতিমূলক রসানুরক্ত রূপটিকে নিষ্কাশিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ বিশ্বকে যখন আমরা মায়া বলে জানি তখনই আমাদের চিত্তমুক্তি সম্ভবপর হয়ে ওঠে ও জীবনকে আমরা আনন্দস্বরূপে প্রত্যক্ষ করি। এই উপলব্ধির উত্তরণটিকে 'Maya and Freedom' ভাষণে (London, 22nd Oct, 1896) ব্যক্ত করে বিবেকানন্দ বলেছেন :

"Then we shall know that we are free.……Then will vanish the delusion of manifoldness and nature ; and Maya, instead of being a horrible, hopeless dream as it is now, will become beautiful and this earth, instead of being a prison-house will become our play-ground."

—Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—১২৮-২৯।

চলিষ্ণু জীবনাচরণের মধ্যে মুক্তির ছন্দটিকে অনুভব করে তিনি বলেছিলেন :

"You must not take this world in its narrow sense—but this whole life of society is the assertion of that one principle of freedom. All movements are the assertion of that one freedom."

—Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—১২৬।

বেদান্তকে ভিত্তি করে তিনি যা বলেছেন বা লিখেছেন তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভাবটি ধ্বনিত হয়েছে।

সেই ঔপপত্তিক নিদর্শনগুলির অন্যতম হচ্ছে 'Practical Vedanta'; নামেই তার পরিচয় কিছুটা অনুরণিত হয়েছে। তাঁর কর্মজীবন হচ্ছে এক হিসাবে সমষ্টিজীবনে সেই 'ব্যাবহারিক বেদান্ত'-এর প্রয়োগ-সাধনা। সে সাধনার মূল কথাটি নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে :

"The moment I have realised God sitting in the temple of every human body,—that moment I am free from bondage, everything that binds vanishes, and I am free."

—'Practical Vedanta (Part—II)'; London 12th Nov. 1896, Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩১৯।

এই সূত্রে বেদান্তের লক্ষ্য নির্দেশ করে বিবেকানন্দ বলেছেন:

"In one word, the ideal of Vedanta is to know man as he really is, and this is its message that if you cannot worship your brother man, the manifested God, how can you worship a God who is unmanifested?"

—'Practical Vedanta (Part—II)', Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩২৩-৩২৪।

ব্যাবহারিক বেদান্ত ব্যক্তিকে অস্বীকার করে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত যে ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যষ্টিকে আদৌ অস্বীকার করে না এ কথাটিও স্পষ্ট ভাষায় বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন। নির্বিশেষের পটভূমিকায় বিশেষকে সত্যস্বরূপে প্রত্যক্ষ করাই বেদান্তের লক্ষ্য:

"......The Vedantic idea is not the destruction of the individual, but its real preservation. We cannot prove the individual by any other means but by referring to the universal, by proving that this individual is really the universal."

—'Practical Vedanta (Part—III)', Delivered in London, 17th Nov, 1896. Complete Works দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৩১।

"......The Impersonal instead of doing away with the personal, the Absolute instead of pulling down the relative, only explains it to the full satisfaction of our reason and heart."

—'Practical Vedanta', Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৩৩।

"The finite, manifested man forgets his source and thinks himself to be entirely seperate, We, as personalised,

differentiated beings, forget our reality, and **the teaching of monism is not that we shall give up these differentiations, but we must learn to understand what they are. We are in reality that Infinite Being, and our personalities represent so many channels through which this Infinite Reality is manifesting Itself**; and the whole mass of changes which we call evolution is brought about by the soul trying to manifest more and more of its infinite energy."

—'Practical Vedanta', Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৩৭।

অসীম যে সীমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন, পরম এক যে বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করছেন এই তত্ত্বটিও উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে বিবৃত হয়েছে। 'Practical Vedanta' রচনার চতুর্থ খণ্ডে বিবেকানন্দ এই তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করে বললেন:

সীমার মাঝে অসীম—বিবেকানন্দ

"......Whatever exists is one. That one is appearing in these various forms, and all these various forms give rise to the relation of cause and effect. The relation of cause and effect is one of evolution—the one becomes the other, and so on."

—'Practical Vedanta', Complete Works,
চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৩৪৩।

লক্ষ করবার বিষয়, সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের প্রকাশের লীলাবৈচিত্র্যের কথাই যে শুধু উপরের উদ্ধৃতিটিতে ব্যক্ত হয়েছে, তাই নয়; তার সঙ্গে, সেই লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যে, কারণ ও কার্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের উদ্ভব ঘটে এবং জীবনের বিবর্তন সম্ভবপর হয়ে ওঠে এই দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বটি সেখানে বিশ্লেষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ বাণীর সাধক এবং শিল্পী হিসাবে তিনি আদর্শবাদী, এ ধারণা কোনো মতভেদের অপেক্ষা না রেখে পোষণ করা চলতে পারে। শিল্পের জগৎ রূপেরই জগৎ। আদর্শবাদী শিল্পী রূপের মধ্য দিয়ে অপরূপকে ধরতে চেষ্টা করেন। ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তনকে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা, সান্তের

মধ্যে অনন্তের স্পর্শলাভের প্রত্যাশা সেখানে সহজাত এবং গভীর। রূপের বিশ্বে খণ্ডকে বা সীমাকে অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না; কারণ খণ্ডকে বা সীমাকে আশ্রয় করেই রূপের উল্লাস শরীরী হয়ে ওঠে। তাই সীমার জগৎ সাহিত্যে বা শিল্পে মহার্ঘ মূল্যের অধিকারী, বিপুল স্বীকৃতির বিষয়বস্তু। সীমার মধ্যে অসীমের লীলারূপ-প্রকাশ সেক্ষেত্রে অনুভূতির গভীরে অনুরণিত এবং প্রত্যয়ের উদ্ভাসে সমুজ্জ্বল। তাই বিশেষরূপে আত্মসচেতন ও আত্মসমীক্ষণে তৎপর কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিত্ব ও উপলব্ধির বিশ্লেষণে বলেছেন:

"আমার এক কোটিতে অন্ত, আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত আমি আমার ব্যক্ত আমির যোগে সত্য।"

—'আমার জগৎ'। সঞ্চয়।

সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের প্রকাশের যে উপলব্ধিটি বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসু দার্শনিকের বা তাত্ত্বিকের ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন সেইটিই রবীন্দ্রনাথের মননশীল কবিচিত্তে প্রতিফলিত হয়ে বাণীবিন্যাসে কিছু পরিমাণে রঞ্জিত ও প্রসাধিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কবির ললিত শব্দ-চয়নের ব্যঞ্জনা তাঁর বক্তব্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রের মতো এখানেও স্বাভাবিকনিয়মে কাব্যধর্মী করে তুলেছে। তাই প্রকাশরীতির মধ্যে বিশ্লেষণপ্রবণতার চেয়ে সহজবোধ ও হৃদয়াবেগ বা কল্পনার বৈচিত্র্য অধিক পরিমাণে অনুরণিত হয়ে উঠেছে বলে প্রতীয়মান হয়:

সীমা অসীমের দার্শনিক তত্ত্ব ও রসরূপ

"এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে।"

—'দুঃখ'। ধর্ম।

"আমি কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ।"

—'আত্মপরিচয়'।

"আমি সেই মূঢ়, যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য, নিকটও সত্য,

স্থিতিও সত্য, গতিও সত্য।......রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে, এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।"

—'আমার জগৎ'। সঞ্চয়।

"প্রকৃতি তাহার রূপ রস বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাল আমাদিগকে তেমনই অগ্রসর করিতেছে। ......প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারো টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।"

—'আত্মপরিচয়'।

'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৪৬ নং পত্রের মধ্যেও (রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, ১১শ খণ্ড) বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের স্বীকৃতির পাশেই সৃষ্টির বিচিত্র মহিমাকে উপলব্ধি করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন লেখায় কবি মোহের মধ্য দিয়ে মুক্তির সাধনার আকাঙ্ক্ষা বারবার ব্যক্ত করেছেন। তটের বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে নদী যেমন একসময় বিশাল সমুদ্রে ছাড়া পায়, সেই রকম রূপের বাঁধনকে বরণ করে নিয়েই কবির আত্মা অরূপের মধ্যে মুক্তি পাওয়ার প্রত্যাশা করেছে। কিন্তু 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' (গীতাঞ্জলি)—এই ভাবটুকুর মধ্যেই উপরের উদ্ধৃতিগুলির বক্তব্য শেষ হয়ে যায় নি। তার সঙ্গে সেগুলি কবির ঐকান্তিক মর্তপ্রীতিকেও প্রকাশ করেছে। পার্থিব জীবনের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ ও আন্তরিক মমত্ববোধ এবং সহমর্মিত্ব আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্ভাসে সমুজ্জ্বল হয়ে মহৎরূপ পরিগ্রহ করেছে।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিবেকানন্দ অনন্তের পটভূমিকায় স্থাপন করে সান্তের সত্য স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করতে ব্যাকুল হয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সান্ত রূপের মধ্য দিয়ে অনন্ত অরূপের রসআস্বাদনে পরম তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রতীকউপাসনা অথবা মূর্তিপূজা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গির কথা এসে পড়ে।

প্রতীক উপাসনা—বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি

বিবেকানন্দের গুরু ও আচার্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মূর্তিপূজক সাধক ছিলেন। ভবতারিণী মাতার মন্দিরের পূজারী পুরোহিত ঈশ্বরকে প্রধানতঃ মাতৃরূপে কল্পনা করে সাধনা করে গেছেন। অবশ্য সাধনার সকল পন্থাকেই সত্য বলে তিনি স্বীকার করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন। বাস্তব জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পথের সার্থকতাকে উপলব্ধি করে তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন বলে তাঁর জীবন ও বাণীর ব্যাখ্যাকারেরা উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'যতো মত ততো পথ' উক্তি সেই সর্বমত-স্বীকৃতির বাহন। তাঁর 'কথামৃতে' দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদ, সগুণব্রহ্ম-নির্গুণব্রহ্ম—সকল রকম উপাসনার কথা স্থান পেয়েছে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ প্রধানতঃ বৈদান্তিক সাধনাধারাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনপন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধিকেই সকলের চেয়ে উপরে স্থান দিয়েছিলেন একথা সত্য। বৈদান্তিক চিন্তা ও অদ্বৈত ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, সমর্থন ও শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ ও ভাষণ পরিকল্পিত হয়েছে। তিনি নিজেকে নানা অনুষঙ্গে অদ্বৈতবাদী ও বৈদান্তিক বলে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া অনেক প্রসঙ্গে তিনি মন্ত্রতন্ত্র, পৌত্তলিকতা, সঙ্কীর্ণ সংস্কার ও পুরোহিততন্ত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে কি-রকম কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন তাও আমরা দেখেছি।

পক্ষান্তরে অনেক স্থলে আবার তিনি অধিকারীভেদ-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, প্রতীক-উপাসনা ও প্রতিমাপূজা প্রভৃতিকে উপযোগী সাধন-পন্থা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। লক্ষ করবার বিষয়, স্বপ্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠে তিনি সাড়ম্বরে দুর্গামাতার শারদীয় পূজার আয়োজন ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু সেই

অধিকারীভেদ

সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, হিমালয়ের কোলে স্ব-প্রতিষ্ঠিত আলমোড়ার মায়াবতী অদ্বৈত মঠে প্রতীক বা মূর্তিপূজার কোনো স্থান তিনি রাখেন নি। কর্মকাণ্ডের আচার আচরণ ও বহিরঙ্গবাহুল্য থেকে সম্পূর্ণ

মুক্ত করে শৈল-শ্রেণীর নির্জনতায় উপযোগী পরিবেশে নগাধিরাজের বুকে অদ্বৈতসাধনার এই কেন্দ্রটিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে নিম্নাধিকারী সাধকের মনন ও চিন্তার অপরিণত অবস্থায় সাধনমার্গে প্রতীকের সাহায্যগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু, প্রতীক-উপাসনাকে বিবেকানন্দ তখনই সার্থক বলে স্বীকার করেছেন যখন তা সাধককে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরোহণ করতে সাহায্য করে। বিশেষ প্রতীকের উপাসনা যদি সাধককে সেই সঙ্কীর্ণ কল্পনার অভ্যাসটুকুর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে তবে তা অসার্থক। তখন তা মানবাত্মার বন্ধন হিসেবে দেখা দেয়। যখন সেই বিশেষের সাধনা বৃহত্তর ভাব-রাজ্যের সঙ্কেত ও আহ্বানকে বহন করে এনে ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে সাধককে নির্বিশেষের দিকে অগ্রসর করে দেয় তখনই তা সার্থক হয়ে ওঠে। প্রতীকের সার্থকতা ও যথার্থ ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ বলেছেন:

"The spirit is the goal, and not matter. Forms, images. bells, candles, books, churches, temples and all holy symbols are very good, very helpful to the growing plant of spirituality, but thus far and no further. In the vast majority of cases, we find that the plant does not grow. It is very good to be born in a church, but it is very bad to die in a church. ....If, therefore. any one says that symbols, rituals and forms are to be kept for ever, he is wrong, but if he says, that these symbols and rituals are a help to the growth of the soul, in its low and undeveloped state, he is right."

—'Bhakti or Devotion', Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৯-৪০।

"Temples or churches, books or forms are simply the kindergarten of religion, to make the spiritual child strong enough to take higher steps ; and these first steps are necessary if he wants religion, With the thirst, the longing for God, comes real devotion, real Bhakti."

—'Bhakti or Devotion', Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৪৩।

"............These Pratikas, 'nearing stages', so far as they lead us on to a further stage, are all right, but the chances are ninety-nine to one that we stick to the Pratikas all our lives. It is very good to be born in a church, but it is very bad to die there............It is very good to be born in a certain sect and have its training ; it brings out our higher qualities ; but in the vast majority of cases we die in that little sect, we never come out, or grow. That is the great danger of all these worships of Pratikas."

—'Address to Bhakti-Yoga ; The Chief Symbols'.
Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৪০।

প্রতীক-উপাসনা, সম্প্রদায়সৃষ্টি প্রভৃতির সার্থকতা ও অসার্থকতা, প্রকৃত তাৎপর্য ও বিভ্রান্তি,—দুটি দিক্ই বিবেকানন্দ উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলির মধ্যে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। আত্মার উদ্বোধনের জন্যে বস্তু বা উপাদান-বিশেষের সহায়তা সময়বিশেষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে; জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণের জন্যে অনেক স্তরে কর্মকাণ্ডের সাময়িক অবলম্বন অপরিহার্যরূপে আবশ্যিক হিসেবে দেখা দিতে পারে,—এ বক্তব্যটিও উক্তিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তবে উপলক্ষ্যের প্রাধান্যে লক্ষ্য যেন হারিয়ে না যায়, এই সতর্কবাণী বিবেকানন্দ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভক্তিমার্গাশ্রয়ীদের সম্ভাব্য বিচ্যুতি বা ভ্রান্তির প্রসঙ্গে এই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে পরিবেশে পরিবর্ধিত হয়েছিলেন এবং যেরূপ শিক্ষাদীক্ষায় আজন্ম অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তা প্রতিমা-পূজা বা প্রতীক-উপাসনা সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব গঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ পিতা দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা-ধারার দ্বারা স্বভাবতঃই বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। পিতার প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের ভাবনার গতিপ্রকৃতি তাঁর মানস-সংগঠনকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে; কারণ সেই প্রতিবেশেই তিনি লালিত। পিতার নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত ও তদনুরূপ সাধনাধারায় অভ্যস্ত হওয়ার ফলে জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই রবীন্দ্র-নাথের চিন্তাধারা উপনিষদ্-নির্ভর একটা বিশিষ্ট কাঠামোকে অনেক পরিমাণে

আশ্রয় করতে পেরেছিল। তাই সেখানে কর্ম-কাণ্ডের প্রতাপ দৃঢ়মূল হবার কোনো অবকাশ পায়নি। জ্ঞানকাণ্ডাশ্রয়ী ধর্মবোধের আলোকে খণ্ড কল্পনাশ্রয়ী প্রতীক-সহায়তা যেখানে নিরর্থক সঙ্কীর্ণতা বলে প্রতিভাত হয়, মূর্তিপূজার সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনাচরণে রবীন্দ্রনাথ মূর্তি-পূজাকে কোনো সময়েই স্বীকার করেন নি। শ্রেয়ঃ ধর্মসাধনায় পরিমিত প্রতীক মুক্ত উপলব্ধির অবরোধ ঘটায়, এ ধারণা তিনি পোষণ করতেন ও নানা প্রসঙ্গে ব্যক্তও করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে একান্তভাবে ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারার অনুবর্তক বা অনুসারক হিসেবে তাঁকে বিচার করলে তাঁর প্রতি সুবিচারের অভাব ঘটবে; কারণ সর্বাঙ্গীণ ও আনুপূর্বিক বিচারে তিনি কোনো সময়েই কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিভূ বা বিশিষ্ট সমষ্টিগত মতবাদের বাহক ছিলেন না। কোনো প্রণালী বা বিধিবদ্ধ ধারাকে জীবনের কোনো ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘকাল অনুসরণ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এ অভ্যাস তাঁর অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এ সত্য তাঁর জীবনী অনুসরণ করলে সহজেই বোঝা যায়।

মূর্তিপূজা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

বিচিত্র ক্ষেত্রে চিন্তায় ও কর্মে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে, ধর্মসাধনাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর সকল কিছুই একান্তভাবে ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত।

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতীকউপাসনা সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথের পুত্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যাশিত হতে পারে; কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই মনোভাব কি পরিমাণে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া যুক্তি-সঙ্গত তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে, কারণ সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতির সাম্রাজ্যে কল্পনাকে মূর্ত করবার জন্যে প্রতীকের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই অরূপভাবনাকে আকার দেওয়া যাঁদের ব্রত, প্রতীক-রূপকের মূল্যবোধ তাঁদের সহজ ধর্মের সঙ্গে জড়িত। ভাব বা তত্ত্ব যেখানে যতো গূঢ়, গভীর ও স্পর্শকাতর, রূপক-প্রতীকের সহায়তা সেখানে ততোই অধিক দুর্বার। তাই নিবিড় আত্মভাবনামূলক অথবা আধ্যাত্মিক কবিতা এবং তত্ত্বনাট্যের মধ্যে রূপক-প্রতীকের তাৎপর্য এতো ব্যাপক। প্রসঙ্গ-ক্রমে স্মরণীয়, বাঙলা সাহিত্যে সার্থক রূপক বা প্রতীক-ধর্মী নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ এখনও বোধ হয় বহুল পরিমাণে নিঃসঙ্গ ও একক।

যে-কোনো অমূর্ত ভাব-কল্পনায় মূর্তির বা প্রতীকের সহায়তা-গ্রহণের সম্বন্ধে বিরোধী মনোভাব পোষণ শিল্পীর সহজাত ধর্মের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। রূপ রেখা বা ধ্বনিতে অরূপ-ভাবনাকে অবয়বদানই তো শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য। ধর্মকল্পনায় প্রতীকের স্থাননির্ধারণের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। রূপের আধারকে আশ্রয় করে ভাব মূর্তি পরিগ্রহ করে বোধশক্তির কাছে ধরা দেয়, অথবা পক্ষান্তরে ভাবের পরশ-মাণিকের ছোঁয়ায় জড়রূপ অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে,—যা অতি তুচ্ছ, সাধারণ ও লৌকিক তা অসাধারণত্বে মণ্ডিত হয়ে অনুপম অলৌকিক হয়ে দেখা দেয়, এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার ব্যক্ত করেছেন।

আবাল্য পারিবারিক সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট চিন্তা-ধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার ফলে বাস্তব জীবনাচরণে মূর্তিপূজাকে স্বীকার না করলেও বিশেষ ক্ষেত্রে মূর্তিপূজার ভাবগত সার্থকতাটিকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে অনুধাবন করেছিলেন, তাই মূর্তিপূজার অনুকূল মূল্যায়ন রবীন্দ্রচিন্তায় ঘটেছে।

মূর্তিপূজার সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

মূর্তি যে উপলক্ষ্য মাত্র, সেই উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করে আমরা যে একটি বৃহৎ ভাবের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করি, এবং উদ্দিষ্ট অনির্বচনীয় ভাবলোকের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই যে এই তপশ্চর্যার সার্থকতা, এ সত্য রবীন্দ্রনাথ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি পত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা চলতে পারে ঃ

"কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশুদিন সকালে (সুরেশ সমাজপতির) বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালানমাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে—এবং আশেপাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিন কতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুলখেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। **ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ অঙ্গের আনন্দমাত্রই পুতুলখেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময়**

নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে করে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিসটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়। সমাজের মধ্যে কতো লোক আছে যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক, যাদের কাছে কবিতা সঙ্গীত প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ, তারাও এই উৎসব-উপলক্ষে একটা সর্বব্যাপী ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রতি বৎসরের এই ভাবের প্লাবনে নিশ্চয়ই মানুষকে অনেকটা পরিমাণে humanize করে দেয়; কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা এনে দেয় যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে—আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয় সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়। আমার এবারকার 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি যে, ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা একটা তুচ্ছ উপলক্ষ নিয়ে সেইটেকে নিজের মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে—তারা সামান্য একটা কদাকার অসম্পূর্ণ পুতুলকে নিজের প্রাণ এবং নিজের সুখ-দুঃখে জীবন্ত করে তোলে। সে ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি। তার কাছে চতুর্দিকবর্তী সমস্ত জিনিস নিতান্ত কেবল জিনিস নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের কাছে কখনোই আশা করা যায় না, কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন, যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুল মাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তারপর আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল জিনিসই এই পুতুল। আমরা যাকে ভালোবাসি, অন্য লোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষমাত্র—কিন্তু আমার

কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত। যার কান নেই তার কাছে গান শব্দ মাত্র, আমার কাছে সেই শব্দ সঙ্গীত। পৃথিবীর সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পৃথিবী তার কাছে মৃৎপিণ্ডে জলরেখাবলয়িতঃ। কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী। অতএব এক রকম করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে, সমস্ত বাঙ্‌লা দেশের লোক যাকে উপলক্ষ করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়"।

—ছিন্নপত্রাবলী। ৫ই অক্টোবর, ১৮৯৪।

রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃ—১৭৭-১৭৯।

বস্তুকে আশ্রয় করে ভাবে, জড়কে উপলক্ষ করে চৈতন্যে উত্তীর্ণ হওয়াটাই যে প্রতীকপূজা অথবা মূর্তি-উপাসনার প্রকৃত লক্ষ্য ও সার্থকতা, এ সত্য বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছতায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

সংঘসংগঠন, গুরুবাদ, অবতারবাদ,

এই প্রসঙ্গে কোনো বিশেষ মতবাদের ভিত্তিতে গোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা সংঘসংগঠন এবং গুরুবাদ ও অবতারবাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা ও মূল্যবোধকে পাশাপাশি রেখে একটু বিচার করে দেখা যেতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ সচেতন সযত্ন প্রয়াসে বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ-অনুসরণকারী একটি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় সংগঠিত করে তুলেছিলেন। ত্যাগব্রতী একদল নিঃস্বার্থ কর্মীকে আবিষ্কার করে সংঘশক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যে তিনি স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে, বিশেষকরে যুবসমাজকে লক্ষ করে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি যখন বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন নির্দিষ্ট মতাদর্শে দীক্ষিত ব্যক্তিদের সেখানে স্থান দিয়েছিলেন এবং সেই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে বিশেষ নেতৃত্বের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রাচ্যের শ্রেয়ঃ আধ্যাত্মিক চিন্তার পুনরুজ্জীবন ও

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নির্বিশেষে তার প্রচার ও প্রসারের জন্যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা এই সংঘসংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রে বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা চিহ্নিত হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। নির্দিষ্ট মত ও পথকে ভিত্তি করে তিনি কোনো দল বা সংঘ গড়ে তুলতে পারেন নি। স্বভাব ও আদর্শ—উভয় দিক্ থেকেই তাঁর মনোভাব সম্প্রদায়গঠনের পরিপন্থী ছিল। তাঁর প্রচণ্ড গতিশীল যে চিন্তা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রসারিত হয়ে প্রাগ্রসর হয়েছে তা কোনো সময়েই দল-গঠনের যথার্থ অনুকূল হয়ে উঠতে পারে নি। বেলুড় মঠের পাশে শান্তিনিকেতনকে রেখে বিচার করলে এ বিষয়ে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা ও প্রচেষ্টার মৌলিক পার্থক্যটুকু সহজে ধরা পড়বে। শান্তিনিকেতন কোনো বিশেষ মতের বাহন হয়ে উঠুক তা রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়েই চান নি; কারণ 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্'—'যেখানে সমগ্র বিশ্ব এক হবে তার সকল বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের সাধনায়' বলে কবি স্বপ্ন দেখেছেন সেখানে এই একমুখী মনোভাব সঙ্গত বা সম্ভাব্য নয়। তাই শান্তিনিকেতন আশ্রম আখ্যা পেলেও কোনো বিশেষ সম্প্রদায়সম্পৃক্ত মতের বাহন হয়ে ওঠেনি। বিচিত্র মতের লোক সেখানে এসেছে এবং বাস করেছে ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের সমবায়েই তার বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিচিত্র মূল্যবোধের বিনিময়ে ও আদানপ্রদানে তা বিশ্বমৈত্রীর ভূমিকা রচনা করতে চেয়েছে।

বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে নির্দিষ্ট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। গুরুকে তিনি "অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ" বলে বারবার প্রণতি নিবেদন করেছেন এবং নানা উক্তিতে ও লেখায় নিজেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণের দাস' বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি গুরুর শিষ্য এবং শিষ্যদের গুরু ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিষ্য ও গুরুর শ্রেয়ঃ সম্বন্ধ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন ও এসম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। প্রাচীন ভারতের গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ককে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন ও সেকালের শিক্ষা-জীবনকে আদর্শায়িত করেছেন নানা ভাবে। গুরুশিষ্যের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজনের দিক্‌টি তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আন্তরিক সম্পর্কটি

প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। শিষ্যের আত্মার উদ্বোধনে গুরুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামূলক প্রবন্ধে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর নাটক প্রভৃতির মধ্যেও অনুরূপ ভাব চিত্রিত রয়েছে।—এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'গুরু' নাটকটির কথা স্মরণে আসে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনাচরণের নামে দীক্ষাগুরুরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি লাভ করে নি। 'গুরুবাদ'কে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি ; তাই বোধ হয় ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কোনো গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। সাধনা ও লোকোত্তর চরিত্রমাহাত্ম্যে দুর্লভ বিরল মহত্ত্ব-অর্জনের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আস্থা ও প্রচুর শ্রদ্ধা থাকলেও মানুষের অপ্রাকৃত অতিলৌকিক দেবত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' এ তত্ত্বে প্রত্যয় থাকলেও 'অবতারবাদ' রবীন্দ্র-চিন্তায় বা রচনায় স্বীকৃতি বা সমর্থন পেয়েছে এমন নিদর্শনও তাই বিরল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শ

বিশ্বজনীন ধর্মকল্পনার দ্বি-ধারা।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ধর্মকে সকল বিরোধ ও সংঘর্ষ থেকে মুক্ত করে বিশ্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। অধিকাংশ বিরল বিরাট ব্যক্তিত্বের চিন্তা ও কল্পনায় খণ্ড দেশ ও কালকে উত্তীর্ণ হওয়ার যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সর্বমানবের ঐক্য এবং মিলনের দুর্লভ সূত্রটিকে তাঁরা ধর্মানুভবের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের ধর্ম-চিন্তায় বিশ্বজনীনতা

বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ একটি সর্বজনহৃদয়সংবাদী ধর্ম-কল্পনার পথে বিশেষ খণ্ড-ধর্মানুসক্ত আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার প্রবলতম বাধা। এই মননহীন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কোনো সম্প্রদায়নির্দিষ্ট উপাসনপদ্ধতি, প্রতীক বা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ নামের উপর বিবেকানন্দ কোনোদিন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর পক্ষে অবশ্য এটাই স্বাভাবিক; কারণ সর্বগ্রাসী অখণ্ড ঐক্য ও পূর্ণতার তত্ত্বের মধ্যে পদ্ধতি ও নাম খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। বিবেকানন্দ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন:

"All narrow, limited, fighting ideas of religion have to go. All sect ideas and tribal or national ideas of religion must be given up.·········

"Religious ideas will have to become universal, vast and infinite, and then alone we shall have the fullest play of religion, for the power of religion has only just begun to manifest in the world.······So long as religion was in the hands of a chosen few, or of a body of priests, it was in

temples, churches, books, dogmas, ceremonials, forms and rituals. But when we come to the real, spiritual, universal concept then, and then alone, religion will become real and living ; it will come into our very nature, live in our every movement, penetrate every pore of our society, and be infinitely more a power of good, than it has ever been before.'?

—'Necessity of religion', Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৬৭-৬৮।

সকল রকম সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের যে বিদ্রোহের পরিচয় আমরা প্রতি পদে পেয়ে থাকি তার মধ্যে নিত্যসত্যের অন্তরায়ের বিরুদ্ধে একটি তীব্র পুঞ্জীভূত অসন্তোষ প্রবল বেগে বারবার আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে বিশ্বমানবমনের যে সারসত্য, মানুষের সভ্যতার সাধনার যে ফলশ্রুতি, তার প্রতিই তাঁর সুনির্দিষ্ট অঙ্গুলিনির্দেশ। 'মানুষের ধর্ম' সেখানে সবচেয়ে বৃহৎ পরিচয়ে উদ্ভাসিত। সর্বজনীন ধর্মাদর্শের পরিকল্পনায় সকল শীর্ণতা ও রুগ্নতাকে বিসর্জন দেবার আহ্বান জানিয়ে তাই বিবেকানন্দ লিখেছিলেন :

"Let all give up party spirit and jealousy, and unite in action. A universal religion cannot be set up through party-action."

—পত্র নং ৫৫, Complete Works, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ—২৫১।

তাঁর বহু উদ্ধৃত উক্তিটি আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে :

"Everything must be sacrificed if necessary, for that one sentiment, Universality."

—৫৫নং পত্র, Complete Works,
ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ—২৫০।

কিন্তু নিত্যসত্যের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে খণ্ডধর্মকে নানা প্রসঙ্গে আঘাত করলেও বিশ্বজনীন ধর্মের রূপ কল্পনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ অনেক স্থলেই আবার সর্বমতসহিষ্ণুতার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে বিশ্বজনীনতার পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি মূলতঃ

গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যতো মত, ততো পথ' তত্ত্বেরই অনুসরণ করেছেন বলা যেতে পারে। ধর্মসমন্বয়ের এই তত্ত্ব নিবিড়ভাবে অনুশীলন ও গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, নীতি শাস্ত্র আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির বাহ্য সামঞ্জস্য-সংঘটনের প্রয়াস সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে; তাই এই ধর্মকল্পনার মূল ভিত্তি সহনশীলতা। সাধক যে-ভাবেই সাধনা করুক, তাতেই তার মুক্তি আসবে,—এই হচ্ছে স্বীকৃতির সাহায্যে, সহিষ্ণুতার সহায়তায় সকলের সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা। বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে সংহতিসাধনের প্রয়াস সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ বলেছেন :

নানাধর্মের বাহ্যমিলন সংঘটনের প্রয়াস

"What then do I mean by the ideal of universal religion? I do not mean any one universal philosophy, or any one universal mythology, or any one universal ritual, held alive by all; for I know that this world must go on working wheel within wheel, this intricate mass of machinary, most complex, most wonderful. What can we do then? We can make it run smoothly, we can lessen the friction, we can grease the wheels, as it were. How? By recognising the natural necessity of variation. Just as we have recognised unity by our very nature, so we must also recognise variation."

—'The Way to the realisation of universal religion.'
Complete Works দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৮০-৮১।

নিত্য-সত্যের সম্বন্ধে সচেতন হলেও, বিশ্বজনীন ধর্মের পরিকল্পনা করতে গিয়ে এইভাবে অনেক স্থলে মুখ্যতঃ সর্বমত-সহিষ্ণুতার উপরেই বিবেকানন্দ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি স্পষ্টই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বলেছেন :

সহিষ্ণুতা

"The world is waiting for that grand idea of universal toleration."

—'The mission of Vedanta'. Complete Works
তৃতীয় খণ্ড, পৃ—১৮৭।

তাঁর বিশ্বখ্যাত চিকাগো ভাষণেও এইটিই ছিল মূল সুর।—এই 'toleration'-এর মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ বস্তুকে নির্বিরোধে সমাবিষ্ট করবার চেষ্টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সহিষ্ণুতা সম্পর্কে স্থল-বিশেষে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতা

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের এই সহিষ্ণুতাকে যে সর্বথা সমর্থন করতে পারেন নি তা তাঁর নিজের উক্তির মধ্যেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি রোমা রোলাঁকে এ বিষয়ে যা বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life.........We must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them. My attitude towards truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil; it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible. As a matter of fact, to-day Indian religious life suffers from the lack of wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion."

—Rolland and Tagore, P-100-101.

রবীন্দ্রনাথের মুক্তিসন্ধানী চিত্ত সাম্প্রদায়িক সীমায় দীর্ঘকাল বন্দী থাকতে পারে নি। তাঁর ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসার অথবা ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বজনীনতার পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করবার প্রয়াসের প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে 'গোরা' উপন্যাসে (১৯১০)। এই গ্রন্থের মূল কথাটি প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে গোরার কয়েকটি উক্তিতে:

সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ রবীন্দ্রনাথ

"আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই।............আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।............আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি

হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই,·········যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।”

—গোরা। অধ্যায় ৭৬।

এখানে মানুষের সবচেয়ে সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সকলের চেয়ে মৌলিক ধর্মের ভিত্তির উপরে মানুষকে স্থাপন করা হয়েছে, কবির ধর্মবোধ বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বসম্প্রদায়ের উদার ও বিশ্বজনীন নির্বিরোধ মিলনভূমির উপর দণ্ডায়মান হতে প্রয়াস পেয়েছে। কর্মকাণ্ড-সম্পৃক্ত সাম্প্রদায়িক খণ্ডধর্মের সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা, ‘Creed’-হীনতা ও সার্ব-ভৌমিকতাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। তাঁর ধর্ম-গীতগুলি এই সার্বভৌমিক ধর্মকল্পনার সর্বাপেক্ষা বড়ো বাহন।

রবীন্দ্রকল্পনায় ক্রীড্-হীনতা ও সার্ব-ভৌমিকতা

তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’-র গানগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মনীষী স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক্ কবিকে বলেছিলেন :

“তোমার এই কবিতাগুলিতে (‘গীতাঞ্জলি’র) কোনো ধর্মের কোনো Creed-এর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি।”

—‘স্টপফোর্ড ব্রুক’। পথের সঞ্চয়।

স্টপফোর্ড ব্রুক নিজে খ্রীষ্টানধর্মের নির্দিষ্ট বাহ্য কাঠামোর বন্ধনকে সমর্থন করতেন না। তিনি বুঝেছিলেন, ধর্মের বাইরের আয়তনটার প্রতি অতিমনোযোগের জন্যেই পাশ্চাত্ত্যে অনেকের মন ধর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে।

‘অগ্রসর হওয়ার আহ্বান’ প্রবন্ধে (১৩২০—৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ ; ‘শান্তিনিকেতন’ দ্বিতীয় খণ্ড) কবি ঐ অসাম্প্রদায়িক বা সর্বসাম্প্রদায়িক ধর্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। এধর্মের কথা বলতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথের সেদিন স্টপফোর্ড ব্রুকের কথা সবচেয়ে বেশিকরে মনে পড়েছিল :

“স্টপফোর্ড ব্রুক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড়করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে।·········

“আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই,—তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও

বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যাকিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সঙ্কীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

"পূর্বে যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না বলে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সে জন্য খ্রীষ্টান অত্যন্ত খ্রীষ্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছে যতোই আসছে ততোই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে।"

—'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান'। শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড।

'সঞ্চয়' পুস্তকে অনুরূপ কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের প্রবন্ধের মধ্যেও যুগধর্ম ও নিত্যধর্ম, খণ্ডধর্ম এবং বিশ্বধর্মের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা আছে।

ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতায় পীড়িত রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে দেশাচার ও লোকাচারের বন্ধন মুক্ত করে সার্বভৌমিক ভিত্তিতে স্থাপন করতে সচেতনভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়েও যেখানে তা সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করেছে সেখানে তিনি তাকে সমর্থন করেন নি, প্রতিকূল সমালোচনার কষাঘাত হেনেছেন। ধর্মকে তিনি সর্বদেশের, সর্বলোকের সম্পদ্ করতে চেয়েছিলেন। তাই সে চিন্তায় বিশেষ ধর্মের ক্রীড্ বা বীজমন্ত্রের স্থান নেই। গড্, আল্লা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি ঈশ্বরের সাম্প্রদায়িক নাম সেখানে পরিত্যক্ত। এ সাধনায় গির্জা, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি বিশেষ ধরণের কোনো উপাসনাগৃহেরও প্রয়োজন নেই। লক্ষ করলে দেখা যাবে,

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে,"

"বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়",

"অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে",

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এস",

"এই করেছ ভালো, নিঠুর
এই করেছ ভালো,
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জালো",

"তোরা শুনিস নে কি শুনিস নে তার
পায়ের ধ্বনি
সে যে আসে, আসে, আসে",......

ইত্যাদি প্রার্থনা-গীতগুলি কোনো সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নয়। নির্দিষ্ট সম্প্রদায়চিহ্নিত দেবতার নাম, উপাসনাগৃহ বা বীজমন্ত্রের স্পর্শ থেকে এরা মুক্ত। মানুষমাত্রেই এগুলি গান বা আবৃত্তি করে পরমেশ্বরকে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে পারে। আধুনিক জ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে এদের কোনো বিরোধ নেই। প্রেম বা ভক্তির কোনো অভাবও এদের মধ্যে লক্ষিত হয় না। কল্যাণ-কর্মে উদ্বুদ্ধ করবার প্রেরণা হিসেবেও এগুলির মূল্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। অহেতুক আচার অনুষ্ঠান বা মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা এই প্রার্থনাসঙ্গীতগুলি ভারাক্রান্ত নয়। ধর্মের এই বিস্তৃত উদার ক্ষেত্রে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক বিনা দ্বিধায় সম্মিলিত হতে পারে। তাই এ ধর্মাদর্শ নির্বিরোধ বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

রবীন্দ্র প্রার্থনাগীত ও ধর্মকল্পনার উৎকর্ষ সম্পর্কে বিনয়কুমার

রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে উচ্চতম উৎকর্ষ পাওয়া যায় কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তরে মনীষী বিনয়কুমার সরকার যা বলেছিলেন (১৯৪২ সাল) তা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

"সে হচ্ছে ভগবান্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রকল্পনা। মানুষের সঙ্গে ভগবানের যোগাযাগ রবীন্দ্রসাহিত্যে যারপরনাই ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে কল্পিত হয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো জাতের লোক, যে-কোনো ধর্মের লোক, যে-কোনো দলের লোক, এইরূপ ভগবান্ পেয়ে নিজেকে শক্তিমান সমঝিতে সমর্থ। রাবীন্দ্রিক ভগবৎসাহিত্যের মুদ্দাটা দেখবি? 'প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামি, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে'—এই গানটা শুনেছিস বোধ হয়। রাবীন্দ্রিক ভগবান্ আগাগোড়া এই সুরে গড়া।

"সকল প্রকার ভারতীয় ভগবানের কল্পনা রবীন্দ্রচিত্তে ঠাঁই পেয়েছে।

তবুও বলছি, উপনিষদের মন্তরগুলায় যে ভগবান্ পাওয়া যায় সেই ভগবানের সমান সনাতন ও বিশ্বজনীন রৈবিক্ ভগবান্। কিন্তু সেই ভগবানের চেয়ে এই রৈবিক্ ভগবান্ সরস, আত্মীয় ও মানুষময় বেশি। অপরদিকে বৈষ্ণব ভক্তি-সাহিত্যের ভগবান্ রাবীন্দ্রিক ভগবানের মতনই বস্তুপূর্ণ ও ব্যক্তিত্বময়। কিন্তু বৈষ্ণব ভগবান্ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভগবানের সমান সর্বজনীন ও সনাতন নন।

"দুনিয়ার নানা দেশের সংস্কারগুলা, রীতিনীতিগুলা আর লোকাচারগুলা ভুলে যা। দেখবি, রবীন্দ্রসৃষ্ট ভগবানের মতন মানুষমাত্রের কর্মোপযোগী, মানুষমাত্রের স্বাধীনতা-সেবক ভগবান্ আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।"

—'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম ভাগ), ১ম সং, পৃ—৫৮।

তিনি আরও বলেছিলেন ঃ

"আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মগীতগুলার কথা বলছি। এই গানগুলা হিন্দুগানও নয় মুসলমান গানও নয়। এ হচ্ছে বাঙালি স্ত্রীপুরুষমাত্রের জন্য ঈশ্বরবিষয়ক স্তোত্র। এ সবকে আমি হিন্দুমুসলমানের যৌথ ভগবদ্গীতা সমঝে থাকি। তাছাড়া আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মোপদেশ সমূহ। এই বাক্যগুলা হিন্দুর উপাসনা নয়, মুসলমানের উপাসনাও নয়। এসবের ভিতর আমি পাই বাঙালি হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আত্মবিশ্লেষণ ও পরমেশ্বর-ভক্তি। রাবীন্দ্রিক ভগবানকে ১৯৮০ সালের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাদের সার্বজনিক ভগবানরূপে পূজা করবে।"

—'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১ম ভাগ) পৃ—৪৪৫।

বিশেষ সম্প্রদায়সম্পৃক্ত খণ্ড ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারস্পরিক স্বীকৃতি বা মত-সহিষ্ণুতার অনুকূলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কোনো উক্তি খুঁজে পাওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু চিন্তার পরিণতির সঙ্গে কবির সুমহৎ বিশ্ববোধ তাঁকে নিত্যসত্যের অন্তরায়মাত্রের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। এক্ষেত্রে দেশ, কাল বা পাত্র-সাপেক্ষ সঙ্কীর্ণতার বাইরে বিশ্বমানবের প্রশস্ত রাজপথ-নির্মাণেই তাঁর আগ্রহ সমধিক। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত অখণ্ড সত্যের বোধই এখানে ধর্মের একমাত্র উৎস বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

নিত্যসত্যের অন্তরায় সম্বন্ধে রবীন্দ্র-অসহিষ্ণুতা

"মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে

অতিক্রম করে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন, সেইদিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেইদিক্ আছে তার অন্তরে যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সঙ্কীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্যেও সেই পরিমাণে সে বর্বর'।

—'মানুষের ধর্ম'।

অনুরূপ সর্বজনীন ধর্মাদর্শের কল্পনায় সকল সংস্কার ও গোষ্ঠীচেতনাকে বিসর্জন দেওয়ার সপক্ষে বিবেকানন্দ নানা উক্তিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে চিন্তা ব্যক্ত করেছেন তা আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি। অন্যদিকে, এই চিন্তাধারার পাশেই আবার, 'যতো মত ততো পথ' তত্ত্বের অনুসরণে সর্বধর্মসমবায়ের অনুষঙ্গে বিভিন্ন বিরোধী বস্তুকে পারস্পরিক সহনশীলতার সাহায্যে সমন্বিত করবার প্রয়োজনের বিষয়ে তিনি যে মতবাদ পোষণ করেছেন, সেটিকেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই দুই ধারাকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিবেকানন্দের ভাবনার এই আপাতবিরোধিতার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের কিছু পূর্বে উদ্ধৃত উক্তিটিতে ব্যক্ত হয়েছে।—তিনি বিবেকানন্দের সহিষ্ণুতার কারণ বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন, "Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life." —মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়-আশ্রিত ধর্মচিন্তার বাস্তব অবস্থিতির কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই ; এবং এই বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়েই তাদের সম্মিলনের কথা চিন্তা করতে হবে। আকস্মিকভাবে তাদের দীর্ঘ-আচরিত সংস্কার ও অভ্যাসের বন্ধন ভেঙ্গে ফেলে সকলকে কোনো সর্বজন-সংবেদ্য বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা বাস্তবানুসারী হতে পারে না। তার কারণ বিবেকানন্দের কিছু পূর্বে উদ্ধৃত উক্তিটিতে ব্যক্ত হয়েছে :

"I know that this world must go on working, wheel within wheel, this intricate mass of machinary most complex, most wonderful.······Just as we have recognised unity by our very nature, so we must also recognise variation."

—'The way to the realisation of universal religion,'
Complete works, দ্বিতীয় খণ্ড।

'Universal religion' এর কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ মানুষের ইতিহাসের ঐক্যের পাশে পাশে তার বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব সংস্থিতির কথাটিও বারবার স্মরণ করেছেন। এই বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখেই 'নির্বিশেষ মানবসত্যের' দিকে মানুষের ইতিহাসকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে।

সর্বজনীন ধর্মকল্পনাব দ্বিধারা

সর্বজনীন ধর্মকল্পনার দুই ধারার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা' প্রবন্ধে যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করে উভয় চিন্তানায়কের ধর্মচিন্তার আলোচনায় সমাপ্তি টানছি :

"ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ নিরসনের ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অশোক, আকবর, রামানন্দ থেকে রামমোহন পর্যন্ত ধর্মসাধকগণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের প্রয়াস এক ধরণের নয়। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এঁদের প্রয়াস প্রধানতঃ দুই পর্যায়ভুক্ত। এক পর্যায়ে আছে ধর্মনীতি, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানের বাহ্য সংঘটনের প্রয়াস, ইংরেজিতে যাকে বলে eclecticism, এ প্রয়াস মূলতঃ তাই। এ প্রসঙ্গে আকবর (দীন-এলাহি), রামকৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধীর নামই বিশেষ করে মনে পড়ে। এ মতের প্রধান কথা—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (গীতা ৪।১১), 'যতো মত ততো পথ' (রামকৃষ্ণ)—যে যেভাবেই সাধনা করুক তাতেই তার মুক্তি। এ হচ্ছে স্বীকৃতির দ্বারা সহিষ্ণুতার দ্বারা সকলের একত্র সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা ; এমতের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম,
সবকো সন্মতি দে ভগবান্।

ভগবদ্দত্ত 'সন্মতি' অর্থাৎ সর্বমতসহিষ্ণুতার উপরেই এর ভরসা। এ মিলন বাহ্য মিলন ; পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুকেও নির্বিরোধে একত্র সমাবিষ্ট করাই এর আদর্শ। নানা ধর্মের নানা শাস্ত্র (গীতা-কোরান-বাইবেল) ও আচার, ভগবানের বিভিন্ন নাম (গড্-আল্লা) প্রভৃতি সবকিছুকে মেনে নেওয়ার উপরেই এর আশ্রয়। এর মূলে কোনো নিত্যসত্যের দৃঢ়ভূমি নেই। সুতরাং এ মিলনের স্থায়িত্বও সুনিশ্চিত নয়।

দ্বিতীয় পথের লক্ষ্য বাহ্য সমাবেশ বা অবিরোধমাত্র নয়, অন্তরের মিলন। এই পথের যাত্রীদের মধ্যে অগ্রণী হলেন অশোক। অতঃপর দীর্ঘ ব্যবধানের পর মধ্যযুগে কবীর নানক দাদূ প্রভৃতি এ পথে পদচারণা করেন। আধুনিক যুগের আরম্ভে রামমোহন এবং অন্তে রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবকেই এ পথের আহ্বান জানান। এই পথের বৈশিষ্ট্য একদিকে বিশ্ববোধ এবং অপরদিকে চিরন্তনতা-বোধ। যা কিছু খণ্ডকালীন এবং খণ্ডদেশিক তাকেই তাঁরা অগ্রাহ্য করেন। নিত্যসত্যের অন্তরায়মাত্রের প্রতি তাঁদের অসহিষ্ণুতা চিরজাগ্রত।"

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১১শ খণ্ড ১১শ বর্ষ, ১৩৫৯ শ্রাবণ, পৃ—৩১।

বাস্তবে এই দুই ধারার পারস্পরিক পরিপূরকতা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বিবেকানন্দ উভয়কেই যুগপৎ সক্রিয় করতে চেয়েছিলেন, মানব-ইতিহাসে আন্তরিক ঐক্যের ভিত্তিভূমির উপর বিচিত্র বহির্জীবনাচরণের সামঞ্জস্যসৌধ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজচিন্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ঃ বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ

ভারতীয় জীবনযাত্রায় ধর্ম ও সমাজ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত। একটিকে নেপথ্যে রেখে অপরটির কথা চিন্তাকরা চলে না। সমাজচিন্তা বিষয়ক আলোচনার সূচনাতেই এই সত্যটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন ; কারণ পূর্বে ধর্ম-চিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে এমন অনেক কথার অবতারণা করা হয়েছে যা সমাজচিন্তার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। বর্তমান অধ্যায়ে সেগুলির বিস্তৃত পুনরাবৃত্তি পরিত্যাগ করে সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র অন্তে ক্ষান্ত হওয়া যেতে পারে।

ধর্ম ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

যুগের অন্যতম প্রধান প্রবণতার সূত্র ধরে স্বদেশের প্রাচীন স্বরূপ সম্বন্ধে একটি বিশেষ গৌরববোধ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার লাভ করেছিল। এই গৌরববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উভয়ে একসময় সনাতন হিন্দুত্বকে খুব বড়ো করে দেখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে আদর্শায়িত বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েও প্রথম জীবনে হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্মের জয়োচ্চারণ করেছিলেন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন বর্ণাশ্রমের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন। উভয়ের দৃষ্টিতেই বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্মের ব্যাবহারিক জীবনের এককালীন প্রধান ধারক-গুলির মধ্যে অন্যতম। জাতিভেদকে তাঁরা সেই বর্ণাশ্রমের বিকৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ

প্রাচীন বর্ণভেদের মূলে যুক্তিসহ সামাজিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিভূমি ছিল, কারণ সে বিভাগ বৃত্তিভেদের উপর-নির্ভর করে একান্ত সামাজিক প্রয়োজনেই দেখা দিয়েছিল। বর্তমান জাতিভেদ আচারসর্বস্বতায় পরিণত হয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদকে সুদূরপ্রসারী ও দুঃসহ করে তুলেছে। সমাজজীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটলে সামাজিক সত্য ব্যাহত হয়, যুগসত্য বাধাপ্রাপ্ত ও উপেক্ষিত হতে থাকে।

বিবেকানন্দ জাতিভেদকে প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম-আদর্শের বিকৃতি আখ্যা দিয়ে বললেন :

জাতিভেদ বর্ণাশ্রম-আদর্শের বিকৃতি

"Now the original idea of Jati was this freedom of the individual to express his nature, his Prakriti, his Jati, his caste, and so it remained for thousands of years. Not even in the latest books is inter-dining prohibited, nor in any of the older books is inter-marriage forbidden. Then what was the cause of India's downfall ?—the giving up of this idea of caste.······The present caste is not the real Jati, but a hindrance to its progress. It really has prevented the free action of Jati, i.e., caste or variation. Any crystallised custom or privilage or hereditary class in any shape really prevents caste (Jati) from having its full sway, and whenever any nation ceases to produce this immense variety, it must die.······Every frozen aristocracy or privilaged class is a blow to caste and is. no-caste. Let Jati have its sway ; break down every barrier in the way of caste, and we shall rise."

—'A plan of work for India', Complete works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৩১৭।

"Another great discrepancy : the conviction is daily gaining on my mind that the idea of caste is the greatest dividing factor and the root of Maya,—all caste either on the principle of birth or of merit is bondage".

—পত্র নং-১২২। Complete Works ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ—৩৫৫।

"I regret that in modern times there should be much discussion between the castes.···The day for these privilages and exclusive claims is gone. The duty of every aristocracy is to dig its own grave, and the sooner it does so, the better."

—'The future of India'. Complete works তৃতীয় খণ্ড, পৃ—২৯৭।

পাশ্চাত্ত্যে প্রকৃত জাতিব্যবস্থার উদ্ভব

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যেই প্রকৃত জাতি গড়ে উঠেছে বলে মনে করেছেন, কারণ সেখানে লোকেরা নিজেদের বৃত্তি-মনোনয়নের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে, আপন সামাজিক জীবন গঠনের ক্ষেত্রে তাদিকে কৃত্রিম বিধিনিষেধের নিয়ম পদে পদে মেনে চলতে হয় না। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য সমাজের সম্বন্ধে বললেন :

"Now look at Europe. When it succeeded in giving free scope to caste and took away most of the barriers that stood in the way of individuals, each developing his caste—Europe rose. In America, there is the best scope for caste (real Jati) to develop, and so the people are great."

—'A plan of work for India'. Complete works চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৩১৭।

বর্ণভেদ ও বৃত্তিভেদ

রবীন্দ্রনাথও জাতিভেদের বর্তমান রূপকে সমাজের মঙ্গলধর্মের প্রবল বাধা হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছেন। বর্ণভেদের ভিত্তি ছিল মূলে বৃত্তিভেদ। এই বৃত্তিভেদ ব্যক্তিগত যোগ্যতার ও নিপুণতার উপরেই নীতিগতভাবে নির্ভরশীল হওয়া উচিত ; বিশেষ করে যে-সকল বৃত্তির উৎকর্ষ অভ্যাসমাত্রের উপর নির্ভর না করে ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি ও মানসিক অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে সেগুলি সম্বন্ধে একথা অধিকতর প্রযোজ্য। কিন্তু ক্রমে বৃত্তিমূলক বর্ণভেদ বংশগত হয়ে গেল। তার পশ্চাতে অনেকাংশে কাজ করেছিল গোষ্ঠীবিশেষের সংরক্ষিতস্বার্থবাদ। এই মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে দেখা দিয়েছে সামাজিক দুরূহ অনৈক্যের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

বৃত্তিমূলক বর্ণভেদ বংশগত হওযার ফলে বর্ণাশ্রমের বিকৃতি

"জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধি-নিষেধ সমস্ত অচল হইয়া বসিয়া আছে।"

—'শিক্ষাবিধি'। শিক্ষা।

"যেসকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয় তাহলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের

ঠাট্টাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তার জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনা দরকার, যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়।"

—'শূদ্রধর্ম'। কালান্তর।

চতুরাশ্রম

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সমাজজীবনের চতুরাশ্রমের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ও শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করতে হয়। চতুরাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই নিয়মিত জীবনধারা মানুষকে ক্রম-পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়ে সমাপ্তিতে পূর্ণতার সন্ধান দেয়ঃ

"ভারতবর্ষ চারি-আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য যৌবন প্রৌঢ়বয়স ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছে, তাহাতে বিশাল বিশ্বসঙ্গীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয়।"

—'ততঃ কিম্'। ধর্ম।

বাল্যে গুরুগৃহে বাস, ব্রহ্মচর্যের কঠোর সংযম পালনের দ্বারা জীবনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি নির্মাণ, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে সম্মিলিত হয়ে বেড়ে ওঠা; যৌবনে সংসারে প্রবেশ, কর্মব্রতে দীক্ষা, কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ; বার্ধক্যে সংসারবন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করে নিঃস্বার্থচিত্তে অধ্যাত্মলোকে অনুপ্রবেশের জন্যে লোকালয় সন্নিকটস্থ বনবাসে আত্মপ্রস্তুতি ও লোকশিক্ষায় এবং সমষ্টিসেবায় আপন প্রৌঢ় পরিণত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ; অবশেষে সম্পূর্ণ লোকালয় ত্যাগ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস—চার আশ্রমের মধ্য দিয়ে এইভাবে ভারতীয় সমাজজীবনকে শ্রেয়ঃ লাভের বা ধর্মোত্তরণের উপায়স্বরূপ করে তোলবার পন্থা নির্দেশ করেছিলেন প্রাচীন ঋষিরা।

সমাজের উপর ধর্মাধিপত্যের ফলে সমাজ-সংকট

বৃত্তিবৈচিত্র্যমূলক বর্ণভেদকে যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করবার জন্যে স্বার্থান্বেষী লোকেরা তাকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দিয়েছে। এইরকম করে ধর্ম সমাজকে গ্রাস করে তার প্রভু হয়ে বসার জন্যে যে সামাজিক অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে সমাজে কর্মের গতি হয়েছে ব্যাহত। ধর্ম

সমাজের উপর আধিপত্য করতে থাকলে সমাজের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে বিবেকানন্দ বলেছেন :

"The terrible mistake of religion was to interfere in social matters.••••••••True, what we want is that religion should not be a social reformer, but we insist at the same time that religion has no right to become a social law-giver. Hands off; keep yourself to your own bounds and every thing would come right.······Especially therefore you must bear in mind that religion has to do only with the soul and has no business to interfere in social matters,—you must also bear in mind that this applies completely to the mischief which has already been done."

—'What we believe in', Complete works, ৪র্থ খণ্ড পৃ—৩০৪।

তিনি স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রশ্ন করলেন :

"What business had the priests to interfere (to the misery of millions of human beings) in every social matter ?"

—'What we believe in', Complete works ৪র্থ খণ্ড, পৃ—৩০৫।

রবীন্দ্রনাথও সমাজপরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মানুশাসনৈকাধিপত্যের ফলাফল সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে বলেছেন :

"আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।"

—'শূদ্রধর্ম'। কালান্তর।

তপোবনজীবন

প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও তপোবনজীবনের রূপটি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের চিন্তাকেই একসময় প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে জীবন থেকে আমাদের শোচনীয় বিচ্যুতি যে আমাদের জাতীয় জীবনের কতো বড়ো সাংঘাতিক বিপর্যয় এবং কতোখানি মর্মান্তিক আত্মবিস্মৃতি তা তাঁরা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই জাতির আত্মস্থতা ও জাতীয় চিত্তের উদ্বোধনের জন্যে বর্তমান

সমাজজীবনে সেই প্রাচীন তপোবনজীবনের শ্রেয়ঃ রূপটির প্রতিফলনের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়েছিলেন। তারই ফলে সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মঠ বা সন্ন্যাসাশ্রম এবং কবি একদা রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এর মধ্য দিয়ে উভয়েই সেদিন জাতির যুবসম্প্রদায়কে সংযম ও ত্যাগব্রতে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের শাশ্বত আদর্শের বীজকে নূতন উত্তমে তাদের হৃদয়ে উপ্ত করতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন এবং আদর্শ সমূহ বিবেকানন্দকে কতদূর আকৃষ্ট করেছিল সেসম্বন্ধে বেশি বলা বাহুল্য। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আদর্শের রূপটিকে প্রচার এবং স্বদেশে ও বিদেশে তার ব্যাবহারিক প্রয়োগকে সম্ভব করে তোলবার প্রয়াসকে তিনি জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবনসম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা

বর্ণাশ্রমধর্মের সমর্থন, যুবক ও তরুণদিকে দীপ্ত ব্রহ্মচর্যের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার আহ্বান, বিশ্বে বেদান্তধর্মের বিজয়কেতন উড্ডীন করবার প্রচেষ্টা প্রভৃতির মধ্যে তাঁর সেই ব্রত-উদ্‌যাপনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ব্রহ্মচর্যকামী যুবকদের নৈতিক জীবন ও চরিত্র গঠনের জন্যেই তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে প্রাচীন ভারতের ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে রূপদেবার চেষ্টা লক্ষিত হচ্ছে। বন্ধনহীন আসক্তিহীন কর্মব্রতী সমাজসেবীদের সৃষ্টিকরা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। সংশয়বিক্ষুব্ধ, বস্তুতন্ত্রসাধনার প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার অত্যাগ্রহে রুদ্ধশ্বাস, ভোগবিলাসী পাশ্চাত্যের যক্ষপুরীতে বীর সন্ন্যাসী প্রাচ্যের আদর্শের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে এসে-ছিলেন। কুবেরের আরাধনায় নিমগ্ন উন্নাসিক আত্মবিস্মৃত প্রতীচ্য আকস্মিক কষাঘাতে শুধু চমকিত হয়েই ওঠে নি, এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে অবশেষে তারা নতমস্তকে গুরুর আসন দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সন্ন্যাসাশ্রম ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন ও 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতা-রচনা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনের সমকালীন।—

'নৈবেদ্য'-এর কবিতা ও 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধাদির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের জয় উচ্চারণ করেছিলেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাকেই কর্ম-আকারে রূপদেবার চেষ্টা লক্ষকরা যায়। নানা পত্র ও

রচনায় কবি নিজের এই মনোভাবটি প্রকাশকরেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন :

"শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক্ প্রাচীন কালের গুরুগৃহবাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম গন্ধ থাকিবে না—ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রকৃতি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে—দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্য আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।"

—রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। প্রবাসী ১৩৩৩ চৈত্র, পৃ—৭৬৫।

আর একখানি পত্রে (১৩০৮, আশ্বিন) লিখেছেন :

"পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং-বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষমাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।"

—প্রবাসী, ১৩৪৫ বৈশাখ, পৃ—৩।

ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে এক পত্রে কবি লিখেছিলেন (১৩০৮, ২৮শে চৈত্র) :

"আমি ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই—তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতি বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হউক, অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর।......

"......বিদেশি ম্লেচ্ছতাকে বরণকরা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো।

" 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' ।"

—প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ—৬৫৫-৫৬।

'নববর্ষ', 'ব্রাহ্মণ', 'সমাজভেদ' (স্বদেশ), 'প্রাচীন ভারতে একঃ', 'ততঃ কিম্' (ধর্ম), 'তপোবন' (শিক্ষা) প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে কবি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সমাজকে এক গৌরবময় পটভূমিকায় স্থাপনকরে দেখবার চেষ্টাকরেছেন।

এপর্বে কবি প্রাচীন ভারতের সবকিছুকে মহান ও রমণীয় করে দেখতে

প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখেছেন,

"কালিদাস গুপ্তসাম্রাজ্যের ভারতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শক্তির দাম্ভিকতা দেখিয়া অন্তরে অন্তরে পীড়াবোধ করিয়া যেরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে আদর্শের সন্ধানে যাত্রাকরিয়াছিলেন ও কাব্যের তুলিকায় তপোবনের স্বপ্নালোক সৃষ্টি করেন, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ মনোলোকে, একটি আদর্শ তপোবনের চিত্র দেখিতে আজ তন্ময়। সেই আদর্শ বর্তমানকালোপযোগী করিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা"।

—'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড, পৃ—৩২ (১ম সং)।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে কবির চিন্তা ও পরিকল্পনা অবশ্যই পরিণতি লাভ করেছে এবং তার সঙ্গে লক্ষ্যেরও নানা বিস্তার ঘটেছে। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিন শিক্ষার ও জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের মিলনসাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠতে প্রয়াসী হয়েছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম হয়েছে বিশ্বভারতী ('যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্')। স্বদেশের চিত্তমুক্তির তপস্যা শুধু তপোবনরচনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, বিশ্বজনীন চিত্তসম্মিলনের সাধনায় লীন হয়ে তা বিস্তৃততর তাৎপর্য লাভ করেছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিস্তারকে স্বীকার করেও তা কোনো সময়েই তার আশ্রমরূপটিকে বিস্মৃত হয় নি। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-ভিত্তির উপরই বিশ্বভারতীর সৌধ গঠিত হয়ে চলেছে। সেই আশ্রমস্বরূপেই তার প্রাণকেন্দ্র বাঁধা। তার বাহ্যরূপের অন্তরালে সেইটিই তার জীবন-শক্তির প্রচ্ছন্ন স্বতঃস্ফূর্ত উৎস হয়ে বিরাজ করছে।

বিশ্বভারতীর আশ্রম-ভিত্তি

সন্ন্যাসীর আশ্রম স্বল্প দিনের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠাতৃপুরুষকে হারিয়েছে। তবু সে তার অগণিত শাখা প্রশাখাকে ছড়িয়ে দেশে বিদেশে প্রাচ্যের মর্মবাণীটিকে উচ্চারণ করে চলেছে অবিরাম অশ্রান্ত প্রচেষ্টায়। অন্যদিকে, কবির আশ্রম কবির নেতৃত্ব তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘতর দিন লাভ করেছিল। সেখানের প্রান্তরে মৌন-মুখরতায় বিশ্ব আমন্ত্রিত হয়েছে পারস্পরিক মনোবিনিময়ের আনন্দযজ্ঞে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজের মুক্তিসাধনা

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের হিন্দু তথা ভারতীয় সমাজকে সমস্তরকম বিরোধ ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে সার্বভৌম ভিত্তির উপর স্থাপন করবার প্রচেষ্টাটিকে আমরা পূর্বেই লক্ষকরেছি। সমাজকে যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে, তার আদর্শরূপ কল্পনা করতে গিয়ে দুজনের বাণীতে একদিকে যেমন সকল মননহীন আচার, বিচারহীন সংস্কার ও বস্তুসর্বস্ব সভ্যতার বিরুদ্ধে রুদ্র রোষে বিনাশের শক্তিমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রকাশ পেয়েছে উদার বিশ্বমানবিকতার প্রতি তাঁদের প্রসন্ন চিত্তের আকর্ষণ। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সৃষ্টির আনন্দবোধই তাঁদের আশ্রয়।

দেশ-কাল-সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতাকে উভয় চিন্তানায়ক কি দৃষ্টিতে দেখেছেন ও তার বিলয় কি-ভাবে কামনা করেছেন তা আমরা তাঁদের ধর্ম-চিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি। তার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মতোই সমান গুরুত্বের সঙ্গে তাঁরা যন্ত্র-সর্বস্ব সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন। ধর্ম-চিন্তার আলোচনাসূত্রে আমরা যান্ত্রিকতার সম্বন্ধে উভয়ের যে প্রতিকূল মনোভাবটির পরিচয় পেয়েছি এখানে তার তাৎপর্য নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা চলতে পারে।

সংকীর্ণ সংস্কার ও বস্তু-সর্বস্ব সভ্যতা উভয়ের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যের বস্তুসর্বস্বতাকে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে চরম অভিশাপ বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"I must tell you frankly that the very foundations of western civilization have been shaken to their base. The mightiest buildings, if built upon the loose sand foundations of materialism, must come to grief one day, must totter to their destruction, some day. The history of the world is our witness. Nation after nation has arisen and based its greatness upon materialism, declaring man was all matter......All such civilizations, therefore, as have been

based upon such sand foundations as material comfort and all that, have disappeared one after another, after short lives from the face of the world......A material civilization once dashed down, never can come up again ; that building once thrown down, is broken into pieces once for all."

—'The common bases of Hinduism',
Complete works তৃতীয় খণ্ড, পৃ—৩৮০।

রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করে মন্তব্য করেছেন :

"যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিমসমাজে মানব-সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে।"

—'শিক্ষার মিলন'। কালান্তর।

যন্ত্র যেখানে প্রাণকে পিষ্ট করেছে, অন্তঃকরণকে বিশ্লিষ্ট করেছে, আত্মাকে অবরুদ্ধ করেছে সেইখানেই কবি তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছেন ; কারণ অন্তঃকরণ গৌণ হয়ে যখন উপকরণ মুখ্যস্থান লাভ করে তখনই মানুষের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে। অন্তঃকরণের সঙ্গে উপকরণের, প্রাণের সঙ্গে যন্ত্রের এই বিরোধ কবির 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকের মধ্যে নিপুণ শিল্পরূপে প্রদর্শিত হয়েছে।

বস্তুসর্বস্বতা শোষণজীবী ধনতন্ত্রবাদী শ্রেণীর সৃষ্টি করে

বস্তুতান্ত্রিকতার আধিক্য বা উপকরণের আতিশয্য মানুষকে লোভী, অত্যাচারী, আকর্ষণজীবী করে তোলে। শোষণজীবী ধনতন্ত্রবাদী গোষ্ঠীকে যন্ত্রসর্বস্ব-সভ্যতার সহজাত সৃষ্টি বলে বিবেকানন্দ মনে করেছেন :

"Machines are making things cheap, making for progress and evolution, but millions are crushed, that one may become rich ; while one becomes rich, thousands at the same time become poorer and poorer, and whole masses of human beings are made slaves."

—'Maya and Illusion', Complete works
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৯৬।

বিবেকানন্দের মতোই বস্তুসাধনার প্রগতি ও উজ্জ্বলতার দিকটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হলেও যেখানে তার বিপথগামিতা শোষণের উদ্ভব ঘটায় সেখানে তাঁর প্রবল সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে :

"বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেইখানেই তার ভয়ঙ্কর পতন।"

—'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'। কালান্তর।

তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ঃ

"একদিন জাগিয়া উঠিয়া য়ুরোপকে তার লুব্ধতা এবং উন্মত্ত অহংকারের সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে; তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, উপকরণই যে সত্য তাহা নয়, অমৃতই সত্য।......

"......মানুষ নিজকৃত বস্তুসঞ্চয় এবং বাহ্যরচনার অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে অন্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়ে।" —'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'। কালান্তর।

যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তিলাভের উপায়

এই যান্ত্রিকতা থেকে পরিত্রাণলাভের উপায় কি? ক্ষুদ্র যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্র দিয়ে হয়তো জয় করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। এরকম করে মানুষ শুধু বৃহত্তর যন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করে। যেখানে যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব, সেখানে সেই প্রাণ দিয়েই যন্ত্রকে জয় করতে হবে; আত্মার সঙ্গে যেখানে বস্তুর বিরোধ সেখানে আত্মিক শক্তির দ্বারাই বস্তুসর্বস্বতার উপর বিজয়ী হতে হবে। পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করে পাশ্চাত্ত্যের প্রতি প্রাচ্যের নৈতিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ এই সত্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

"Materialism and all its miseries can never be conquered by materialism. Armies, when they attempt to conquer armies, only multiply and make brutes of humanity. Spirituality must conquer the west. Slowly they are finding out that what they want is spirituality to preserve them as nations."

—'The work before us', Complete Works
তৃতীয় খণ্ড, পৃ—২৭৭।

পাশ্চাত্যের বস্তুসর্বস্বতার প্রতাপে পীড়িত মানবাত্মার আর্তি রবীন্দ্রনাথকেও বারবার চঞ্চল করে তুলেছে। প্রতীচ্য-পরিক্রমা ও প্রতীচ্যের সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ অনুশীলন কবিকে জীবনবিমুখ উপকরণচর্চার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সম্যক্ ভাবে অবহিত করেছে। এই প্রবণতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, এই প্রাণ-পরাঙ্মুখ বস্তুতান্ত্রিকতার অবরোধ অধিকতর বস্তুনিষ্ঠার দ্বারা ভাঙা যায় না, একমাত্র আত্মিক শক্তির দ্বারা সে বাধা অপসারণ করা যেতে পারে।—এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে যন্ত্র ও বস্তুতন্ত্রের উপর আত্মার বিজয়লাভের তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকে সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী' নাটকের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। 'মুক্তধারা' নাটকে 'যন্ত্ররাজ বিভূতি' কর্তৃক নির্মিত তার অপরিমিত যন্ত্রকৌশল ও অসামান্য দম্ভের প্রতীক, শিবতরাইয়ের তৃষ্ণার জল অপহরণকারী দানবীয় যান্ত্রিক বাঁধ চূর্ণ করা সম্ভবপর হয়েছে 'মুক্তধারার মুক্ত জাতক' অভিজিত-এর আত্মদানের ফলেই। 'রক্তকরবী' নাটকে 'মরাধনের শবসাধক' যক্ষরাজের যন্ত্রসর্বস্বতা ও বস্তু-সঞ্চয়াতিশয্যে বদ্ধ আত্মা যৌবনের দূতী নন্দিনীর আহ্বানে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে যৌবনের প্রতিভূ রঞ্জনের আত্মোৎসর্গের রুধিরাক্ত পথ মাড়িয়ে।

মননহীন মন্ত্র ও জীবনবিমুখ যন্ত্র, সংকীর্ণ সংস্কার ও বস্তুসর্বস্ব মনোভাব,—উভয়েরই বিরুদ্ধে দুই চিন্তানায়ক তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন, কারণ উভয়ই মানুষের চিত্ত-শক্তিকে বদ্ধ ও পঙ্গু করে, মুক্ত চিন্তার বাধা ঘটায়। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই সামাজিক অচলায়তনের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। স্থিতিশীল নিষ্প্রাণ সমাজকে গতিশীলতায় মুক্তি দিয়ে সজীব করে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। গতি-শক্তির দীনতা সমাজে আনে যতির সংকোচ, আর এ সংকোচের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে সমাজের প্রাণশক্তির শিলীভবন। তাই জঙ্গমশক্তিসঞ্জাত যে বেগবিস্তৃতির মধ্যে জীবনের সুস্থ চঞ্চল রূপটি প্রকাশ পায় সেই বিস্তারকে কামনা করে বিবেকানন্দ বলেছেন :

সমাজ-বিকৃতির অন্যতম প্রধান কারণ স্থাবরতা, স্থিতিশীল সমাজে জঙ্গম-শক্তির সঞ্চার করতে হবে

"The first manifest effect of life is expansion. You must

expand if you want to live. The moment you have ceased to expand, death is upon you, danger is ahead."

—'The work before us'. Complete works,
তৃতীয় খণ্ড, পৃ-২৭২।

"The quicker you can empty the air out of this room, the quicker it will be filled up by the external air, and if you close all the doors and every aperture, that which is within will remain, but that which is outside will never come in, and that which is within will stagnate, degenerate, and become poisoned. A river is continually emptying itself into the ocean and is continually filling up again. Bar not the exit into the ocean. The moment you do that, death seizes you."

—'Work and its secret', Complete works
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৬।

"Try to expand. Remember, the only sign of life is motion and growth.······Organize and found societies and go to work, that is the only way."

—১০ নং পত্র, Complete works
পঞ্চম খণ্ড, পৃ—৩১।

"Whirls and eddies occur only in a rushing, living stream. There are no whirlpools in stagnant, dead water. Variation is the sign of life, and it must be there."

—'The way to the realisation of universal religion'.
Complete works দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৬১-৩৬২।

গতিহীন বৈচিত্র্যহীনতারই অপর নাম মৃত্যু। গতির মধ্যে জীবনের অনুরণিত চিরন্তন ছন্দটিকে অনুধ্যান করে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন :

"যাহাকিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে —যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে; তাহার

মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এইজন্য মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগ নাই। যে যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখ হিসাব করিয়া বলিতেছি, জগতে আমাদের মতো সনাতন আর কিছুই নাই। কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে, সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।"

—'বিবেচনা ও অবিবেচনা'। কালান্তর।

"পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে আর কেউ থামবে না। জগৎ-প্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিম্বা অল্পে অল্পে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীতে এইরকম নিয়ম।"

—'নূতন ও পুরাতন'। স্বদেশ।

সজীব সমাজ চঞ্চলতায় মুখর এবং নানা বৈচিত্র্যের সংঘাতে পূর্ণ হবে এইটাই স্বাভাবিক। কবি বললেন :

"সঙ্কীর্ণতা ও নির্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে, সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয়, সেকথা সত্য। যেখানে জীবন অধিক, সেখানে স্বাধীনতা অধিক, এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক।"

—'নূতন ও পুরাতন'। স্বদেশ।

স্থিতিসর্বস্ব সমাজে গতির কামনা করে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

আমাদের সমাজে আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন।"

—'শিক্ষাবিধি'। শিক্ষা।

সকলরকম স্থাবরতার বিরুদ্ধে মনস্বী কবির বিদ্রোহ, কারণ যা স্থাবর তাই স্থবির। সেখানে তারুণ্যের স্পর্শ নেই, প্রাণের মহোৎসবে তা মুখর নয়। কবি নবীনের জয়গান গেয়েছেন :

"তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জংগল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক; তাহার অবিবেচনার উদ্দাম বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক।"

—'বিবেচনা ও অবিবেচনা'। কালান্তর।

এই অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'তপোভঙ্গ' কবিতায় যৌবন-অভ্যর্থনার কয়েকটি পংক্তি স্মরণে আসে:

"বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন নাশন,
আমি রচি তারি সিংহাসন, তারি সম্ভাষণ।"

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সমাজজীবনের সুস্থতা, তারুণ্য ও সৃষ্টিমুখীনতাকে অব্যাহত রাখবার জন্যে গতিশক্তির প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁরা কেউই গতিকে চরম ও পরম বলে ভাবেন নি। গতিকে তাঁরা কামনা করেছেন স্থিতিসর্বস্বতার পঙ্গুতা ও বিকৃতিকে বিদূরিত করবার জন্যে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যা চেয়েছেন তা স্থিতি ও গতির সমন্বয়। গতিহীন স্থিতি জীবনহীন জড়তার নামান্তর, স্থিতিহীন গতি নিয়মহারা লক্ষ্যচ্যুত উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। এই দুই-এর সামঞ্জস্যেই পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

স্থিতি এবং গতির ভাবসাম্য ও সমন্বয়।

"চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক।"

—'বিবেচনা ও অবিবেচনা'। কালান্তর, পৃ—২৭-২৮,
পরিবর্ধিত সং, ১৩৫৫।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নানা উক্তি ও রচনায় বারবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমাজের সম্মিলন কামনা করেছিলেন। এর মূলেও উভয়ের এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য-সাধনের মনোভাবটি কাজ করেছে। প্রাচ্য শাস্ত্রাচারমুখী স্থিতিসর্বস্ব, পাশ্চাত্ত্য বস্তুবিজ্ঞানমুখী গতিসর্বস্ব। উভয় চিন্তানায়ক চেয়েছিলেন, প্রাচ্য সমাজের স্থাবরতা ও পাশ্চাত্ত্য সমাজের জঙ্গম শক্তি সম্মিলিত হোক। এই সম্মিলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত সৃষ্টিশীল একটি আদর্শ মানবসমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্যের প্রয়োজনে আদর্শ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সম্মিলন কামনা।

সমাজ ও আদর্শ বিশ্ব গঠনের জন্যে পূর্ব ও পশ্চিমকে সম্মিলিত হতে হবে একথা বিবেকানন্দের কণ্ঠে প্রবল প্রত্যয়ে ধ্বনিত হয়েছে :

"As western ideas of organization and external civilization are penetrating and pouring into our country, whether we will have them or not, so Indian spirituality and philosophy are deluging the lands of the West.......It is not that we ought to learn everything from the West, or that they have to learn everything from us, but each will have to supply and hand down to future generations what it has, for the future accomplishment of that dream of ages, the harmony of nation, an ideal world."

—Reply to the address at Madura, Complete Works, তৃতীয় খণ্ড, পৃ—১৭১।

"Can you make a European society with India's religion ? I believe it is possible and it must be."

—'To my brave boys,' Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৩১২।

"Can you become an occidental of occidentals in your spirit of equality, freedom, work and energy, and at the same time a Hindu to the very backbone in religious culture and instincts ? This is to be done and we will do it. You are all born to do it."

—৭নং পত্র, Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ—২৬।

"The West wants every bit of spirituality through social improvements. The East wants every bit of social power through spirituality."

—১৫ নং পত্র, Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ—৩৭।

"I would say, the combination of the Greek mind represented by the external European energy added to the Hindu spirituality would be an ideal society for India."

—'The abroad and the problem at home', Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ—১৪৫-১৪৬।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব বিশ্লেষণ করে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ যা বলেছেন তা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন :

"The older he grew, the deeper was his conviction that the East and the West must espouse each other. He saw in India and Europe 'two organisms in full youth,......two great experiments neither of which is yet complete'."

—'The Life of Vivekananda and the Universal Gospel.'

রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ কারণে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনকে ঐকান্তিকভাবে কামনা করেছিলেন :

"পূর্ব ও পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে;...... পূর্ব পশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব ; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।"

—'শিক্ষার মিলন'। শিক্ষা।

"পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে এবং তাহার যাহা কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই।"

—'পূর্ব ও পশ্চিম'। সংকলন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। পরস্পরের পরিপূরকতার জন্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা আমরা দেখেছি। কিন্তু এই সম্মিলনের নামে প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণকে তাঁরা কোনো সময়েই সমর্থন জানাননি। লক্ষ করলে দেখা যাবে, উভয়ে নানা প্রসঙ্গে প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণচেষ্টার তীব্র নিন্দাই করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের বাহ্য আড়ম্বর ও চাকচিক্যের আকর্ষণে আত্মবিস্মৃত হলে তা প্রাচ্যের শ্রেয়ঃ বোধকে বিপর্যস্ত করবে এবং তার ফলে প্রাচ্যের সমূহ ক্ষতি যে অবশ্যম্ভাবী, এই সাবধানবাণীই তাঁরা উচ্চারণ করেছেন। পূর্ব পশ্চিমের কাছ থেকে যা গ্রহণীয় তা গ্রহণ করুক, এ কামনা তাঁরা ব্যক্ত করলেও

প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণের সম্পর্কে সতর্কবাণী

উভয়ে যা চেয়েছেন তা অনুকরণ নয়,—স্বীকরণ। তাঁরা জানতেন, প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যকে না বুঝে হুবহু অনুকরণ করলে উন্নত প্রাচ্য হবে না, বিকৃত পাশ্চাত্ত্য হবে মাত্র। পাশ্চাত্ত্যের যেটুকু নেওয়া উচিত তা নিজের উপযোগী ভাবে রূপায়িত করে গ্রহণ করলেই তবে তা অন্তরের জিনিস হয়ে উঠবে, অন্যথায় অন্ধ নির্বোধ অনুকরণ বাইরের বাহুল্যের ভারকে বাড়িয়ে অন্তরকে চাপা দেবে, স্বরূপকে দূষিত করবে; এর ফলে পরের যা তা নিজের হবে না, নিজের যা তা বিকৃত হবে।

উভয় চিন্তানায়ক চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সামঞ্জস্য; এ সামঞ্জস্যের অর্থ হল স্থিতি ও গতির সমন্বয়, আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার সম্মিলন, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী সত্তার ঐক্য, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিক শক্তির সমবায় এবং সমীকরণ।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, কেউই সমাজকে পরিবর্তনহীন যান্ত্রিক পদ্ধতি-সমূহের সমষ্টি বলে মনে করেন নি। সমাজ গতিশীল, তার গতিপথে সে কখনো সংকুচিত, কখনো বা প্রসারিত হয়ে চলে। মানুষ আপন প্রয়োজনে নিজেকে সমাজের বন্ধনে বাঁধে। এ বন্ধন কিন্তু বদ্ধ হয়ে থাকবার জন্যে নয়, অগ্রসর হবার জন্যে।

সামাজিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা

এ যেন নদীর তটের বাঁধন, যা তাকে বন্দী করে রাখে না, সুনির্দিষ্ট গতিপথে মুক্তি দান করে। পর্বতারোহীরা নিজেদের দড়ি দিয়ে বাঁধে অগ্রসর হবার তাগিদেই। তারা চলতে চলতে নিজেদের বাঁধে, বাঁধতে বাঁধতে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়। ঘোড়াকে লাগাম পরাতে হয় নির্দিষ্ট পথে তাকে চালিত করবার জন্যেই। আদর্শ সমাজের বাঁধন হচ্ছে এই জাতের বাঁধন, যা জীবনকে গতিপথে মুক্তি দেয়।

সমাজবন্ধনের দুই রূপ

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন হতে বাধ্য। তখন এক বাঁধনকে আলগা করে আর এক বাঁধনকে শক্ত করতে হয়। প্রতিমুহূর্তে এমনি করে সমাজ পুরোনো শিকল খুলে ফেলে নূতন শিকলে বাঁধা পড়লে তবেই তার গতি অব্যাহত থাকে। সমাজ সত্যের সঙ্গে সর্বদাই নিজেকে খাপখাওয়াবার সাধনা করছে। তার জন্যেই তার শিকলের পরিবর্তন ঘটছে; কারণ শিকলগুলো তো আর লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্যমাত্র। সেইগুলোকে নিত্য মনে করে শক্ত করে চিরকাল অনড় রাখলেই বিপদ, তখনই সমাজে আসে বিকৃতি, জাতীয় জীবন হয়ে ওঠে বদ্ধ, বিষাক্ত।

সমাজের বন্ধনকে মুখ্য বা চিরন্তন মনে করে আঁকড়ে ধরে থাকলে সমূহ সামাজিক বিকৃতি যে অবশ্যম্ভাবী—এ সতর্কবাণী বিবেকানন্দ বারবার উচ্চারণ করেছেন। অবশ্য তার সঙ্গে, জীবনের বৃহত্তর প্রাপ্তির জন্যে সাময়িক যুগোপযোগী বন্ধন বরণের আবশ্যকতার দিক্‌টিও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন :

যুগের সঙ্গে সমাজ-বন্ধনের রূপপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী

"All the current social forms and methods are derived from society as it exists, but what right has the utilitarian to assume that society is eternal ? Society did not exist ages ago; possibly will not exist ages hence. Most probably it is one of the passing stages through which we are going towards a higher evolution and any law that is derived from society alone can not be eternal, can not cover the whole ground of human nature. At best, therefore, utilitarian theories can only work under present social conditions. Beyond that they have no value."

—'The necessity of religion', Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৬৪।

"Truth does not pay homage to any society, ancient or modern. Society has to pay homage to truth, or die. Societies should be moulded upon truth, and truth has not to adjust itself to society."

—'The necessity of religion', Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৮৪।

"When the needs of the time press hard on it, society adopts certain customs for self-preservation.......As a man often resorts even to such means as are good for immediate seif-protection but which are very injurious in the future, similarly, society also not unfrequently saves itself for the time being, but these immediate means which contributed to its preservation turn out to be terrible in the long run."

—৬৭নং পত্র, Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ—১০৮।

শ্রেষ্ঠ সমাজের লক্ষণ কি? বিবেকানন্দ বললেন:

"That society is the greatest, where the highest truths become practical."

—'The necessity of religion', Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৮৫।

সমাজ-বন্ধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করে বলেছেন:

"সমাজকে বাঁধিয়া সাঁধিয়া নিজেকে তাহার মধ্যে রুদ্ধ করিলে মানুষের স্বাধীন প্রকৃতি পীড়িত হয়। মানুষকে খাটো করিয়া সমাজকে বড়ো করিবার কোনো অর্থ নাই। মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যই সমাজ।"

"ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত সরল করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ হইবার জন্য নহে। নিজেকে শতধা বিভক্ত অন্ধচেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক বাহ্য বিষয়ে সংকীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল।"

—'ব্রাহ্মণ'। স্বদেশ।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সমাজকে সকল খণ্ডকালীন অনাবশ্যক রীতি-নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য, মুক্তিই ছিল তাঁদের তপস্যা। ভারতের সাধনার সার-সত্য সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে, স্বদেশের সকল শ্রেয়ঃ চিন্তা সর্বদা মানুষকে বন্ধন-মুক্তির পথেই আহ্বান করেছে।

সমাজমুক্তি

বিবেকানন্দ মুক্তিকে মনুষ্যত্বের চরম সাধনা বলে চিহ্নিত করেছেন। এই মুক্তির পথে যে ধর্ম বাধা হিসেবে দেখা দেবে, যে সমাজ প্রতিরোধের প্রাচীর তুলে দাঁড়াতে চাইবে তাদিকে অবশ্যই সরে যেতে হবে। তিনি বললেন:

"Freedom in all matters, i. e., advance towards 'Mukti' is the worthiest gain of man. To advance oneself towards freedom, physical, mental and spiritual and help others to do so, is the supreme prize of man. Those social rules which stand in the way of the unfoldment of this freedom are injurious, and steps should be taken to destroy them

speedily. Those institutions should be encouraged by which men advance in the path of freedom."

—৬৭নং পত্র, Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—১১০।

মুক্তিকে মানুষের 'জীবনের একমাত্র লক্ষ্য' আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাবে কোথায়? মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

—মানুষের ধর্ম।

"আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তি-মন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে।……এই বেড়া ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্‌ঘাটিত করা।"

—'ভারত পথিক রামমোহন রায়'। চারিত্রপূজা।

সমাজের মুক্তিসাধনার পথে দুস্তরতম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিভেদবোধ। এই দ্বন্দ্বের কারণ অন্বেষণ করলে দেখা যাবে, সর্বপ্রকার অনৈক্যের মূলে আছে বিচিত্র মানসিক মোহ, অন্তরের পরাধীনতা, যার অনিবার্য ফল হিসেবে দেখা দেয় দুরন্ত আত্মবিচ্ছেদ। চিত্তের এই বন্দীত্বের আপনোদন ছাড়া বাইরের বন্ধন-মুক্তি ঘটতে পারে না। সামাজিক স্বাধীনতার সাধনায় সাফল্যের জন্যে সমাজসচেতন জনগণের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক চেষ্টা বা মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের খণ্ডকালীন প্রয়াসে ক্ষণস্থায়ী সমাজপ্রগতির একটি চিত্র হয়তো তুলে ধরা যেতে পারে, কিন্তু এ ধরণের প্রচেষ্টায় সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ চিরন্তন মুক্তি আসতে পারে না; তার জন্যে সমাজের ভিতরকার শক্তিকে জাগাতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমষ্টির আত্মশক্তির জাগরণ ছাড়া সমষ্টি-মুক্তি আসতে পারে না।

মানসিক মোহ ও আত্মবিচ্ছেদ

কিন্তু সমষ্টির আত্মশক্তির উদ্বোধনের উপায় কি? বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বললেন:

"The first duty is to educate the people."

সামাজিক বিভেদ তথা সকল প্রকার বিভেদের মূলে আছে বুদ্ধির মোহ এবং সেই মোহভঙ্গের উপায় হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এ কথা বিবেকানন্দ বিশেষ জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন:

জনশিক্ষা বিস্তার

"Where are those who want reform ?......The tyranny of a minority is the worst tyranny that the world ever sees. A few men who think that certain things are evil will not make a nation move. Why does not the nation move ? *First educate the nation, create your legislative body, and then the law will be forth-coming.* First create power, the sanction from which the law will spring.......

"Therefore *even for social reform, the first duty is to educate the people, and you will have to wait till the time comes.*"

—'My plan of campaign', Complete Works.
তৃতীয় খণ্ড, পৃ—২১৬।

"We have, therefore, to wait till the people are educated, till they understand their needs and are ready and able to solve their problems. The tyranny of the minority is the worst tyranny in the world. Therefore, *instead of fittering away our energies on ideal reforms,* which will never become practical, *we had better to go to the root of the evil and make a legislative body,* that is to say, *educate our people, so that they may be able to solve their own problems.* Until that is done, all these ideal reforms will remain ideals only,"

—'The abroad and the problems at home',
Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—১৪৫।

রবীন্দ্রনাথও মুক্ত বুদ্ধির অভাবকেই সমাজের দুর্গতির মুখ্য কারণ বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন :

"মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে।"

—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর।

"মানুষ যে-কোনো সত্য সম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না।······স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।"

—'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'। কালান্তর।

"আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে।"

—'সমস্যা'। কালান্তর।

কিন্তু এই মানসিক মোহমুক্তির উপায় কি? বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথও এককথায় তার উত্তর দিলেন,

"লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা"।

—'লোকহিত'। কালান্তর।

গণজাগরণের উপায় শিক্ষাবিস্তার। শিক্ষার ফল হচ্ছে 'চেতনার অধিকারের বিস্তৃতি'। এই বিস্তৃতিই সমাজের বিভেদকে বিনষ্ট করে, বোধশক্তি ও কর্মশক্তির বিচ্ছেদকে দূর করে উভয়ের সংযোগসেতুটিকে অব্যাহত রাখে, যার ফলে সামাজিক চিত্তশক্তি নিত্য নূতন সৃষ্টিশীলতায় আত্মপ্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন:

"অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।—শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ,—অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারিনে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; **অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটাই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"**

—'সমাধান'। কালান্তর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীজাগরণ

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে সমাজের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিভিন্ন প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীদের আত্মশক্তির উদ্বোধন ব্যতীত সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কখনোই সম্ভবপর নয়, কারণ সমাজদেহের অন্যতম প্রধান অংশকে অসাড় ও স্থবির রেখে সমগ্র সমাজের সুস্থতা আশা করা মূঢ়তা। নারীরা সমাজের কেন্দ্রানুগ শক্তির প্রতিভূ। কর্ম-সর্বস্ব পুরুষের কেন্দ্রাতিগ বিক্ষিপ্ততাকে তারাই বেঁধে রাখে স্নেহে, মমতায়, প্রীতিতে। তাদের হাতে গড়ে ওঠে আগামী কালের সমাজ ও জাতির ধারক ও বাহক। মাতৃ-শক্তির স্নেহের ছায়াতেই লালিত হয়ে ওঠে জাতির শৈশব।

নারী,—সমাজের কেন্দ্রানুগ শক্তি।

"The hand that rocks the cradle rules the world".

জাতির যৌবনের উজ্জীবনে ও উদ্দীপনে সর্বাধিক সফল অংশ-গ্রহণ নারীদের পক্ষেই সম্ভব ; তাই এ বিষয়ে তাদের নৈতিক দায়িত্বও অপরিসীম।

বিবেকানন্দ স্বাধীন চিত্ত-শক্তির উপর নারীদের প্রতিষ্ঠিতা দেখতে চেয়েছিলেন। নারীদের সমস্যার সমাধানের ভার তিনি অন্য কারও উপর ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না ; কারণ পরমুখাপেক্ষিতার মধ্য দিয়ে কোনো সমস্যার স্থায়ী বা প্রকৃত সমাধান যে ঘটতে পারে না এ বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে একমাত্র নারীদের অন্তপ্রর্কৃতির মুক্তির মধ্য দিয়ে তাদের সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে।

মানসমুক্তি

তিনি বলেছেন :

"Women must be put in a position to solve their own problems in their own way. No one ought to do this for them. And our Indian women are as capable of doing it as any in the world."

—Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—১৫৯।

এই 'আপন পথে নিজ সমস্যা' সমাধানের জন্যে নারীজাতির চিত্তের বিকাশকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাবে সেই বিকাশের পথ নির্দেশ করে ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে বললেন:

"Of course, they have many and grave problems, but none that are not to be solved by that *magic word 'education'*."

—Complete Works, ৫ম খণ্ড, ১৬১।

নারীর চিত্তমুক্তি সর্বাঙ্গীণ সমাজবুদ্ধির মুক্তির অনিবার্য অঙ্গ

প্রকৃত প্রস্তাবে, এখানে বিবেকানন্দ স্বতন্ত্রভাবে নূতন কথা কিছু বলেন নি। সমাজ ও স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনায় বুদ্ধির জাগরণ তথা জ্ঞানচর্চার যে পথ তিনি পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করেছেন, সেই পথপরিক্রমার ক্ষেত্রেই তিনি পুরুষের পাশে নারীর সহজাত সম্মানিত স্থানটি চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

আমেরিকার নারী-সমাজে স্বাধীনতাবোধ

আমেরিকার নারীসমাজের স্বাধীনতাবোধকে বিবেকানন্দ গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ ভারতীয় নারীসমাজেও দেখা দিক্ এই কামনা করেছিলেন। তিনি নিউইয়র্ক থেকে একখানি পত্রে আমেরিকার নারীদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন:

"They are like Laksmi (the goddes of Fortune) in beauty and like Saraswati (the goddess of Learning) in virtues—they are the Divine Mother incarnate, and worshipping them, one verily attains perfection in everything. Great God! Are we to be counted among men? If I can raise a thousand such Madonnas, Incarnation of the Divine Mother, in our country, before I die, I shall die in peace. Then only your countrymen become worthy of their name."

—পত্র নং ৪৮। Complete Works, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ—২৩৮।

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতোই নারীর আত্মশক্তির জাগরণকে তাঁর নানা রচনায় অভিনন্দন জানিয়েছেন:

"জ্ঞান ছাড়া, আত্মোপলব্ধি ছাড়া স্বাধীনতা হতেই পারে না। আমাদের পূর্বযুগে মেয়েরা ছিল পুরুষদের অন্তরায়। সংসারের সংকীর্ণ প্রয়োজনের

কাছে তারা কল-টেপা পুতুলের মতো বিহিত নিয়মে আওয়াজ করেছে, হাত পা নেড়েছে। অজ্ঞতা ও অশক্তিই যে তাদের ভূষণ এই কথাই তারা জানে।……তাদের মনুষ্যত্বের যে স্বাতন্ত্র্যটি মোড়ক ছাড়িয়েও প্রকাশ পায় তা কখনো বা অস্বীকৃত কখনো বা নিন্দিত। এমনিভাবে মেয়েরা মানুষের একটা প্রকাণ্ড লোকসান ঘটিয়ে এসেছে। আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি করছে।……মানবসমাজে এই আত্মশ্রদ্ধার বিস্তারের মতো এত বড়ো সম্পদ আর কিছুই হতে পারে না। গণনায় মানুষের পরিমাণ পাওয়া যায় না, পূর্ণতাতেই তার পরিমাণ। আমাদের দেশেও কৃত্রিম বন্ধন-মুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা।"

—'নারীর মনুষ্যত্ব'। সমাজ।

"আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।……আমার মনে হয়, পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে। অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজ শাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়েছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটক পড়েছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে।……ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে।……একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে।"

—'নারী'। কালান্তর।

"সভ্যতাসৃষ্টির নূতনকল্প আশা করা যাক্। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই।……তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচারে অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকল-প্রকার কাল্পনিকও

বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে।"

—'নারী'। কালান্তর।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উভয় চিন্তানায়ক নারী-প্রগতিকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করেই ক্ষান্ত হন নি, স্বদেশের নারী-জাগরণকে বিশ্বজনীন জাগৃতির পটভূমিকায় রেখে তার মূল্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন জাগরণের অঙ্গ হিসেবে বিষয়টিকে যতোখানি বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বিবেকানন্দের পক্ষে ততোটা ব্যাপক পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। এর কারণ, বিবেকানন্দের অকাল-তিরোধান। বিশ্বের নারীসমাজকে রবীন্দ্রনাথ যে-পরিমাণ অগ্রসর হতে দেখেছিলেন বিবেকানন্দের পক্ষে ততোখানি দেখে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই কালগত ও প্রতিবেশগত ব্যবধান দৃষ্টিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

বিশ্বজনীন নারীজাগরণের পটভূমিকায় স্বদেশের নারীজাগৃতির মূল্যনিরূপণ।

প্রসঙ্গক্রমে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বহু-বিতর্কিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বাল্যবিবাহ

বিবেকানন্দ বাল্যবিবাহকে শুধু যে সমর্থন জানাননি তাই নয়, এ প্রথাকে তিনি জাতীয় দুর্বলতার অন্যতম কারণ বলে মনে করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এসব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে, ছোঁড়া বলে, ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী। অবশ্য এরা ভালো খায়; ভালো পরে, দেশ ভালো এবং **সর্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে, অল্প বয়সে বে করে না।** আমাদের দেশেও যে দু একটা বলবান জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ কত বয়সে বে করে। গোরখা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর।......আয়ু, বল, বীর্য, এদের আর আমাদের ; অনেক ভেদ ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা—তিন পেরুলেই ফরসা ; এরা তখন সবে গা ঝেড়ে উঠছে।"

—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"Our modern reformers are very busy about widow-marriage. Of course, *I am a sympathiser in every reform, but the fate of a nation does not depend upon the number of husbands their widows get, but upon the condition of masses.*"

—৭নং পত্র, Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—২৫-২৬।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, বিবেকানন্দ বিধবাবিবাহের বিষয়টিকে জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করতে চাননি। স্বতন্ত্রভাবে নারীসমাজের বিক্ষিপ্ত পরিকীর্ণ সমস্যাগুলির বিশেষ কোনোটির সম্মুখীন হলে তার যথোচিত স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ সমস্যার মূলে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। দেশের নারীদের অবস্থা দেখে তিনি পরিতুষ্ট কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন :

"By no means, but our right to interference is limited entirely to giving education. Women must be put in a position to solve their own problems in their own way. No one can or ought to do this for them. And our Indian women are as capable of doing it as any in the world."

—'On Indian Women, their past, present and future',
Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—১৫৯।

নারীসমাজের সমস্যা-নিরাকরণের ক্ষেত্রে পুরুষের অহেতুক প্রাধান্য ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের তীব্র মনোভাব পূর্বোদ্ধৃত উক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নারীদের যে-কোনো রকম সমস্যার সমাধান নারীরা নিজেরাই করুক, এই প্রত্যাশাই বিবেকানন্দ পোষণ করতেন। কোনো প্রকারেই নারীর স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করা হোক্ তা তিনি চাইতেন না। পুরুষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নারীদের স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষে সহায়তা তো করবেই না; পক্ষান্তরে তাদিকে অধিকতর পরনির্ভরশীলা ও দুর্বলা করে তুলবে।

উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে নারীজাতির মুক্ত বিচারবোধকে সজাগ ও সক্রিয় করে তুলতে হবে; তখন তারা নিজেদের সকল সমস্যার সমাধান নিজেরাই করে নেবে,—এই ছিল বিবেকানন্দের মত। বিধবারা পুনরায় বিবাহ করবে

কি না, এর বিচারের এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ভার তিনি বিধবাদের উপরেই ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। —আত্মশক্তির উপর সকল ক্ষেত্রে সুমহৎ শ্রদ্ধা-পোষণের যে মনোভাবটি বিবেকানন্দের চিন্তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে সেইটিই এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এখন বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিচার করবার চেষ্টা করা যাক্। প্রাচীন সমাজশাসনের সহনীয় ও বরণীয় দিক্‌গুলি উপযুক্ত সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করতে রবীন্দ্রনাথ একসময় প্রয়াসী হয়েছিলেন তা আমরা জানি; এবং এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের নিষেধ ও বাল্যবিবাহের প্রচলনের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। 'সমাজভেদ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

"বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্যদিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে, সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না।······পরিবারের অখণ্ডতা ও দৃঢ়তা রক্ষা করিতে, হিন্দুকে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই সকল নিয়ম পালন করিতে হয়

"এইরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরিবার ও সমাজগঠন ভালো কি না, সে তর্ক ইংরাজ তুলিতে পারে। আমরা বলি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ রাখিয়া পোলিটিকাল দৃঢ়তা-সাধন ভালো কি না, সেও তর্কের বিষয়।"

—'সমাজভেদ'। স্বদেশ।

হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ-অসমর্থন ও বাল্যবিবাহ-সমর্থনের মূলগত কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

হিন্দুসমাজের বিধবাবিবাহ-অসমর্থন ও বাল্যবিবাহ-সমর্থনের মূলে আছে তার পারিবারিক সংহতি-রক্ষার প্রচেষ্টা। বিধবাকে হিন্দুসমাজ আপন পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করে; তাই তাকে ত্যাগ করে নিজেকে বিক্ষত বা অঙ্গহীন করতে চায় না। অন্যদিকে নূতন পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও নিবিড় বন্ধন স্থাপন করবার বয়স বাল্যকাল। তাই বধূ অল্প বয়সে স্বামীগৃহে এলে নবীন পারিপার্শ্বিকতাকে সহজে আপনার করে নিতে পারে। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়,— এই হল মোটামুটিভাবে বাল্যবিবাহের সপক্ষে ও বিধবাবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি। কবি এই যুক্তিগুলিই প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

অপরদিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজের স্বাধীন প্রেম ও অধিক

বয়সে কুমারীদের বিবাহ এবং বিধবার পুনর্বিবাহের তাৎপর্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্য সমাজে বিবাহের পর দম্পতিকে স্বাধীনভাবে ঘর বাঁধতে হয়; অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে নিয়ে স্বাধীনভাবে ঘর বাঁধা সম্ভব নয়। সে সমাজে বিধবা কোনো পরিবারের আশ্রয় পায় না বলেই তার পক্ষে অনেক সময় দ্বিতীয়বার বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, "পাশ্চাত্ত্য সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ ও কুমারীর অধিক বয়সে বিবাহের যে নিয়ম তা ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র রক্ষার অনুকূল বলিয়াই মুখ্যত ভালো, ইহার অন্য ভালো যাহা কিছু আছে, তাহা আকস্মিক, তাহা অবান্তর।"

পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বাধীন প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

—'সমাজভেদ'। স্বদেশ।

আমরা দেখেছি যে, হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ও বিধবাবিবাহের অপ্রচলন সেই সমাজের সংহতিরক্ষার জন্যে একসময় প্রয়োজনীয় ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে এগুলির উপযোগিতা কতখানি এ প্রশ্নও কবি আগেই তুলেছিলেন তাঁর 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে (সমাজ), এবং এই 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধ (১৮৮৫) 'সমাজভেদ' প্রবন্ধের (১৯০১) বহুপূর্বেই রচিত। বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থনসূচক মনোভাবের প্রকাশক হিসেবে তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এর 'ত্যাগ' শীর্ষক গল্পটির (বৈশাখ, ১২৯৯) উল্লেখ করা যেতে পারে। বিধবাবিবাহের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে লেখনী চালনা করেছিলেন তাঁর পরবর্তী জীবনে। তার প্রকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে তাঁর 'পলাতকা' কাব্যের 'নিষ্কৃতি' কবিতাটির মধ্যে। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলনকে কবি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে নিজে অগ্রণী হয়েছিলেন;—তার শ্রেষ্ঠ বাস্তব প্রমাণ পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমাদেবীর বিবাহসংঘটন। বাল্যবিবাহের অপসৃতিকে কবি তাঁর 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধের মধ্যেই অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন:

বাল্যবিবাহ ও বহু-বিবাহ সম্পর্কে পরিণত রবীন্দ্র-চিন্তা

"বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে আজ তাহার ফল যতোটা ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা হইতে যতো বিপদ অমঙ্গল আশঙ্কা—তাহার অনেকটা আমাদের কাল্পনিক। কেবল কতকটা দেখিতেছি এবং অনেকটা দেখিতেছি না বলিয়াই এতো ভয়!"

—'হিন্দুবিবাহ'। সমাজ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিপীড়িত জনগণের মুক্তির বার্তা

সমাজের আর্থনীতিক তথা সকল রকম অসাম্যের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্নি-বাণী শাণিত কৃপাণের মতো বার বার ঝলসে উঠেছে। শোষিত সর্বহারাদের প্রতি অসীম সমবেদনা ও গভীর ভালোবাসা উভয় যুগ-পুরুষের চিন্তা ও কর্মকে সর্বদা প্রণোদিত এবং তাঁদের চরিত্রকে বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

গণমুক্তির বার্তা—শোষণ-জীবিতার বিরুদ্ধে ধিক্কার

সমাজে যারা ক্লিষ্ট, পিষ্ট, পীড়িত তাদের মুখে দিতে হবে অন্ন, কণ্ঠে দিতে হবে ভাষা, বুকে সঞ্চারিত করতে হবে বল,—এই গণ-মুক্তির বার্তা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সতেজ বাণীতে শোষণ-জীবীদের চক্রান্ত ও হীন মনোবৃত্তি তীব্রভাবে ধিক্কৃত হয়েছে। বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে বলেছিলেন :

"For the luxury of a handful of the rich, let millions of men and women remain submerged in the hell of want and abysmal depth of ignorance, for if they get wealth and education, society will be upset ! Who constitute society ? The millions, or you, I, and a few others of the upper classes ?

"Again, even if the latter be true, what ground is there for our vanity that we lead others ? Are we omniscient ?

—৬৭নং পত্র। Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—১১০।

"So long as the million live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them ! I call those men who strut about in their finery, having got all their money by grinding the poor, wretches, so long as they

do not do anything for those two hundred millions who are now no better than hungry savages."

—১৯নং পত্র, Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—৪৫।

প্রকৃত স্বাদেশিকতা কি? বিবেকানন্দ বললেন:

"They talk of patriotism. I believe in patriotism, and I also have my own ideal of patriotism.......Do you feel? Do you feel that millions and millions of the descendants of gods and of sages have become next-door neighbours to brutes? Do you feel that millions are starving to-day, and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it made you almost mad?......That is the first step to become a patriot, the very first step."

—'My plan of campaign', Complete Works,
তৃতীয় খণ্ড, পৃ—২২৫-২৬।

যুগ যুগ ধরে সর্বহারাদের উপর সর্বহরার দল যে অত্যাচার করে এসেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিরীহ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদীরা যে পাষাণভার চাপিয়ে এসেছে তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে উভয় মানবপ্রেমিকের কণ্ঠে।

যে সমাজে সমষ্টির দৈন্যের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় লোক স্ফীত হয়ে ওঠে, সেই সমাজ-ব্যবস্থা বহুর দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত, সে সমাজের মঙ্গল নেই। বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথও সেই শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে:

".........এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

....

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"

—'এবার ফিরাও মোরে'। চিত্রা।

আকর্ষণজীবীদের প্রতি সতর্কবাণী,—'রক্তকরবী'

'আকর্ষণজীবী'দের প্রতি কবি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর নানা রচনায়। এ প্রসঙ্গে 'রক্ত-করবী' নাটকের কথা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে আসে। মানুষকে ঘৃণা করে যারা দূরে সরিয়ে রাখে, তাদিকে ডেকে 'গীতাঞ্জলি'-তে কবি বলেছিলেন:

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

—১০৮নং কবিতা। গীতাঞ্জলি।

জাগ্রত জনতা

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার যে ধারা সমগ্র বর্তমান অধ্যায়টিতে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে, তাকে ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, উভয়েই উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন প্রধানতঃ জনগণের অন্তরের চেতনা, কামনা করেছেন একটি জাগ্রত জনতা। মুষ্টিমেয় লোকের সুপ্তিভঙ্গ হলে ঈপ্সিত ফল লাভ হবে না; তাতে গোষ্ঠীবিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে মাত্র। আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বাধিকারবোধকে জাগ্রত করতে হবে। জাতি তখন নিজের পথ নিজে আবিষ্কার করবে, উজ্জ্বল ভাগ্য নিজেই গঠন করে নেবে। সমাজই হচ্ছে প্রাচ্যের শক্তিকেন্দ্র। পাশ্চাত্ত্য যেমন রাষ্ট্র-প্রধান, প্রাচ্য তেমনি

সমাজ-প্রধান। তাই প্রাচ্যের উন্নতি নির্ভর করছে তার সমাজের উৎকর্ষের উপর।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

"আমাদের সভ্যতার মূলে সমাজ, ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, ইউরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।"

—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা'। স্বদেশ।

———

চতুর্থ অধ্যায়

স্বদেশচিন্তা
ও
বিশ্বমৈত্রীভাবনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আত্মশক্তির জাগরণ

প্রত্যেক মনীষীর চিন্তার একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে থাকে তাঁর স্বদেশ ; 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—সুরলোকের চেয়েও শ্লাঘ্য সেই মাটির মায়ের আহ্বানে সুসন্তানেরা কোনো সময়ে স্থির থাকতে পারেন নি। স্বদেশের উন্নয়ন ও সর্বাঙ্গীণ হিতকামনা সর্বদা তাঁদের চিন্তার পুরোভাগকে আশ্রয় করেছে।

প্রবল চিত্তশক্তির অধিকারী পুরুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্মী মানসিকতা স্বদেশকে শুধু বাইরে থেকে গ্রহণ করে ক্ষান্ত থাকে না, অন্তরঙ্গে তার সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতার আদর্শ ছবিটিকে উজ্জ্বল করে অঙ্কিত করে নেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মহত্তম স্বপ্নদশার স্বদেশ সর্বাগ্রে তাঁর অন্তরের সৃষ্টি। সেই অন্তরের সম্পদকে বহির্জীবনে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের একটি বৃহৎ অংশ এই ব্রতউদ্‌যাপনে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

স্বদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠা অন্তরে

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনার মূল সূত্রটি হল আত্মশক্তির জাগরণ। স্বদেশ-সাধনাকে তাঁরা প্রকৃত পক্ষে আত্মার উদ্বোধনের সাধনার অঙ্গ হিসেবেই প্রত্যক্ষ করেছেন। অধিকাংশ লোক যখন শুধু দেশের বাইরের কাঠামোটার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে বহির্বিকৃতিকেই যথাসর্বস্ব মনে করেছে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তখন স্বদেশের বাহ্য বিকৃতির মূলে নিহিত দেশবাসীর অন্তরের বিভ্রান্তি ও মোহ-গ্রস্ততা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

আত্মশক্তির উদ্বোধন

অবশ্য উনিশ শতকে বাঙ্‌লার নবজাগরণে চিত্তশক্তি-আবাহনের প্রথম পথিকৃৎ যে রাজা রামমোহন রায় তা আমরা জানি। শতাব্দীর প্রায় শুরুতে যে সাধনা-ধারার তিনি সূচনা করেছিলেন তাই সেই শতকের শেষে এসে বিবেকানন্দ ও আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক বিশেষ বিকাশ ও পরিণতি লাভ করেছিল এবং বিশ শতকের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ও কর্মপ্রয়াসে তা ব্যাপকতর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের উত্তরসূরী

জাতীয় জীবনের সকল রকম দুর্দশার মৌল সমস্যাটি হল বিভেদবোধ, —ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারূপ নিয়ে এই বোধ মানুষের মনকে অধিকার করে বসে। ভেদবুদ্ধির অনিবার্য পরিণতি আত্ম-বিচ্ছেদই জাতির জীবনকে টেনে নিয়ে যায় চরম বিপর্যয়ের মধ্যে। বাহ্য বিভেদটা কিন্তু প্রকৃত সমস্যা নয়; কারণ 'এহ বাহ্য'। বাইরের সংঘাতের মূলে থাকে অন্তরের অনৈক্য, বিভেদকে তাই বাইরে কোনো প্রলেপ দিয়ে বেশিদিন চাপা রাখা যায় না। একমাত্র আন্তরিক ঐক্য স্থাপন করেই সকল অসঙ্গতিকে দূর করা যেতে পারে; আর এই অন্তরের ঐক্য শুধু স্বাধীন চিন্তাশক্তির ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মননশীল মানসিকতাকে আশ্রয় করে যে সংহতি গড়ে ওঠে সেই সংহতিই সকল বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত ও আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে টিকে থাকতে পারে ও জাতীয় জীবনে একটি সংগঠনশীল ভূমিকা রচনা করতে পারে। অন্ধ বিশ্বাস ও আচারে আচ্ছন্ন মনে বিভেদের বনিয়াদ নানা আকার ও রূপে পাকা হয়ে বসে আছে। বিভেদকামী শোষণজীবীরা সেই সুযোগকেই পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। দেশের সবচেয়ে বড়ো অভাব চিত্তশক্তির অভাব; দেশের সর্বাগ্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মোহমুক্ত মন।—এই সত্যটি উপলব্ধি করে বিবেকানন্দ বলেছিলেন:

বিভেদবোধ

অন্তরের ঐক্যের ভিত্তি স্বাধীন চিন্তাশক্তি

"Liberty of thought and action is the only condition of life, of growth and well being. Where it does not exist, the man, the race, the nation must go down.

"Caste or no caste, creed or no creed, any man, or class or caste, or nation, or institution which bars the power of free thought and action of an individual—even so long as that power does not injure others is devilish and must go down.

"My whole ambition in life is to set in motion a machinery which will bring noble ideas to the door of every body, and then let men and women settle their own fate."

—৭নং পত্র, Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—২৫।

উপরের উদ্ধৃতিতে স্বাধীন বিচারবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি-চিন্তার জাগরণ-কামনা উদ্গীত হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে আপন ভাগ্যসংগঠনের অধিকার-অর্জ্জন-কারী একটি সংহত গণশক্তির সাধনার মূল সূত্রটি ব্যক্ত করা হয়েছে। স্বদেশ-সাধনায় তথা মানবজীবনের যে-কোনো সমস্যা-সমাধানে অন্তরঙ্গ-তপস্যার প্রয়োজনীয়তার উপর রবীন্দ্রনাথ অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন :

"যখন কোনো একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয় তখন মানুষের মনকে কী করে এক পথ থেকে আর এক পথে চালানো যায়, সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয়; কোনো একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয়, তা বিশ্বাস করিনে—মানুষের মনের সঙ্গে রফা-নিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ।"

—'স্বরাজসাধন'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং, ১৩৫৫।

সকল ক্ষেত্রে এই মনের সঙ্গে রফানিষ্পত্তির উপর বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; কারণ সকল সমস্যার মূল মনে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

"আমাদের দেশের এই সকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এতো দুরূহ। বাধা আমাদের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

—'স্বরাজ সাধন'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫।

'নৈবেদ্য'-এর মধ্যে কবি বলেছিলেন :

"বৃথা চেষ্টা ভাই,
তব সজ্জা লজ্জাভরা চিত্ত যেথা নাই।"

—কবিতা নং ৯৬। নৈবেদ্য।

বিচারহীন আচারের মূলে ভিত্তিহীন ভীতি।

বিচারবোধহীন আচার দেশের চিত্তকে তামসিকতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কোনো কিছু চিন্তা না করে অন্ধভাবে মননহীন সংস্কারকে মেনে চলার মূলে আছে একটা ভিত্তিহীন ভীতি। এই অকারণ আশঙ্কাই শ্রেয়ঃ বোধকে বিপর্যস্ত করে। জাতির চিত্ত থেকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই ভয়কে দূর করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন :

"The weak have no place here, in this life or in any other life. Weakness leads to slavery. Weakness leads to all kinds of misery, physical and mental. Weakness is death."

—'Work and its secret',
Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩।

"Strength is the medicine which the poor must have when tyrannised over by the rich. Strength is the medicine that the ignorant must have when oppressed by the learned; and it is the medicine that sinners must have when tyrannised over by other sinners."

—'The freedom of the soul', Complete Works,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—২০১

"It is when the national body is weak that all sorts of desease germs, in the political state of the race or in its social state, in its educational or intellectual state, crowd into the system and produce desease. To remedy it, therefore we must go to the root of this desease and cleanse the blood of all impurities."

—'The future of India', Complete Works,
তৃতীয় খণ্ড, পৃ—২৮৮।

'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের মধ্যে বীর সন্ন্যাসীর বাণী মন্দ্রিত হয়েছিল :

"হে ভারত,······এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাজনক কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে ?"

—বর্তমান ভারত।

প্রবন্ধের সমাপ্তিতে তাপসকণ্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হয় :

"বল,······মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

জাতীয় চিত্তের দুর্বলতাকে দূর করবার কথা রবীন্দ্রনাথের বাণীতে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে :

"নানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানিনা বলিয়াই হাজার রকম

ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবল বলে, কী জানি, কাজ কী। ভয় জিনিসটাই এই রকম।"

—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং, ১৩৫৫, পৃ—৫৩-৫৪।

"অবাস্তবকে বাস্তব বলে মানলে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কেবল বুক দুর্ দুর্ করে, গা ছম্ ছম্ করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি।"

—'সমস্যা'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং, পৃ—২৩২।

এই দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করে কবি জাতিকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, পৌরুষের দৃপ্ততায় উদ্বোধিত হবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন ঃ

"যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত; আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন।"

—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং, ১৩৫৫, পৃ—১৬।

'নৈবেদ্য'-এর মধ্যে কবি 'প্রার্থনা' জানিয়েছিলেন ঃ

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা ·······"

—সেই স্বর্গে ভারতকে নির্দয় আঘাতে জাগরিত করবার জন্যে। চিত্ত যেখানে ভয়শূন্য, শির যেখানে উচ্চ, জ্ঞান যেখানে মুক্ত, দেশ সেখানে উত্তীর্ণ হোক্ এই প্রার্থনাই তিনি বারবার উচ্চারণ করেছিলেন।

জাতিকে কাপুরুষতা, নির্বীর্যতা ত্যাগ করে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করতে হবে, আপন শক্তির উপর নির্ভর করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে, এই হল বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ।

যাঁরা আত্মনির্ভরশীলতার উপর এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁরা যে পরমুখাপেক্ষিতার উপর খড়্গহস্ত হবেন এটা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরমুখাপেক্ষিতার বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ'

যে-সকল ব্যক্তি বিদেশি শাসকবর্গের কাছে আবেদন-নিবেদন মারফৎ দেশের মুক্তি আনা যাবে বলে মনে করেছিলেন তাঁদের মনোভাবকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ধিক্কৃত করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এ ধরণের ভিক্ষাবৃত্তির

দ্বারা কেউ কখনো প্রকৃত সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে না। ভিক্ষার দ্বারা সাময়িক অভাব দূর হতে পারে, কিন্তু যে প্রাপ্তি স্থায়ীভাবে দীনতাকে দূর করে তার জন্যে আন্তরিক সাধনার প্রয়োজন, যাচ্ঞার দ্বারা তা লাভ করা যায় না। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন :

"Never are the wants of a beggar fulfilled. Suppose the Government gives you all your need, where are the men who are able to keep the things demanded? So make man first."

—Conversations and Dialogues,
Complete Works, ৫ম খণ্ড, পৃ—২৪৮।

ভিক্ষুকসুলভ মনোবৃত্তি বিবেকানন্দের কঠোর নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে :

"The beggar is never happy. The beggar only gets a dole, with pity and scorn behind it, at least with the thought behind that the beggar is a low object. He never really enjoys what he gets."

—'Work and its secret', Complete Works,
২য় খণ্ড, পৃ—৪

তিনি জাতিকে আহ্বান জানালেন আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে :

"You must not depend on any foreign help. Nations, like individuals must help themselves. This is real patriotism. If a nation cannot do that, its time has not yet come."

—পত্র নং ৫০। Complete Works, পৃ—৮৩।

স্বদেশসাধনার ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা ও উঞ্ছবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সমভাবে ধিক্কৃত হয়েছে :

"ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না।"

—'লোকহিত'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—৩৯।

"বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব একথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না।"

—'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫,
পৃ—১২০।

জাতীয় জীবন থেকে ভীরুতা দূর করবার জন্যে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক সচেষ্টতা আমরা কিছু পূর্বেই লক্ষ করেছি। শক্তিচর্চার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা তাঁরা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন; কারণ দুর্বলেরা যদি শক্তিচর্চা না করে তবে তাদের শক্তিহীনতার সেই উৎসটাই সবলের স্বেচ্ছাচারকে লালন করবার কারণ হয়ে ওঠে। কিছু পূর্বে উদ্ধৃত বিবেকানন্দের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে :

শক্তিহীনের দুর্বলতাই সবলের স্বেচ্ছাচারকে লালন করে

"It is when the national body is weak that all sorts of desease germs, in the politcal state of the race or in its social state, in its educational or intellectual state, crowd into the system and produce desease."

—'The future of India', Complete Works, তৃতীয় খণ্ড, পৃ—২৮৮।

রবীন্দ্রনাথ শক্তির ভারসাম্যের অভাবজনিত সমূহ সঙ্কটটিকে প্রকাশ করে বললেন :

শক্তির ভারসাম্যে সঙ্কট

"সবল দুর্বলের পক্ষে যতো বড়ো শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড়ো শত্রু নয়।"

—'কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—৬৮।

"যে দুর্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ঙ্কর, হাতির পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না বলেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলই নীচের দিকে টেনে নেয়।"

—'বাতায়নিকের পত্র'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—১৪১।

"আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি, দুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক। বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজাণু ভাসছে দুর্বল তাকেই আতিথ্য দান করে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল ভয়ের কারণ বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।"

—'বাতায়নিকের পত্র'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—১৫০-৫১।

হাওয়া যে জায়গায় হাল্‌কা, ঝড়ের কেন্দ্রটা সেখানেই। দেহের যে অংশে প্রাণশক্তির অভাব সেখানেই জীবাণুর আক্রমণ ঘটে।

যারা ধর্ম আর সমাজের নানা অর্থহীন বিধিনিষেধ বিনা চিন্তায় পদে পদে মেনে চলে, তারাই আবার যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা দাবি করে, তবে সেটা স্বভাবতঃই খানিকটা অর্থহীন অযৌক্তিক আবদারের মতো শোনায়। বিবেকানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন :

"Do any deserve liberty, who are not ready to give it to others ?......I, for one, thoroughly believe that no power in the universe can withhold from any one anything he really deserves."

—Reply to the Calcutta address ; Complete Works,
চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৩১১

রবীন্দ্রনাথও প্রশ্ন তুলেছিলেন :

সামাজিক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দাবি করা অর্থহীন

"এতো নিষ্ঠুর জবরদস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া-ছোঁওয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে, তারা রাষ্ট্র-ব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন?"

—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। কালান্তর,
পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—৫৫।

তিনি বলেছিলেন :

"যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে পোষণ করে, তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থ নেই।"

—'সমস্যা'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫,
পৃ—২২১।

"দেশের যে আত্মাভিমানে.........বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্ব-সভায় আমাদের আসন পাতা চাই ; আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি 'খবরদার ! ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমন কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না'।......... দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের

এক চোখ জাগিবে, আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।”

—‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—৫৮-৫৯।

স্বদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠা দেশবাসীর অন্তরে

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে চিন্তার জড়তা ও ভীরুতাকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ কষাঘাত করেছেন, তা আমরা দেখেছি। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রগতি অথবা মুক্তি একান্তভাবে বাহ্য প্রচেষ্টার দ্বারা আসতে পারে না, তার জন্যে অন্তরের প্রস্তুতি প্রয়োজন—এই সত্যটির সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা বারবার। জীবনে যা-কিছু মহত্তম, তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে আমাদের মানস-প্রকৃতির মধ্য থেকেই। স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্রেও তাই তাঁরা দেশকে প্রথম স্থাপন করতে চেয়েছিলেন দেশবাসীর অন্তরে। কর্মযোগের গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়েও স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ আত্মশুদ্ধির বাণীই উচ্চারণ করেছিলেন :

“This is the first lesson to learn : be determined not to curse anything outside, not to lay the blame on anyone outside, but be a man, stand up, lay the blame on yourself. You will find, that is always true. Get hold of yourself.”

—‘Work and its secret’, Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড।

“We are to take care of ourselves,—that much we can do and give up attending to others, for a time. Let us perfect the means ; the end will take care of itself……Therefore let us purify ourselves. Let us make ourselves perfect.”

—‘Work and its secrct,’ Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৯।

মুক্তির সাধনায় অন্তরঙ্গের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার দিকটি ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

“বাহিরের দিক্ হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য

প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন।···আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই।”

—‘স্বাধিকারপ্রমত্ত :’। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—১২০।

“আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি।”

—‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’। কালান্তর, পৃ—৩৫২।

“যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তর-প্রকৃতিতে, এই জন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ।···মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।”

—‘সত্যের আহ্বান’। কালান্তর, পৃ—১৯৩।

এ প্রসঙ্গে ‘বাঙ্‌লাভাষা পরিচয়’ রচনাটিও স্মরণ করা যেতে পারে।

দেশ জুড়ে যে দৈন্য তার মূলে আছে প্রধানতঃ দেশবাসীর অন্তরের নিঃস্বতা। সেই নিঃস্বতাকে দূর করতে হবে এবং আপন চিত্তের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে সর্বাগ্রে সংগঠিত করে তুলতে হবে, এই হল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধেও (আত্মশক্তি) একসময় কবি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়, নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতিসাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমরা একসময় ইংরেজ সরকারের দ্বারস্থ হয়েছি, সেই উপলক্ষেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রবন্ধেও (সমূহ—পরিশিষ্ট ; রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ ১২শ খণ্ড) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হবার প্রতিবন্ধক।

অন্তরের সুপ্তি ভঙ্গ হলে, নিরর্থকের আবর্জনা থেকে মনের মুক্তি ঘটলে তবেই জনগণ নিজেদের অন্তর্নিহিত সংযোগসূত্রটির সন্ধান পায়। অজ্ঞানতার যে আবরণ মুক্ত-বুদ্ধিকে আবৃত করে রেখেছে তা অপসৃত হলে আন্তরিক ঐক্যের পথ যায় খুলে ; আর এই ঐক্যবোধই হচ্ছে দেশের শক্তিবিকাশের গোড়ার কথা।

গণচেতনা আনয়ন করাই যে স্বদেশ-সাধনার মূলসূত্র তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এর পরেই যে প্রশ্নটি স্বভাবতই মনে উদয় হয়, সেটি হচ্ছে,—এই গণচেতনা আনবার উপায় কি ? বিবেকানন্দ বললেন :

গণচেতনা-আনয়নের উপায়—শিক্ষা

"The chief cause of India's ruin has been the monopolising of the whole education and intelligence of the land, by dint of pride and royal authority, among a handful of men. If we are to rise again, we shall have to do it in the same way, i. e., by spreading education among the masses."

—'The education that India needs', Complete Works, চতুর্থ খণ্ড,পৃ—৪১৫।

'Our duty to the masses' প্রবন্ধে তিনি বললেন :

"The only service to be done for our lower classes is to give them education, to develop their lost individuality."

—'Our duty to the masses', Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৪১৫।

সকল দৈন্যের, সব-কিছু সমস্যার মূলে আছে আমাদের জ্ঞানের দীনতা। তাই শিক্ষা ছাড়া দেশকে জাগ্রত করবার অন্য কোনো উপায় নেই ;—জ্ঞানের আলোই জাতীয় জীবনের তামসিকতাকে দূর করতে পারে। মানবসত্তার অন্তর্নিহিত মুক্ত শুদ্ধ স্বরূপটি শিক্ষানুশীলনের মধ্য দিয়েই সম্যক্ দীপ্তিতে ও মহিমায় প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে, এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে 'What we believe in' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ বললেন :

"Education is the manifestation of the perfection already in man".

—'Whate we believe in,' Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৩০৪।

প্রকৃত গণমুক্তির উপায়টিকে রবীন্দ্রনাথও এককথায় চিহ্নিত করে দিলেন :

"দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে"।

—'সমাধান'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—২৫০।

দেখা যাচ্ছে, জন-শিক্ষাই যে গণজাগরণের ভিত্তি, এই সত্যটি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই দ্বিধাহীন কণ্ঠে পূর্ণ প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছেন।

প্রাচ্যের জীবনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

স্বদেশের মুক্ত বুদ্ধিকে আবাহন করতে গিয়ে বিবেকানন্দ প্রাচ্যের জীবনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রতীচ্যের শিক্ষার ঐশ্বর্য ও বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন।

'The education that India needs' প্রবন্ধে তিনি বললেন ঃ

"Travelling through many cities of Europe and observing in them the comforts and education of even the poor people, there was brought to my mind the state of our own poor people, and I used to shed tears. What made the difference? Education was the answer I got. Through education, faith in one's own self, the inherent Brahman is waking up in them, while the Brahman in us is gradually becoming dormant."

—'The education that India needs',
Complete works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৪১৬।

যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারা মানুষের বুদ্ধিকে 'ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন' থেকে মুক্তি দেবার ভার নিয়েছে, পশ্চিমের যে বিদ্যা আধিভৌতিক বিশ্বের বিধিবদ্ধ নিয়মকে মানুষের জ্ঞানের কোঠায় নিয়ে এসেছে, প্রাচ্যের জীবনে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ-ও উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্বদেশের মুক্তিসাধনার প্রয়োজনে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশের জন্যে সেই শিক্ষাকে ঐকান্তিক মনে কামনা করেছিলেন ঃ

"পশ্চিম দেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে ? অর্থাৎ, কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতি আছে ?—যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে।"

—'শিক্ষার মিলন'। শিক্ষা।

তাই তিনি বললেন :

"আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সামলানো যাবে।

—'শিক্ষার মিলন'। শিক্ষা।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংগঠন ও সেবাব্রত

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার ধারাটিকে অনুসরণ করতে গিয়ে (পূর্ব পরিচ্ছেদের আলোচনা থেকে) আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে সকল সময়েই সংগঠনমূলক মনোভাবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত-হয়েছে। জনতার সংহত শক্তি মঙ্গলকর্মে নিয়োজিত হোক্, এই ছিল উভয়ের ঐকান্তিক কামনা; তাই তাঁরা বারবার আত্মশক্তির জাগরণ ও আন্তরিক ঐক্য-সংস্থাপনের কথা বলেছেন; কারণ বৈষয়িক জীবনে সংগঠন-শক্তিকে ক্রিয়াশীল ও সফল করবার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অন্তরঙ্গে সৃষ্টিশীল চেতনার বিকাশ। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই অন্তরঙ্গ-অনুশীলনের কথা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করেছেন; কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের অধিকাংশ প্রয়াস বহিরঙ্গ-সর্বস্বতার জন্যে অথবা চিন্তার সঙ্গে কর্মের বিপুল ব্যবধানের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যায়।

উচ্ছ্বাসের আধিক্য সংগঠনধর্মী কর্ম-সাধনার পরিপন্থী।

মঙ্গল-কর্মের পশ্চাতে যে মোহমুক্ত মনের সক্রিয়তা প্রয়োজন, সেই মনের প্রয়োজনেই কর্মব্রতাচরণে তাঁরা দেশবাসীকে নিরর্থক আচার ও সংস্কারের আবরণ ছিন্ন করতে বলেছেন, তা আমরা দেখেছি। আবার, এই মোহমুক্ত মনের তাগিদেই তাঁরা হৃদয়াবেগের যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসকে সংযত করতে নির্দেশ দিয়েছেন; কারণ, আচারের বন্ধন যেমন কর্মের গতিকে ব্যাহত করে, আবেগের তীব্রতা সেইরকম কর্মের মূল উদ্দেশ্যকে বিপর্যস্ত করে।

বিবেকানন্দ উচ্ছ্বাস-সর্বস্বতাকে শ্রেয়ঃ কর্মসাধনার পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন:

"The less passion there is, the better we work.......When we let loose our feelings we waste so much energy, shatter our nerves, disturb our minds, and accomplish very little work. The energy which ought to have gone out as work is spent as mere feeling, which counts for nothing. It is only when the mind is very calm and

collected that the whole of its energy is spent in doing good work.'[?]

—'Practical Vedanta', Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—২৯০-৯১।

রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন :

"শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে—সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। ......অনেকদিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে একদিকে আছে হৃদয়াবেগ, আর একদিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অন্তঃকরণ অনেকদিন থেকে কোনো কাজ করে নি ; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে। এই জন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করবার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাত দিতে হয় এবং নানারকম জাদুমন্ত্র আউড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অন্তঃকরণের কাজ করবার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।"

—'সত্যের আহ্বান'। কালান্তর, পরিবর্ধিত সং ১৩৫৫, পৃ—১৯৬।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আবেগ-সর্বস্বতাকে পরিহার করতে বলেছেন, কারণ হৃদয়বৃত্তির আধিক্য অধিকাংশ সময়েই শ্রেয়ঃ ভাবনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ভাবাবেগের মত্ততা যুক্তিবোধকে গ্রাস করে বসে। উত্তেজনাটাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠে মানুষের শক্তি ও উদ্যমকে নিঃশেষিত করে ফেলে, কাজে কিছুই হয় না।

আবেগের উচ্ছ্বাসকে মূলধন করে অনেক সময়েই নেতৃত্বাধিকারী অথবা নেতৃত্বকামীরা জনগণকে নিজেদের খেয়ালখুসিমতো পথে চালনা করেন। প্রভাবশীল ব্যক্তির প্রবল প্ররোচনায় পড়ে হৃদয়াবেগের তাড়নায় যখন তারা অন্ধবেগে ধাবিত হয় তখন কার্য-কারণ, উচিত-অনুচিত বিচার করবার মতো মনের শক্তি আর তাদের অবশিষ্ট থাকে না। এও একরকম বুদ্ধির মোহ, অন্ধ আনুগত্য বা বিচারহীন বাধ্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই জন্যই বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ আবেগের অন্ধ বেগের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

স্বার্থপর নেতৃত্ব জনতার হৃদয়াবেগের সুযোগ নেয়

বিচারহীন বাধ্যতাকে তাঁরা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো উপলক্ষে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না ; কারণ ঐটার বিরুদ্ধেই তাঁদের মূল অভিযান।

এই মনোভাব রবীন্দ্রনাথের বহু কর্ম ও সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। যে অন্ধ উত্তেজনা মানুষের নিত্যসত্যের বোধ, মঙ্গলধর্মের ধারণাকে লঙ্ঘন করে তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। বিশ শতকের স্বদেশি আন্দোলনের বহু পর্যায় এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথের অসংশয়িত সমর্থন লাভ করেনি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ অচিরে তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ সেদিনের আন্দোলনের উত্তেজনা কবির সুমহৎ মানবতাবোধকে আহত করেছিল, 'জন-সংঘাত-মদিরার' তীব্রতায় তিনি বিপর্যস্ত বোধ করেছিলেন। যে কর্মপদ্ধতিতে মানুষের মর্যাদা লাঞ্ছিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন তাকে তিনি কখনোই কোনো সত্যসাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি।

সন্ত্রাসবাদের অন্ধতা

একই কারণে স্বদেশের মুক্তিসাধনায় সন্ত্রাসবাদ বা কোনো রকম হিংসাত্মক পন্থাকে রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন সমর্থন জানাননি, বরং তাকে সকলসময় নিন্দার্হ বলে ঘোষণা করেছেন, কারণ সে পন্থায় ক্রোধের আবেগটাই মুখ্য, সেখানে ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্র অস্বীকৃত। বিবেকবোধের সঙ্গে সে পন্থার প্রচণ্ড বিরোধ। ('পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ, 'রাজা প্রজা' দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি স্মরণীয়।)

গান্ধীজীর স্বদেশসেবা-পন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি

আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল হয়েও তাঁর চিন্তাধারা বা তাঁর অনুসৃত স্বদেশসেবার পথকে সর্বথা সমর্থন করতে পারেন নি। 'সত্যের আহ্বান', 'চরকা', 'স্বরাজসাধন' প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে ('কালান্তর') কবি এর কারণ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

মহাত্মাজীর সত্যব্রত, অকৃত্রিম মানবপ্রীতি ও সুবিপুল ইচ্ছাশক্তির প্রতি কবিগুরু বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানাভাবে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে উভয়ের সম্বন্ধও ছিল অত্যন্ত নিবিড়।

কিন্তু গান্ধীজীর চরকা-আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি। স্বদেশের যেসকল সমস্যার মূলে আছে দেশবাসীর চিত্তশক্তির অভাব ও অন্তরের বিভেদবোধ, চরকা-চালানো বা অনুরূপ কোনো বাহ্য প্রচেষ্টার দ্বারা তার কোনো স্থায়ী সমাধান হবে, এরকম তিনি প্রত্যাশা করেন নি। স্বল্পবল পণ্যশক্তির প্রতিভূ, অপরিণত যন্ত্রশক্তির প্রতীক 'চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে', স্বদেশ-সাধনা বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলা হচ্ছে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। ঐ 'বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া'র বিষয়েই তাঁর বিষম আপত্তি, কারণ প্রকৃত স্বরাজ দাঁড়াবে মুক্ত বুদ্ধির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর।

চরকা-আন্দোলন

গান্ধীজীর বর্জন-নীতির উপরেও রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন ছিলেন না। এই নেতিমূলক পদ্ধতিকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি ; কারণ, অর্জনের সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে শুধু বর্জনের দিকে নজর দিলে কোনো সত্য ফল লাভ হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না।—এর মূলেও ছিল তাঁর প্রকৃতিগত একান্ত সংগঠনধর্মী ইতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

বর্জননীতি

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনার মূল তত্ত্বটি বিভিন্ন সূত্রে অনুধাবন করলে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা জাতির সৃষ্টিশক্তির বিকাশের উপরেই সকলসময়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাতীয় মননবৃত্তির উজ্জীবন এবং জাগ্রত গণচিত্তের সুসংহতি ও গঠনশক্তির বিকাশ ছিল তাঁদের লক্ষ্য। স্বদেশের সজীবতম উপাদান 'মাটির মায়ের সন্তানদের' বিবেচক ও কর্মী রূপে 'প্রকৃত মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলার উপরেই যে মাতৃভূমির উন্নতি নির্ভরশীল, এই সত্যটিকেই তাঁরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

জাগ্রত গণচিত্তের সংহতি ও সৃষ্টিশক্তির বিকাশ।

প্রসঙ্গক্রমে 'সেবাব্রত' সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি একটু বিচার করে দেখা যেতে পারে।

'সেবাব্রত' বিবেকানন্দের বাণীতে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুসরণে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উপর তিনি অনেক স্থলে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মিশন' সেবাধর্মকে কর্মসাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সেবাব্রত

সাধারণতঃ জনসেবা বলতে আমরা বুভুক্ষুকে খাদ্য-দান, রোগীকে পথ্য ও ঔষধ দান ইত্যাদি নানা প্রকার বস্তুগত সাহায্যকেই বুঝে থাকি। অবশ্য 'সেবা' শব্দকে এরূপ সঙ্কুচিত অর্থে গ্রহণ করা উচিত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে নির্বিশেষ কালের বিচারে এ ধরণের সেবাধর্ম (relief) কিছুটা অভাবাত্মক বা নেতিমূলক কর্ম তা স্বীকার করতেই হবে। এ রকম সেবার দ্বারা যাকে সেবা করা যায় তাকে সাময়িক বস্তুগত সাহায্য কিছুটা করা হয় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার দ্বারা সেবিতের চিত্তকে স্পর্শ করা যায় কিনা অথবা তাদের আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা এর দ্বারা জাগ্রত হয় কি না, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবসর থাকতেই পারে। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরণের সেবাকর্মের অনিবার্য আশু প্রয়োজন দেখা দেয় তাও অনস্বীকার্য। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী অথবা যুদ্ধবিগ্রহাদির মতো পরিস্থিতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। নিত্য বিপর্যয়াক্রান্ত স্বদেশের দিকে তাকিয়ে আর্ত ও পীড়িতের অসহনীয় দুর্দশায় বিচলিত বিবেকানন্দ তাই ক্ষেত্রবিশেষে সেবাব্রতকে জনচিত্তে, বিশেষ করে যুবসমাজের সামনে বড়ো করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন।

সেবাধর্মের নেতিমূলকতা

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'সেবা' শব্দটি সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন।—সেবাধর্মের মহত্ত্বের সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান অথবা উদাসীন ছিলেন, কিম্বা সমষ্টি-সঙ্কটে ত্রাণকর্মের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না, এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই ; কিন্তু সঙ্গত কারণেই তিনি আশঙ্কা পোষণ করতেন যে, সেবার সম্বন্ধে অতিসতর্ক হলে মানুষ সংস্কারের দিকে আর দৃষ্টি দিতে পারে না, 'রিলিফ'-এর প্রতি অতি-প্রবণতা 'রিফর্ম'-এর দিক্ থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে দেয়।

'সেবা'-সম্পর্কে আপন স্পর্শকাতরতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন :

"আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন। গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে একথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্তমান কালের আদর্শ আমাদের যেসব যুবকদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে তারা দেখিতে পাই সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দায়িত্ব বন্ধন জ্বালাইয়া দিয়াছে।"

"এমনি করিয়া যারা মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে চলিয়াছে কোন্ পথে? তারা দুঃখের সমুদ্রকে ব্লটিং কাগজ দিয়া শুষিয়া লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল 'সেবা' কথাটাকে খুব বড়ো অক্ষরে লিখিতেছি ও সেবকের তক্‌মাটিকে খুব উজ্জ্বল করিয়া গিল্টি করিলাম"।

"কিন্তু ফুটা কলস ক্রমাগতই কত ভর্তি করিব। কেবলমাত্র সেবা করিয়া চাঁদা দিয়া দেশের দুঃখ দূর হইবে কেমন করিয়া। দেশে বর্তমান দারিদ্র্যের মূল কোথায়, কোথায় এমন ছিদ্র যেখান দিয়া সমস্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায় সেই নিরুদ্যমের বিষ যাতে আমরা কোনো-মতেই আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিতে উৎসাহ পাই না সেটা ভাবিয়া দেখা এবং সেইখানে প্রতিকারচেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।"

—'কৃপণতা'। সমাজ।

রবীন্দ্রনাথ এখানে সেবাধর্মের অভাবাত্মক দিকৃটির প্রতি সুস্পষ্ট অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। সেই সঙ্গে আমরা তাঁর প্রকৃতিগত একান্ত সংগঠনমুখী ইতিমূলক মনোভাবটির পুনরুদ্‌ঘাটন প্রত্যক্ষ করেছি।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমৈত্রী

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্মে ও বাণীতে স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসাকে আমরা পদে পদে মন্দ্রিত হতে দেখেছি। আপন হৃদয়ের 'আগুনের পরশমণি'র ছোঁয়ায় তাঁরা জনচিত্তে স্বদেশপ্রীতির যে উজ্জ্বল পবিত্র বহ্নিশিখাটিকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন তার কাজ কিন্তু কদাপি অগ্নিকাণ্ড ঘটানো নয়; সে শিখার কাজ আলো জালানো।—

খণ্ড দেশ, কাল বা সমাজ-সাপেক্ষ বস্তুসত্য অথবা ভাবসত্য সম্পর্কে সচেতন হলেও নিত্যসত্যের প্রতি অকৃত্রিম সহজাত আন্তরিক শ্রদ্ধা উভয়কে এগুলির মূল্যপরিমিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক থাকতে সহায়তা করেছে; তাই স্বজাতির প্রতি নিবিড় অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও সে আকর্ষণ কোনো মুহূর্তেই বিশ্বজনীন মানবতাবোধের আদর্শের পরিপন্থী হয়ে দেখা দেয় নি, বরং পরিপূরক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। নির্বিশেষ মানবপ্রীতি যেখানে সংকুচিত বা আহত হয়েছে সেখানেই তাঁদের চিরজাগ্রত অসহিষ্ণুতা। বিবেকানন্দ বিশ্বজনীনতার আদর্শকেই সকলের চেয়ে উচ্চে স্থান দিয়েছেন, সর্বজনীন প্রেমের মধ্যে মনের মুক্তিকেই মানুষের চিত্তোন্নতির শীর্ষ প্রান্ত বলে চিহ্নিত করেছেন:

বিশ্বজনীন মানবতা-বোধের অপরিপন্থী জাতীয়তাবোধ

"The universal sympathy, universal love, universal bliss, that never changes, raises man above everything."

—'The way of Blessedness', Complete Works, ২য় খণ্ড, পৃ—৪১৩

"The search after the universal is the one search of Indian philosophy and religion......The Indian mind, throughout its history, has been directed to this kind of singular search after the universal in everything—in science, in psychology, in love, in philosophy."

—'Unity, the goal of religion', Complete Works, তৃতীয় খণ্ড, পৃ—৮১।

অখণ্ড মানব-প্রীতির চিন্তাধারাটি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৃহৎ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই জন্যে তিনি স্বজাতি-প্রেমকে উচ্চস্থান দান করা সত্ত্বেও যে জাতীয়তাবোধ পরজাতিবিদ্বেষের আকারে প্রকাশ পেয়েছে তাকে কোনোদিন সমর্থন জানাতে পারেন নি; পরন্তু পুনঃ পুনঃ এ ধরণের মনোভাবকে ধিক্কারে জর্জরিত করেছেন; কারণ উগ্র জাতীয়তাবোধ মানুষের নিত্যধর্মকে খণ্ডিত করে, বৃহত্তর মঙ্গলবোধকে ব্যাহত করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

…প্যাট্রিয়টিজম্ নামক পদার্থ। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়াতোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভান সৃষ্টি হইতেছে তাহার মীমাংসা নাই।"

—'আচরণ'। শিক্ষা।

আক্রমণাত্মক 'ন্যাশ-ন্যালিজম্'-এর সঙ্কট

অন্ধ জাতীয়তাবোধকে কবি কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার প্রকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে তাঁর 'ন্যাশন্যালিজম্' গ্রন্থে। তিনি বলেছিলেন:

"For the sake of humanity we must stand up and give warning to all that nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age eating into its moral vitality."

—Nationalism.

ন্যাশন্যালিজমের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতার জন্যে একসময় বিজ্ঞানদম্ভী শোষণজীবী পাশ্চাত্য ও তদনুসারী পরাক্রান্ত প্রাচ্যপ্রতিভূ জাপানই যে শুধু খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল তাই নয়, স্বদেশের উগ্রপন্থীরাও প্রবল বিরূপতা পোষণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে গদরপার্টির সমসাময়িক মনোভাব উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও কবি আপন উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ অবিচলিত ও আস্থাবান থাকতে পেরেছিলেন।

লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশন্যালিজম্' বলতে 'এগ্রেসিভ্ ন্যাশ-ন্যালিজম্' বা 'ইম্পীরিয়ালিজম্'-কেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। যে উগ্র স্বাজাত্যবোধ পররাজ্য-গ্রাসের লোভকে লালন করে তোলে, যে জাতীয়তা-বাদের পরিণতি জাতিতে জাতিতে সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং স্বার্থ-প্রলুব্ধ

বিরোধ আকারে দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে মনস্বী কবি দণ্ডহস্ত হয়েছিলেন; কারণ, 'মানুষের ধর্ম' সেখানে বিদলিত, শাশ্বত মঙ্গলবোধ সেখানে বিপর্যস্ত।

তিনি বললেন:

"পৃথিবীতে নেশন্ গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশন্যালিজম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয়-গণ্ডিদেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারিদিক্ থেকে নরবলির জয়গান চলতে লাগল।.........

"এই দুর্বুদ্ধির নাম ন্যাশন্যালিজম্, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টো দিকে, অর্থাৎ আপনার দিক্‌টাতেই এর টান।"

—'শিক্ষার মিলন'। শিক্ষা।

'নৈবেদ্য' কাব্যে কবি বলেছিলেন:

"......দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।"

—নৈবেদ্য। কবিতা নং ৬৪।

"ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"

—নৈবেদ্য। কবিতা নং ৬৫।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছিলেন; কারণ জাতীয়তার নামে যে উগ্র অনুভূতি মানবতার বিশ্বজনীন মঙ্গলাদর্শকে পদে পদে লঙ্ঘন করে তাকে তিনি প্রকৃত জাতীয়তা বলে মেনে নিতে পারেন নি। বিশ্বমানবিকতাকে স্বাদেশিকতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন:

"যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা।"

—'তপোবন'। শিক্ষা।

ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে 'জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।'

ভারত-ইতিহাসের মহনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন:

"If I ask myself what has been *the cause of India's greatness,* I answer, *because we have never conquered. That is our glory.*"

—'The Work before us'; Complete Works,
৩য় খণ্ড, পৃ—২৭৩।

ভারত মহৎ কেন? কারণ, সে বলের দ্বারা কাউকে জয় করতে চায় নি, বিশ্বকে আত্মার দ্বারা আত্মীয় করে নিতে চেয়েছে। ভারত-ইতিহাসের বিশেষত্ব বিবৃত করতে গিয়ে বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথও আবিষ্কার করেছিলেন:

ভারত-ইতিহাসের বাণী

"ইংরেজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয় দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসায় করিয়াছে; সেও নিজেকে রণগৌরব ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। **আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য-বিস্তার করেন নাই। এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস।**"

—'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ইতিহাস, পৃ—৫, ১ম সং।

"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন-করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং **বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।**

"এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার **এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্র-গৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে।** কারণ রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব।"

—'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ইতিহাস, পৃ—৬, ১ম সং।

ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয়তার স্বরূপ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করিনে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা।"

—'তপোবন'। শিক্ষা।

ভারতের সাধনা প্রভেদের দ্বারা পরাক্রান্ত হবার প্রয়াস নয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করবার তপশ্চরণ। ভারতের স্বদেশ-সাধনার সঙ্গে বিশ্বজনীনতার বিরোধ নেই বললে সবটুকু বলা হয় না ; যে স্বাদেশিকতার আদর্শ ভারতীয় সাধকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, বিশ্বমানবতায় উত্তীর্ণ হওয়া-টাই তার অন্তর্নিহিত চরম লক্ষ্য। 'ভারতপথিকেরা' যে ভারতবর্ষকে তাঁদের শ্রেয়ঃ সাধনায় প্রত্যক্ষ করেছেন, ভারতবর্ষের নেপথ্য-ইতিহাস-নিষ্কাশিত যে স্বদেশকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন তাকে মূঢ় ভৌগোলিক পরিবেশে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখতে চাওয়া আত্যন্তিক প্রত্যাশা, রাষ্ট্রীয় সংকট আর সাম্রাজ্য-সংঘাতে সমাকীর্ণ প্রচলিত সুপরিজ্ঞাত সাধারণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাকে খুঁজতে যাওয়া অবশ্যই বৃথা। এই সত্যটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে,—পাঠান মোগল পর্তুগিজ ফরাসী ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

"কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়,

এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।

"কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই-সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতে-ছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

"কিন্তু বর্তমান পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ।.........দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক্ সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়।"

—ইতিহাস, ১ম সং, পৃ—১-২।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট অভিযোগ করলেন:

"দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।"

—ইতিহাস, পৃ—৩।

এই আচ্ছন্নতা থেকেই স্বদেশকে মুক্ত করে তার সত্যস্বরূপকে প্রতিভাত করতে চেয়েছেন 'ভারতপথের' পথিকেরা। এ স্বরূপ একান্তভাবেই তাদের চিত্তের সৃষ্টি, প্রজ্ঞার প্রতিফলন। সকল রূঢ় মূঢ় পরিচয়ের আবর্জনা অপনোদন করে তাঁরা যে মাতৃভূমিকে স্বদেশবাসীর চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন তা জ্ঞানে গরিয়সী, কর্মে সৃষ্টিশীলা ও প্রেমে বিশ্বপরিব্যাপিণী। কোনো গণ্ডির পূজা সেখানে স্বীকৃতি পায় নি। সে-ভারতের রূপকাররা স্বধর্মকে ততক্ষণ শ্রদ্ধা করেছেন যতক্ষণ তা নিত্যধর্মকে আঘাত না করেছে; স্ব-সমাজ-আনুগত্য তাঁরা ততদূর পর্যন্ত স্বীকার করতে প্রস্তুত যতদূর পর্যন্ত সে আনুগত্য মনুষ্যত্বের সাধনাকে ব্যাহত না করে; স্বদেশের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গভীর, কিন্তু যেখানে স্বদেশপ্রীতি বিশ্ববোধের পরিপন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে সেখানে তা প্রকৃত দেশপ্রেম বলে তাঁদের কাছে স্বীকৃতি পায়নি; কারণ বৃহতের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রের বিসর্জনে দ্বিধান্বিত হয়ে তাঁরা আত্মবিস্তারের মূল সূত্রকে বিপর্যস্ত হতে দেননি। ভারতের প্রত্যক্ষ ইতিহাসের নেপথ্যে অনন্তের জন্যে একটি আত্যন্তিক ক্ষুধাবোধ বা তীব্র অদ্বৈত-পিপাসাকে

ভারতের অদ্বৈত-পিপাসা

স্বদেশের মননশীল সত্তায় তাঁরা অলক্ষ্য সংগোপনে প্রবহমান হতে দেখেছেন। সমগ্রের সে উপাসনায় অংশ অবহেলিত হয় নি ; তবে অংশের সার্থকতা যে সমগ্রের রূপায়ণে, এ সত্যটি দ্বিধাহীনভাবে অনুভূত হয়েছে। তাই সেখানে অংশের প্রতি আসক্তিবশতঃ পূর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই পাপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই পূর্ণের আরাধনার পথেই ভারতের ইতিহাস দেশ-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে 'মহামানবের সাগরতীরে' উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতের ধর্মসাধনা, স্বদেশসাধনা প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বমানবতার পূজা-উপচারের এক একটি অঙ্গ বিশেষ। সে পূজায় যুগে যুগে যে বিশ্ব-মৈত্রীর মন্ত্রটি উদ্গীত হয়েছে তার মূল স্বরটি হল, 'যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক করে দেখে তারাই সত্য দেখে।'

একাকার হওয়া এক হওয়া নয়

বিশ্বজনীন ঐক্যের উপাসনায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এক হওয়া বলতে তাঁরা কখনোই একাকার হওয়া বোঝাতে চান নি। যারা বিচ্ছিন্ন তারা পরস্পরের বিশিষ্টতাকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই সত্যস্বরূপে সম্মিলিত হতে পারে। ঐক্যলাভ করার অর্থ স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া নয়। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ শ্রেয়ঃ মিলনের জন্যেই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন।

বিবেকানন্দ বলেছেন :

"Unity in variety is the plan of the Universal.........The unity of sameness can come only when this universe is destroyed, otherwise such a thing is impossible. Not only so, it would be dangerous to have it.........It is this difference, this differentiations, this losing of the balance between us, which is the very soul of our progress, the soul of all our thought. This must always be."

—'The ideal of universal religion',
Complete Works, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৩৮০।

স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে মিলনসাধনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বললেন :

"একাকার হওয়া এক হওয়া নয়, যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে।

………যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতি-বিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।"

—'শিক্ষার মিলন'। শিক্ষা।

দেখা যাচ্ছে, উভয় চিন্তানায়ক স্বাতন্ত্র্যহীনের ঐক্যকে প্রগতির পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। কিন্তু সার্বভৌমিকতার সাধনায় অনেকসময় আবার দুজনকে বৈষম্য বা স্বাতন্ত্র্যের সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখা গেছে, এমন দৃষ্টান্তও মোটেই দুর্লভ নয়। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের "Everything must be sacrificed if necessary, for that one sentiment universality" (৫৫নং পত্র, Complete Works, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ—২৫০), এই স্পষ্টোক্তিটি আরও একবার স্মরণ করা যেতে পারে। বিশ্বজনীনতার প্রয়োজনে সকলকিছু বিসর্জনের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষের গতি যে পরিমাণে বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সঙ্কীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।"

—মানুষের ধর্ম, পৃ—৩।

"মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস।……… **সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে—যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।**"

—মানুষের ধর্ম, পৃ—১২-১৩।

এখানে মানুষকে তার সঙ্কীর্ণ দেশ-কালের সকল-রকম খণ্ড পরিচয় থেকে মুক্ত করে মানবতার সার্বভৌমিক পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে।

লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একদিকে 'ঐক্যের সাধনার জন্যেই স্বাতন্ত্র্যের সাধনা'র উপর জোর দিয়েছেন, আবার অন্যদিকে

বিশ্বজনীন মৈত্রী ও মিলনের উপাসনায় সকল প্রকার সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা বৈষম্যের গণ্ডিকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছেন। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, তাঁরা সকলরকম স্বাতন্ত্র্যকে একজাতীয় বলে মনে করেন নি। উভয় যুগ-পুরুষের সমাজচিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি যে, সকল সামাজিক বন্ধনের রূপও অভিন্ন নয়।——কোনো বন্ধন মানুষকে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বন্দী করে, আবার কোনো বন্ধন তাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে মুক্তি দান করে।

স্বাতন্ত্র্যের রূপভেদ

তেমনই, **সকল রকম স্বাতন্ত্র্যও একজাতীয় নয়। যেখানে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বৈষম্যের অভিমানটাই প্রবল, সেখানে সেই স্বাতন্ত্র্য বিভেদবোধকেই তীব্র করে তুলে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে।**

কিন্তু অন্যদিকে আবার মানুষকে সত্যভাবে সম্মিলিত হবার জন্যেই স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হয়। কারণ **বৈশিষ্ট্যহীনের সম্মিলন নিষ্প্রাণ জড় ঐক্যে পরিণত হতে বাধ্য।** যে ঐক্যের মধ্যে বিচিত্রের গতিচাঞ্চল্য নেই সেখানে কর্মের বেগে ছেদ পড়েছে বুঝতে হবে। তা প্রাণবান বা জীবনমুখর হতে পারে না। এই ধরণের একতা নিশ্চিতই বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল না।

'ভারতপথ'-এর সাধকেরা বিশ্বগত মানুষকে চরম বলে জানলেও ব্যক্তিগত মানুষকে অস্বীকার করেন নি ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ

"মানুষ একদিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর একদিকে অমৃতে ; একদিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর একদিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেও জানে·········সে দূরেও বটে, সে নিকটেও। সেই দূরের মানুষের দাবি নিকটের সবকিছুকেই ছাড়িয়ে যায়।"

—মানুষের ধর্ম। পৃ—১৯-২০।

বিশ্বমানবমনের বৈচিত্র্যের বহুলতার মধ্যে যে সর্বজনীন ঐক্যের সাধারণ ভূমি রয়েছে, সেইটির উপরেই ভারতপথিকেরা সকল সময় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ মানুষকে সেই সার্বভৌমিক সামঞ্জস্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর-স্থাপন করে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। যে 'মৈত্রী, করুণা ও প্রেমের' শাশ্বত সুরটি বিশ্বমানবমনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, সকল আপাত বিচ্ছিন্নতাকে গৌণ করে বিশ্বের মানুষ মনুষ্যত্বের সেই সাধারণ সূত্রে

সম্মিলিত হোক্, এই ছিল তাঁদের ঐকান্তিক কামনা। ভারতইতিহাসের ধারায় সেই পরিপূর্ণ ঐক্যের তপস্যাটিকে উদ্ভাবন করে মুখ্যতঃ তাঁরা সেই উদ্দেশ্যেই জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বদেশের ইতিহাসের রূপ ও তাৎপর্য বিবৃত করে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এপ্রসঙ্গের সমাপ্তি টানছি ঃ

"পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। **এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতিসুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।**"

—'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ইতিহাস, পৃ—১১, ১ম সং।

———

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাচিন্তা

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাচিন্তা

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, সমাজ ও স্বদেশ সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে গিয়ে যে বিষয়টি পুনঃ পুনঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হচ্ছে, তাঁরা সকল বাহ্য সমস্যার উৎসস্বরূপ আন্তরিক সমস্যাটিকেই সর্বদা বড়ো করে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই মূল ধরেই নাড়া দিতে চেয়েছেন।

অজস্র বস্তুসমস্যা-জর্জরিত স্বদেশের তথা মানবসমাজের দিকে তাকিয়ে তাঁরা অবিশ্রাম সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যে সমাধানের সূত্রটি লাভ করেছিলেন তা হল, অন্তরঙ্গের মুক্তি-সাধনার মধ্য দিয়েই এই বহিরঙ্গ সমস্যা-গুলির মূলকেন্দ্রে আঘাত হানা যেতে পারে। বুদ্ধির জাগরণই হল মৌলিক কর্তব্য ; আর এই জাগরণ আসতে পারে একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে। জাতীয় চিন্তাশক্তির উদ্বোধনের সর্বপ্রধান উপায় হিসেবে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি।

সমসাময়িক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতা

অন্তরঙ্গের সম্যক্‌ অনুশীলনের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও স্বদেশের সমসাময়িক শিক্ষা-পদ্ধতির দিকে তাকিয়ে তাঁরা মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সে ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, অসুস্থতা ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার অপরিমেয় অসঙ্গতি ও ব্যবধান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদিকে চিন্তিত ও অসহিষ্ণু করে তুলেছিল।

সাম্প্রতিক স্বাধীনতোত্তর ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার বহুল প্রসার ও পরিবর্তন ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। পারিপার্শ্বিক অনুশীলিত বিশ্বে পাংক্তেয় হয়ে ওঠার জন্যে এশিয়া-আফ্রিকার অনেক দেশের সঙ্গে ভারতও শিক্ষা-সম্প্রসারণ তথা যন্ত্র ও শিল্পবিদ্যার উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছে ও এ ব্যাপারে আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক অংশকে চিন্তা ও কর্মে কিছুপরিমাণ নেতৃত্বও দান করেছে। উনিশ শতকের শেষপাদে অথবা বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের সমসাময়িক শিক্ষার পরিবেশ-প্রতিবেশ ও তার সমস্যাদি নিয়ে যে-সকল কথা

বলা চলতো তার সবকিছুই যে সাম্প্রতিক কালের ভারতের শিক্ষা-চর্চা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। পটভূমিকা ও বাস্তব পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন এর মধ্যে ঘটে গেছে। তবু কালের ব্যবধান ও পরিস্থিতির পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা চলে যে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সেদিন শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ তার নীতি ও রূপের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা এযুগের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও বহুলাংশে প্রযোজ্য। কালের ব্যবধানে তার মূল্য হারিয়ে যায়নি; তাই আজকের শিক্ষাব্যবস্থার রূপায়ণে সেই শ্রেয়ঃ চিন্তা ও নীতির প্রয়োগ সমভাবে প্রয়োজনীয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে তাঁরা যে-ভাবে চিহ্নিত করেছেন তাতে মূলতঃ তা দেশ-কাল-নিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। শিক্ষার রূপটিকে পবিত্র ও উজ্জীবিত রাখতে হলে সে মৌলিক নীতিগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা ও সতর্কতা অপরিহার্য।

শিক্ষাকে ঐকান্তিকভাবে অন্তরের সম্পদ করে তুলতে চেয়েছিলেন বলেই

শিক্ষার বহিরঙ্গ-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

শিক্ষার ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ-বাহুল্য বা তার চাকচিক্যময় বাইরের কাঠামোটাকে বিবেকানন্দ সুস্থ শিক্ষার প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিলেন। বহিরঙ্গমুখীণতা অন্তরের সঙ্গে শিক্ষার অসহযোগিতাকেই ঘনীভূত করে তোলে। এই অসহযোগিতার ফলে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে ব্যর্থতা আসে তার সমালোচনা করে বিবেকানন্দ বলেছেন:

"The ideal of all education, all training, should be this man-making, But, instead of that, we are always trying to polish up the outside. What use in polishing up the outside when there is no inside? The end and aim of all training is to make the man grow."

—'The power of the mind', Complete Works,

দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—১৫

রবীন্দ্রনাথও জীবনের সঙ্গে শিক্ষার এই অসামঞ্জস্যকে জাতির সর্বপ্রধান সমস্যা বলে অভিহিত করেছিলেন:

"আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য-সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

—'শিক্ষার হেরফের'। শিক্ষা।

জীবনের সঙ্গে শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাবে শিক্ষা-পদ্ধতি অবাস্তব হয়ে উঠতে বাধ্য। শিক্ষার সার্থকতা যেখানে অন্তরের উদ্বোধনে সেখানে শিক্ষা আন্তরিক না হলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ বার বার 'শিক্ষার সঙ্গে অন্তরের বিচ্ছেদ'-এর বিপর্যয় সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

শিক্ষা ও জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাবে বিপর্যয়

এই বিচ্ছেদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে **শিক্ষাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা**। গতানুগতিক ব্যবস্থার আবর্তনে প্রাণের কোনো স্পন্দন পাওয়া যায় না। শিক্ষায়তন সেখানে 'ফ্যাক্টরি'তে পরিণত হয়। সে কারখানা শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ না ঘটিয়ে বিশেষ ছাঁচে ফেলে তাকে কৃত্রিম অভ্যাসের দাস করে তোলে। বিবেকানন্দ শিক্ষা-ব্যবস্থার এই মর্মান্তিক যান্ত্রিকতা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হতে বলেছিলেন:

শিক্ষাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা

"Is that education which is slowly *making man a machine ?* It is more blessed, in my openion, even to go wrong impelled by one's free will and intelligence than to be good as an automaton."

—'Our present social problems', Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৪২৩

রবীন্দ্রনাথও জীবনের সঙ্গে শিক্ষার বিচ্ছেদ ও তৎসঞ্জাত শিক্ষাধারার যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন:

"ইস্কুল বলিতে যাহা আমরা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ।"

—'শিক্ষাসমস্যা'। শিক্ষা।

"দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্ত করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সহিত তাহার মিল দেখিতে পাই না।.........এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন হইয়া থাকে—তাহা বস্তু যোগায়, প্রাণ যোগায় না।"

—'শিক্ষাসমস্যা'। শিক্ষা।

শিক্ষার নিষ্প্রাণ গতানুগতিকতা ও যান্ত্রিকতার পশ্চাতে যে-সকল কারণ সক্রিয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল **পুঁথিসর্বস্বতা**। জ্ঞানানু-

শীলনের ক্ষেত্রে শাস্ত্র ও পুঁথির সহায়তা, পূর্বাচার্যদের প্রয়াসাহৃত মননলব্ধ তথ্য তত্ত্ব ও নির্দেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অনেক সময় আত্যন্তিক শাস্ত্রানুগত্য ও পুঁথির আধিক্য স্বাধীন চিত্তশক্তিকে শাণিত বা সঞ্জীবিত না করে চিন্তাশক্তির বিকাশ ও পরিণতির পথে বাধা হিসেবে দেখা দেয়। পুঁথি-সর্বস্বতার দ্বারা মনের আচ্ছন্নতাকে বিবেকানন্দ অথবা রবীন্দ্রনাথ কেউই সমর্থন জানাতে পারেন নি। বুদ্ধির বিস্তার ও ইচ্ছাশক্তির উপর অপ্রতিহত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই শিক্ষার প্রয়োজন—এই কথাটাই বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছিলেন :

"What is education? Is it book-learning? No. Is it diverse knowledge? Not even that. The training by which the current and expression of will are brought under control and become fruitful is called education."

—'Our present social problems', Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৪২৩।

'পুঁথির আক্রমণ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া উচিত নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে—এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য।"

—'আবরণ'। শিক্ষা।

"বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলামেশা, কোথায় সহজ হাস্য-কৌতুক।"

—'আবরণ'। শিক্ষা।

অতিরিক্ত পুঁথিনির্ভরতা যে মনের সহজ স্বচ্ছন্দ বিকাশকে বিপর্যস্ত করে, এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পুঁথির অপ্রতিহত আধিপত্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শিক্ষায় বস্তুভার। যে-শিক্ষা ছাত্রেরা না বুঝে অবাধে গলাধঃকরণ করে

তা অনিবার্য কারণেই তাদের অন্তরের সামগ্রী না হয়ে উল্টে বোঝা হয়ে দেখা দেয় ; কারণ স্বয়ংস্বতন্ত্র বিচারবোধ ও চিন্তার ক্ষমতা গ্রন্থের স্তূপে চাপা পড়ে যায়। যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষার মূল লক্ষ্য, সেই ক্ষেত্রেই চরম দীনতার উদ্ভব হয়।

শিক্ষায় বস্তুভার

এ রকম শিক্ষাধারায় শিক্ষণীয় বস্তুর পরিমাণটার দিকেই একমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, যারা শিক্ষার্থী তাদের মনের দিকে নজর দেবার আর অবকাশ মেলেনা। এর স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ ফল ছাত্রদের মানসিক অজীর্ণতা রোগ।

প্রচলিত শিক্ষাধারার এই বস্তুভার সম্বন্ধে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

"Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all our life. We must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library."

—'The future of India', Complete Works, তৃতীয় খণ্ড, পৃ—৩০২।

তথ্য বা তত্ত্বভারাক্রান্ততা নয়, চরিত্রসংগঠক জীবনমুখী সৃষ্টিপ্রবণ শ্রেয়ঃ ভাবরাশির স্বীকরণকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে বিবেকানন্দ চিহ্নিত করেছেন।

প্রকৃত শিক্ষা

শিক্ষার ভারাক্রান্ততা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন :

"শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা, আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। ....গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্বিসহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে।"

—'আবরণ'। শিক্ষা।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন ; সেটি হল আমাদের **ইতিহাস-দৃষ্টির নেতিমূলকতা**। আপন অতীতের সম্বন্ধে ধারণা যদি নৈরাশ্যজনক হয় তবে বর্তমানের উপর আস্থা স্থাপন ও উজ্জল ভবিষ্যতের সম্বন্ধে উদ্দীপিত আশা পোষণ, কোনোটাই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। জাতির কর্মশক্তি ও মনোবলের উপর জাতীয় ইতিহাসের প্রভাব অপরিসীম। তাই একদিকে জাতির অতীতের গৌরব-দীপ্ত উত্থানের কাহিনী যেমন জাতীয় মনোবলকে বহুগুণে বর্ধিত করে ও সমষ্টি-জীবনকে প্রাগ্রসর করে, অন্যদিকে তেমনি জাতির পরিভগ্নতা ও পতনের ইতিবৃত্ত সেই উৎসাহ ও মনোবলের মূলে কুঠারাঘাত হানে। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষের শিক্ষাধারায় এই ইতিহাসদৃষ্টির বিপর্যয় জাতীয় মনোভাবের উপর বিপুল প্রতিকূল প্রভাব আরোপ করেছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়েও সে সঙ্কট থেকে আমরা পরিপূর্ণ নিষ্কৃতি পাইনি। আজও স্বদেশের সম্পূর্ণাঙ্গ সুস্থ নিরপেক্ষ সত্য ইতিহাসকে আমরা রূপ দিতে পারি নি ; তবে সে প্রয়াসে কিছু পরিমাণে ব্রতী হয়েছি ও তার অনুকূল পরিবেশকে খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়েছি এইটুকুই আশার কথা।

ইতিহাসদৃষ্টির নেতিমূলকতা

শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের ইতিহাস-বিকৃতির প্রধানতম কারণ হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যের ইতিহাস-আবিষ্কারে আমরা প্রতীচ্যের পণ্ডিতমণ্ডলীর উপরেই একদা সর্বাংশে নির্ভর করেছি। তাঁদের মধ্যে অনেক একদেশদর্শী উন্নাসিক প্রবল শ্রদ্ধাহীনতার মনোভাব নিয়ে কিছুটা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই প্রাচ্যজীবনের পঙ্গু বিকৃত চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং ছাপার অক্ষরে সে তথ্য ও বর্ণনাকে পাশ্চাত্ত্য আড়ম্বর ও চাকচিক্যের মোহে অন্ধ প্রাচ্য শিক্ষার্থী প্রতিবাদহীন পরম-বিশ্বাসে বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করে এসেছে। এইসব বই পড়ে তারা যে ধারণা আহরণ করেছে তা নিঃসন্দেহে তাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডে আঘাত হেনেছে। এ ধরণের শিক্ষা মানুষের আত্ম-বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে, আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধাকে বিচলিত করে। **আত্মবিশ্বাসের পরিপন্থী এই নেতিমূলক শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে** বিবেকানন্দ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে এবিষয়ে জাতিকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন :

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতা

"The education that our boys receive is very negative. The school-boy learns nothing, but has everything of his own broken down ;—want of 'shraddha' is the result...... Therefore are we so near destruction."

—"The education that India needs', Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৪১৭।

"We have had a negative education all along from our boyhood. We have only learnt that we are no bodies. Seldom are we given to understand that great men were even born in our country. Nothing positive has been taught to us."

—Conversation and Dialogues ; Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ—২৪৭।

"We must have a hold on *the spiritual and secular education of the nation*......The education that you are getting now has some good points, but it has a tremendous disadvantage which is so great that the good things are all weighed down. In the first place, it is not man-making education, *it is merely and entirely a negative education. A negative education or any training that is based on negation is worse than death.*"

—'The future of India', Complete Works, তৃতীয় খণ্ড, পৃ—৩০১।

লক্ষ করবার বিষয়, বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসেবেই শিক্ষার ত্রুটি-বিমুক্তির ক্ষেত্রে নেতিমূলকতা-বর্জনকে প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। নঙাত্মক শিক্ষা যে আত্মিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সমষ্টিজীবনে ধীরে ধীরে অনৈক্য ও বিভেদ-বোধকেও ঘনীভূত করে তোলে এই ইঙ্গিতই তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথও স্বদেশের শিক্ষাচর্চায় ইতিহাস-অনুশীলনের বিকৃতিকে জাতির হীনমন্যতার মুখ্য কারণ বলে মনে করেছেন। পাশ্চাত্য-প্রণোদিত নঙাত্মক

দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমাদের বিদ্যাচর্চা এতখানি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল যে আমরা প্রাচীন ভারতের মননশীল রূপটিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলাম। প্রতীচ্য-প্ররোচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত বিলাসমত্ত, সম্ভোগসর্বস্ব, হিংসা-দ্বেষে আকীর্ণ, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত, বহিঃশত্রুর সংঘাতে বিখণ্ডিত ভারত-আলেখ্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বৃহৎ আকার পরিগ্রহ করেছিল। জ্ঞানতপস্বী শ্রেয়ঃসাধক স্বদেশের শ্লাঘ্য সত্য স্বরূপ নেপথ্যে চলে গিয়েছিল। স্বদেশের সমগ্র অতীত হীনতা-মণ্ডিত ও দীনতা-সর্বস্ব হয়ে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমে স্থান পেয়েছিল। এ শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল জাতির নৈতিক নিঃস্বতা। রবীন্দ্রনাথ ভারতইতিহাসের তাৎপর্য আলোচনায় এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্ত করিয়া পরীক্ষা দিই তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনীমাত্র।"

—'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ইতিহাস, পৃ—১, ১ম সং।

".........বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নহিলে সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল।.........

"আমরা ভারতবর্ষের আগাছা পরগাছা নহি, বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক্ সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুকবর্গই যেন সব।

"নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব। এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না, ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না এবং এখন আমাদিগকে অশন-বসন আচার-ব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।"

—'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ইতিহাস, পৃ—২-৩, ১ম সং।

স্বদেশের ইতিহাস-বিকৃতি তথা শিক্ষার এই নেতিমূলকতার অন্যতম প্রধান

কারণ ছিল শিক্ষাবিষয়ে আমাদের পরাধীনতা। ভারত যখন ইংরেজের অধীন ছিল তখন রাষ্ট্রব্যাপারে যেমন তাকে ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছিল, শিক্ষা-বিষয়েও তেমনি সম্পূর্ণ ইংরেজের খুশি ও বদান্যতার উপরেই নির্ভর করে থাকতে হত। এ হচ্ছে জাতির বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের পরাধীনতা। শিক্ষাবিষয়ে এই পরমুখাপেক্ষিতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সোচ্চার হয়েছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান দাবি। সেই সূত্রে শিক্ষাকে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির যান্ত্রিক অনুসৃতি থেকে মুক্ত করে আমাদের জাতীয় আদর্শ ও পদ্ধতির অনুগ করবার প্রস্তাবও তাঁরা বারবার উত্থাপন করেছিলেন। জাতীয় পদ্ধতিতে জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তবেই সে শিক্ষা স্বচ্ছন্দে জাতির চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে উঠবে, এই কথাটাই তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন। তাই শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর অন্তরের সম্পদ্ করে তুলতে হলে শিক্ষার স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে তার প্রাথমিক সর্ত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন:

শিক্ষায় স্বরাজ চাই

"The ideal therefore is that *we must have the whole education of our country, spiritual and secular, in our own hands, and it must be on national lines, through national methods as far as practical.*"

—'The future of India', Complete Works, ৩য় খণ্ড, পৃ—৩০২।

রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন:

"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে-কথা বলাই বাহুল্য।......আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এদেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন **বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।**"

—'শিক্ষাসংস্কার'। শিক্ষা।

স্বাধীন শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়া মনের স্বাধীন বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতা শুধু দাস সৃষ্টি করে, স্বাধীন চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করে না। চিন্তার স্বাধীনতা অর্জন না করলে ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যায়। তাই বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিষয়ে পরানুগত্যের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন সর্বাগ্রে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে গৌরববোধ।

প্রাচীন ভারতের চিন্তা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উভয়ে যে আন্তরিক গৌরববোধ করতেন তা আমরা সকলেই জানি। সেই সূত্রে সনাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিও তাঁরা অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনজীবন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গুরুগৃহে শিক্ষালাভ প্রভৃতি আদর্শ তাঁদিকে কতোখানি গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল সে সম্পর্কে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা ছিল তা আমাদের বর্তমান শিক্ষাধারায় আবার ফিরে আসুক, তাঁরা বারবার এই কামনা প্রকাশ করেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাধারার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্তমান প্রাচ্য-জীবনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উভয়ের সম্যক্ সচেতনতার পরিচয়ও আমরা পূর্বেই পেয়েছি। জীবনধারণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আধিভৌতিক বিদ্যার যে একটি বিশেষ সার্থকতা আছে, এ সত্য তাঁরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের বিচারবোধ ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির নবোজ্জীবনে ইংরেজি শিক্ষার দান তাঁরা বিস্মৃত হন নি। তাই শিক্ষাবিষয়ে ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাকে ধিক্কৃত করলেও ইংরেজি শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চাকে উভয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

পূর্বপশ্চিমের শিক্ষার মিলন

পারস্পরিক পরিপূরকতা তথা মানুষের সম্মুখবর্তী ইতিহাসের পরিপূর্ণতার প্রয়োজনে পূর্ব-পশ্চিমের শিক্ষার মিলন ঘটানোর আবশ্য-কতা দুজনেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।—এই সূত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ‘বিদ্যাসমবায়ে’ ব্রতী হবার জন্যে তাঁরা সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্য জীবনে 'ব্যাবহারিক বিদ্যা'র দীনতা এবং সেই বিদ্যাচর্চ্চার আত্যন্তিক বাস্তব প্রয়োজনীয়তার দিকটি উভয় চিন্তানায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিদ্যা শুধু জ্ঞানের সম্পত্তি হয়ে থাকলে চলবে না, তাকে কর্মে রূপ দিতে হবে। শিক্ষার এই সৃষ্টিরূপটিকে উপলব্ধি না করলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

ব্যাবহারিক বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি

বিবেকানন্দ এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাঁর "The education that India needs" নামক পত্র-প্রবন্ধটি (১৮৯৭) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই ব্যাবহারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে তিনি কতখানি আগ্রহী ও তৎপর ছিলেন তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি লিখছেন :

"Two centres have recently been started in Madras and Calcutta, there is hope of more soon......*Gradually in these main centres will be taught agriculture, industry etc., and workshops will be established for the furtherance of arts. To sell the manufactures of those workshops in Europe and America, associations will be started like those already in existence. It will be necessary to start centres for women, exactly like those for men.*"

—'Complete Works', চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৪১৮।

বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে কত বিরাট এবং দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি সুদূরপ্রসারী ছিল তা উপরের উদ্ধৃত পত্রাংশটি থেকে খানিকটা বোঝা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন, এক গৈরিকধারী সংসারত্যাগী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী উনিশ শতকের শেষপাদে দাঁড়িয়ে স্বদেশের শিল্পসমৃদ্ধির পরিকল্পনা করেই নিবৃত্ত হন নি, সেই শিল্পদ্রব্য একদিন ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার অধিকার করবে, এ স্বপ্নও দেখেছিলেন। বিদেশী-শাসন-মুক্ত অগণিত পরিকল্পনা-সজ্জিত স্বদেশের বুকে দণ্ডায়মান হয়ে আজ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের তৃতীয় দশকে মহাকাশ-জয়ের যুগে আমরা কতটুকু বেশি স্বপ্ন দেখতে সমর্থ হয়েছি, কতখানিই বা সেই সন্ন্যাসীর স্বপ্নকে বাস্তবে সার্থক করে তুলতে পেরেছি, এ সম্বন্ধে আমাদের আত্মানুসন্ধানের বোধহয় প্রয়োজন আছে। লক্ষ করবার বিষয়, বিবেকানন্দ ব্যাবহারিক বিদ্যাকে শুধু পুরুষদের অধিকারের মধ্যে আদৌ সীমাবদ্ধ করে

রাখতে চান নি; মেয়েদিকেও সে কর্মযজ্ঞে আহ্বান করেছিলেন। নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রসার সম্পর্কে বিবেকানন্দ অথবা রবীন্দ্রনাথ কি পরিমাণে সজাগ ছিলেন তা আমরা উভয়ের সমাজ-চিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই দেখেছি।

শ্রীনিকেতন

ব্যাবহারিক বিদ্যাকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ যে কতোখানি আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব পরিচয় বহন করছে শ্রীনিকেতন শিক্ষাকেন্দ্র। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি শিল্পানুশীলন ও ব্যাবহারিক বিদ্যাকে গ্রামীণ সমষ্টিজীবনের বৃত্তিচর্চার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষার জ্ঞানরূপ ও কর্মরূপের সমন্বয় চাই

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি অনুসরণ করলে দেখা যায়, উভয়ে জাতির সর্বাঙ্গীণ জাগরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে শিক্ষাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনায় একদিকে যেমন তাঁরা জ্ঞানের উন্মেষের উপর জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি কর্মশক্তির উদ্বোধনকেও উপেক্ষা করেন নি। শিক্ষার জ্ঞানরূপ ও কর্মরূপের ভারসাম্য-রক্ষা ও উভয়ের সুসংহত সমন্বয়ের দ্বারা তাঁরা শিক্ষার্থীর সৃষ্টিমুখী প্রবণতাটিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চলিত ভাষার সপক্ষে

ষষ্ঠ অধ্যায়

চলিত ভাষার সপক্ষে

বাঙ্‌লা গদ্যে সাধুরীতির একচেটিয়া প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় সরব আন্দোলনের পথিকৃৎ ও নেতা হিসেবে প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল একটি স্মরণীয় নাম। বাঙ্‌লা সাধু গদ্যভঙ্গির কৃত্রিমতা ও সংস্কৃতানুগত্যের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু চিত্তের বিমুখতা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভ থেকেই কিছু পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছিল—অনেক সাহিত্যসমালোচক এই রকম মত প্রকাশ করেছেন। রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রবর্তিত 'মাসিক পত্র' (১৮৫৪)-এর গদ্যভঙ্গিকে তার প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঐ পত্রিকাতেই প্যারীচাঁদের টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লেখা চলিত গদ্যভঙ্গি-আশ্রয়ী 'আলালের ঘরের দুলাল' (মাসিক পত্রে বাং ১২৬১ সাল থেকে প্রকাশিত ; পুস্তকাকারে ১৮৫৮ খ্রীঃ) গ্রন্থের নক্‌শা-চিত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। প্যারীচাঁদের প্রয়াস ও উদ্দেশ্যের অধিকতর সিদ্ধি ঘটেছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সায়' (১৮৬২ খ্রীঃ, প্রথমভাগ, প্রথম প্রকাশ)। শুধু ব্যঙ্গ-ধর্মী সমকালীন বাস্তব সমাজচিত্রের দলিল হিসেবে কালীপ্রসন্নের রচনা উল্লেখ্য নয়, তার গদ্যরূপ কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষাকেই সার্থকতর ভাবে আশ্রয় করতে পেরেছিল। চলিত বাঙ্‌লার বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি গ্রন্থটির অনেক স্থলে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস' (আধুনিক পর্যায়, প্রথম সং,) গ্রন্থে স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন "এদিক থেকে বীরবলী বাক্‌-রীতির পূর্বসূরিতা দাবি করতে পারে হুতোম" (পৃ—১০০)। কিন্তু সাধু গদ্যরূপের পাশে বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব সৃষ্টির বিচ্ছিন্ন চেষ্টা ছাড়া এগুলিকে আর কিছু বলা চলে কি-না তা সতর্কভাবে বিবেচ্য। প্যারীচাঁদ তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল-'এর ভাষায় কিছু প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করলেও তাঁর পরবর্তী রচনাবলী অর্থাৎ 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫, ঈশ্বর-উপনিষদাদি বিষয়ক আলোচনা) ইত্যাদি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় অথবা 'বামারঞ্জিকা'

প্রমথচৌধুরীর বহুস্বীকৃত নেতৃত্ব

প্যারীচাঁদ

হুতোম বীরবলী বাক্‌রীতির পূর্বসূরী

(১৮৬০), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) প্রভৃতি কথোপকথন ও গল্প-মূলক নীতিবিষয়ক লেখায় একই আঙ্গিককে অনুসরণ করতে পারেন নি। কালীপ্রসন্নের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তাঁর 'বঙ্গেশবিজয়' উপন্যাসে হুতোমী ভাষার সাক্ষাৎ মেলে না। আসল কথা প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন তাঁদের আলালী ও হুতোমী ভাষার মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির একটা চেষ্টা করে গেছেন। চলিত ভাষার আঙ্গিক তাঁদের ঐ দুই রচনার বিষয়বস্তু ও ব্যঙ্গধর্মী মনোভাবের আনুকূল্য করবে মনে করেই হয়তো তাঁরা ঐ দুই গ্রন্থে নূতন পরীক্ষানিরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু লঘু-গুরু বিষয়বস্তু নির্বিশেষে চলিত ভাষা প্রয়োগ-প্রয়াসের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রত্যয়-নির্ভর পরিকল্পনা অবশ্যই তাঁদের ছিল না। তাঁদের পরবর্তী রচনাবলী তার সাক্ষ্য বহন করছে। বাঙ্‌লা গদ্য এরূপ ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষার উপযোগী পরিণতি তখনও লাভ করেছিল কি-না সে বিষয়েও অবশ্য সংশয়ের অবসর আছে। যাই হোক্, প্যারীচাঁদ অথবা কালীপ্রসন্নের প্রচেষ্টা নূতনত্বের সন্ধান করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের প্রয়াসকে 'সাধুরীতির গদ্যরচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করা চলে কি-না তা ভেবে দেখবার বিষয়। বাঙ্‌লা সাহিত্যের কোনো কোনো ইতিহাস-রচয়িতা এ বিষয়ে বোধ হয় এই দুটি রচনাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন।

প্যারীচাঁদ ও কালী-প্রসন্ন-এর প্রয়াসের ঐতিহাসিক মূল্য

চলিত ভাষা-রূপকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৭৮ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে লেখা শুরু, 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ; ১৮৮১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ)। "বাঙ্‌লা চল্‌তি ভাষার সহজ প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে অভ্রান্তভাবে বিদ্যমান আছে।"—প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা' গ্রন্থের এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েও বলা চলে যে, চিঠির ভাষা বলেই রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকতা রক্ষার প্রয়োজনে সেই পর্যায়ে এই রচনায় চলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের সময় এই পত্র-প্রবন্ধের ভূমিকাটি কিন্তু তিনি সাধু ভাষাতেই লিখেছিলেন এবং মূল রচনার চলিত ভাষারূপের জন্যে ভূমিকায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

চলিত ভাষা সাধনায় রবীন্দ্রনাথ

"আমার মতে, যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখি এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহার চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"

'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র'-এর ভূমিকা

যে ভাষায় নক্‌শা লেখা উচিত বলে মনে হয়েছিল সেই ভাষায় প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন নক্‌শা রচনা করেছিলেন। প্রায় একই মনোভাব থেকে, যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত বলে ভেবেছিলেন সেই ভাষায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' লিখেছিলেন। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী'-র ভাষা-নির্বাচনের পশ্চাতেও ঐ একই বোধ কাজ করেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনে চলিতভাষার যোগ্যতা-নিরূপণের কথা অথবা এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রত্যয় বা সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে লেখনী-চালনার কথা তখনও বিন্দুমাত্র কারও মনে উদিত হয় নি। অবশ্য গদ্য স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন প্রতিভাবান রচয়িতার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে ধীরে ধীরে মার্জিত, সরল, সহজবোধ্য ও সাবলীল হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং সাহিত্যধর্মী চলিত গদ্য-আঙ্গিকের উদ্ভবের ক্ষেত্র এইভাবেই প্রস্তুত হয়ে চলেছিল।

চলিতভাষা-আন্দোলনে প্রমথচৌধুরী

সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় থেকে আত্মপ্রকাশের বাহন হিসেবে চলিত গদ্য-রীতিকে আশ্রয় করা, এবং শুধু আশ্রয় নয়, কৃত্রিম সাধু গদ্যাঙ্গিক অর্থাৎ বাবু বাঙ্‌লাকে বিতাড়িত করে চলিত গদ্য-রূপকে রঞ্জন ও মননধর্মী উভয় শ্রেণীর রচনায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তীক্ষ্ণ সচেতন লেখনীচালনা এবং সক্রিয় আন্দোলনের সূচনা করার কৃতিত্ব প্রধানতঃ প্রমথ চৌধুরীর, এ তথ্য বহুপ্রচারিত ও প্রায় সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথও সচেতনভাবে বিষয়বস্তু-নির্বিশেষে চলিত ভাষাকে তাঁর গদ্যের বাহন করে তুলেছেন 'সবুজপত্র'-এর যুগে। তারপর থেকে কাহিনী-সাহিত্যে ও প্রবন্ধে এ রীতি অবারিতভাবে অনুসৃত হয়েছে।

'সবুজপত্র'

বাঙ্‌লা ১৩২১ সালের বৈশাখ থেকে 'সবুজপত্র'-এর প্রকাশ শুরু। এর পূর্বে লেখা প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের সংখ্যা অল্প হলেও বাঙ্‌লা গদ্য রচনায় সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার যে যুদ্ধে চলিত ভাষার পক্ষের নেতা হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর বাঙ্‌লা দেশে সব-

চেয়ে বেশি পরিচয়, তার দু-একটি প্রবন্ধ এ সময়ের পূর্বে রচিত। এর মধ্যে 'কথার কথা' বাঙ্‌লা ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গভাষা বনাম বাবুবাঙ্‌লা ওরফে সাধুভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা'র প্রকাশ ১৩১৯ সালের শেষের দিকে 'ভারতী'তে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সাধুভাষার একাধিপত্য ও তার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রথম সক্রিয়ভাবে লেখনী চালনাকরেছেন বাঙ্‌লা ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। তারপর তাঁর বিদ্রোহ আবার প্রত্যক্ষ আক্রমণাত্মক লেখায় রূপ পরিগ্রহ করেছে আরও প্রায় দশ বছরেরও বেশি ব্যবধানে।

চলিত ভাষারীতির সপক্ষে আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরীর পূর্বসূরি

বাঙ্‌লা গদ্যে সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতি-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরীর সক্রিয় সচেতন নেতৃত্বের অপরিসীম মূল্য সম্পর্কে এবং পরবর্তীকালের বাঙ্‌লা গদ্যের উপর তাঁর সুদূর-প্রসারী প্রভাব সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সমপরিমাণ গুরুত্বের সঙ্গে এই সত্যটিকেও ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে আমাদিকে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর পূর্বে অন্ততঃ আর একজন ব্যক্তি বাঙ্‌লা ভাষায় চলিতরীতি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ও বাস্তবে আশ্চর্য গতিশীল বলিষ্ঠ ওজস্বী অথচ প্রসাদগুণ-সম্পন্ন ভাষার অননুকরণীয় বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত চলিত রীতিকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কালের দিক্ দিয়ে বিচার করলে এ বিষয়ে তাঁকে প্রমথ চৌধুরীর পুরোধার সম্মান না দিয়ে উপায় নেই।—বলা বাহুল্য, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অথচ তিনি ব্যাবহারিক অর্থে সাহিত্যসাধক অথবা প্রত্যক্ষতঃ ভাষা-সমালোচক ছিলেন না। সংস্কারের প্রয়োজনে, অধ্যাত্মজ্ঞানকে প্রাকৃতজনের অধিকারের বস্তু করবার জন্যে এবং সর্বোপরি অধঃপতিত স্বদেশ ও স্বজাতিকে জ্ঞানে ও কর্মে হীনতার পঙ্কশয্যা থেকে টেনে তুলে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করবার ঐকান্তিক সাধনায় তাঁকে ভাষণে এবং লেখনীধারণে তৎপর হতে হয়েছিল এবং বোধহয় এই বাস্তব প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তাঁকে শ্রোতা ও পাঠকের অন্তরে তাঁর ভাবনাকে গ্রথিত করে দেবার জন্যে তাদের মুখের কথাকে আশ্রয় করে মনের অন্দরমহলে প্রবেশের পথ খুঁজতে হয়েছিল। জনতার মুখের কথার মধ্যদিয়েই বক্তব্যকে তাদের প্রাণে সবচেয়ে সহজে পৌছে দেওয়া সম্ভব, এই সত্যটি তাঁর অবিদিত ছিল না।

এখন ভাষায় সাধু ও চলিতরীতির সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি আনুপূর্বিক বিচার করে দেখা যেতে পারে। স্বামীজীর প্রেরণায় বাঙ্‌লা ১৩০৫ সালের পয়লা মাঘ পাক্ষিক পত্ররূপে 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর অন্তরে এই পত্রিকা-প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—ভাষা সাহিত্য দর্শন কবিতা শিল্প সকল বিষয়ে একটা গঠনমূলক আদর্শ প্রচার করা (স্বামী-শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, পৃ—১৯০, সং ৬)। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ১৩০৬ সালের আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে বেলুড় মঠ থেকে যাত্রা করে স্বামীজী ইংলণ্ড হয়ে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি আমেরিকা পৌঁছে ফাল্গুনের প্রথম দিকে বাঙ্‌লা ভাষা সম্বন্ধে তদানীন্তন 'উদ্বোধন' সম্পাদক গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে যে পত্র লেখেন তা ১৩০৬ সালের ১৫ চৈত্রের 'উদ্বোধন' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পত্রটি 'ভাববার কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পত্রটির অংশবিশেষ উল্লেখ করলে সাধু-চলিতের দ্বন্দ্বে বিবেকানন্দের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

ভাষায় সাধু ও চলিত-রীতি সম্পর্কে বিবেকানন্দ

'ভাববার কথা'

"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃত, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরের কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি—কিম্ভূত কিমাকার—উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না। সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈয়ারি ভাষা কোনোও কালে হবে

না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।"

"যদি বল ও কথা কেন; তবে বাঙ্লা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব পশ্চিমে যেদিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়; তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখতে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিম ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ এক কলকেতার ভাষাই রাখবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছ যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্লা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকে জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে……।

"এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনোও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চল্‌তি কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দুহাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই……।"

বাঙ্লা ভাষায় নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করবার সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয় বিবেকানন্দ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে বিবৃত তাঁর কিছু উক্তি উল্লেখ-যোগ্য:

……বাঙ্লা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাঙ্লা লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশি ভার্বস্ ইউজ্ করে; তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে ভার্ব-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার

বেশি জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপ লিখতে চেষ্টা কর দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি। ভাষার ভিতর ভার্বগুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস্? ঐরূপ ভাবের পোজ্ বা বিরাম দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্ন মাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয় যেন ভাষার দম নাই। সেজন্য বাঙ্লা ভাষায় ভালো লেকচার করা যায় না। ভাষার উপর যার কনট্রোল আছে, সে অত শীগ্গীর শীগ্গীর ভাব থামিয়ে ফেলে না।......"

—স্বামিশিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, সং—৬, পৃ—১৫৭।

'উদ্বোধন' প্রথম সংখ্যা বের হবার কিছুদিন পর বিবেকানন্দ শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে যা বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

স্বামীজী। এই পত্রের ভাব ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব ত সব্বাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙ্লা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন ভার্ব ইউজ্ কল্লে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে ভার্বের ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর। আমায় দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি।

—স্বামিশিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, সং ৬, পৃ—১০৬।

বিবেকানন্দ জনমানসে শ্রেয়ঃভাব ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সেই ভাব-প্রকাশের উপযোগী শক্তিশালী উপযুক্ত ভাষা-বাহনটিকে উদ্ভাবন করতে কতখানি সচেষ্ট হয়েছিলেন তা এইসব উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাছাড়া চলিত ভাষাকে বিষয়বস্তু-নির্বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও জটিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন করে তোলবার প্রয়োজনীয়তাটি উপলব্ধি করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, এ বিষয়ে চলিত ভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেমেছিলেন এবং এই আন্দোলনের পুরোধাঃরূপে তাঁর আবির্ভাব প্রমথ চৌধুরীর অনেক পূর্বেই ঘটেছিল। কিন্তু এতো গেল স্বামীজীর মতামত ও তাঁর ভাষা-আন্দোলনের কথা। এ বিষয়ে তিনি নিজে বাস্তবে তাঁর রচনাদির মধ্যে কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছেন তাও দেখা উচিত।

চলিতভাষাকে বিষয়বস্তু-নির্বিশেষে আলোচনার বাহন করতে হবে

স্বামীজীর মৌলিক বাঙ্লা গদ্যরচনা তিন খানি পুস্তক ও কতকগুলি

প্রবন্ধ। অবশ্য তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে অনেকগুলি তিনি বাঙ্‌লায় লিখেছিলেন।

স্বামীজীর বাঙ্‌লা রচনাবলী

পুস্তকগুলি ধারাবাহিকভাবে উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলিও অধিকাংশই উদ্বোধনের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর মূল বাঙ্‌লা রচনাগুলি প্রথম প্রকাশের তারিখ ও তাদের ভাষারূপের উপর নির্ভর করে নিম্নলিখিতভাবে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে :

প্রথম প্রকাশ তারিখ (বাঙ্‌লা)	রচনা	ভাষা
১২৯১।৯২ সাল (১৮৮৪।৮৫ খ্রীঃ) বলে অনুমিত	'শিক্ষা'গ্রন্থ—হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন্,—ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল, মরাল এণ্ড ফিজিক্যাল'-এর স্বাধীন অনুবাদ	সাধু
১২৯৩ সাল (১৮৮৬ খ্রীঃ)—	'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থের ভূমিকা	সাধু
'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' পত্রিকায় ছয়টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত (১২৯৬ সাল)	'ঈশানুসরণ' ('অফ্ দি ইমিটেশন্ অফ্ ক্রাইস্ট'-এর অনুবাদ—মূল রচনা টমাস্-আ-কেম্পিসের নামে প্রচলিত।)	সাধু
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত (১৩০৪ সাল)	'হিন্দুধর্ম কি' ('ভাববার কথা' পুস্তকে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে অঙ্গীভূত)	সাধু
উদ্বোধন ১৩০৫ মাঘ—১	প্রস্তাবনা (উদ্বোধনের)	সাধু
উদ্বোধন ১৩০৫ ফাল্গুন—১	জ্ঞানার্জন	সাধু
উদ্বোধন ১৩০৫ চৈত্র—১	রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি	সাধু
উদ্বোধন ১৩০৫ চৈত্র—১৫	বর্তমান ভারত	সাধু
উদ্বোধন ১৩০৬ শ্রাবণ—১৫	ভাববার কথা	চলিত
উদ্বোধন ১৩০৬ ভাদ্র—১	বিলাতযাত্রীর পত্র	চলিত
উদ্বোধন ১৩০৬ চৈত্র—১৫	বাঙ্‌লা ভাষা	চলিত
উদ্বোধন ১৩০৭ আষাঢ়—১৫	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য	চলিত

এগুলি ছাড়া,

১৩০৯ শিবের ভূত চলিত
(মৃত্যুর পর এই অসমাপ্ত
গল্প-কাহিনী তাঁর ঘরের
কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত)

'বিলাতযাত্রীর পত্র' পরে পুস্তকাকারে 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' এই তিনখানি পুস্তকের মধ্যে 'বর্তমান ভারত' সাধু ও অপর দুটি চলিত ভাষায় লেখা। এই তিনখানি ছাড়া বাকি সব লেখাগুলো একত্র করে 'ভাববার কথা' পুস্তক সম্পাদিত হয়েছে।

উপরের তালিকা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, **'ভাববার কথা' প্রবন্ধের পর থেকে সমস্ত লেখাই বিবেকানন্দ চলিত ভাষায় লিখেছিলেন। ঠিক্ কোন্ তারিখে কোন্ লেখাটি লিখিত হয়েছিল তা একেবারে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়তো সম্ভব নয়। তবে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের তারিখটিকেই যদি তাঁর লেখার তারিখ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, বাঙ্‌লা ১৩০৫ সনের পর থেকে তিনি সব লেখাই চলিত ভাষায় লিখেছেন।** 'উদ্বোধন' সম্পাদককে লেখা 'বাঙ্‌লা ভাষা' পত্রে তিনি যে-ভাবে চল্‌তি ভাষার উপর জোর দিয়েছেন, কাজেও তিনি নিজে সেইরূপই করেছেন।

সতর্কভাবে বিচার করলে স্বামীজীর ভাষাভঙ্গির মোটামুটি তিনটি প্রধান ধারা আমরা দেখতে পাই।

১) **১৩০৪ সালের পূর্বে লেখা**—যেমন 'ঈশা-অনুসরণ' (১২৯৬) অতি সুন্দর প্রাঞ্জল সাধু গদ্যে রচিত।

২) **১৩০৪।৫ সালে লেখা**—১৩০৩ সালের শেষের দিকে স্বামীজী এমেরিকা থেকে প্রথমবার ভারতে ফিরে আসেন। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি তখন বক্তৃতা করেছিলেন। বাঙ্‌লা দেশে মাতৃভাষায় বক্তৃতা করবার ইচ্ছা তাঁর মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। **বাঙ্‌লা ভাষায় ওজস্বিতার অভাব** যে তিনি অনুভব করেছিলেন, এ তথ্য তাঁর পূর্বে উদ্ধৃত কতকগুলি উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মধুসূদন একদা বীররসাত্মক কাব্য

রচনা করতে গিয়ে ললিত কোমলকান্ত পদাবলীর আধার বাঙ্‌লা ভাষার লালিত্য-সর্বস্বতা ও অপরিসীম মসৃণতা নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন এবং সেই ভাষার মধ্যে বলিষ্ঠতা আনয়ন করবার জন্যে সাহিত্য-দর্পণকার আলঙ্কারিকাগ্রগণ্য বিশ্বনাথের উপদেশ অনুসারে অপ্রচলিত কঠিন অনমনীয় শব্দাবলীর প্রয়োগে ভাষার মধ্যে আত্যন্তিক 'দুঃশ্রবত্ব' সঞ্চার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ; কারণ অধিক 'দুঃশ্রবত্ব' সাধারণ অবস্থায় কাব্যভাষার দোষ ও রসপরিণতির বাধাস্বরূপ বলে বিবেচিত হলেও "রৌদ্রাদৌতু রসে অত্যন্তং দুশ্রবত্বং গুণো ভবেৎ"। টীকাকার বলেছেন "আদিশব্দাৎ বীরবিভৎসয়োগ্রর্হণম্", অর্থাৎ সহজ কথায় রৌদ্র, বীর, বিভৎস প্রভৃতি রসে অধিক দুঃশ্রবত্ব ভাষার গুণ রূপে দেখা দিতে পারে, কারণ ভাষার কাঠিন্য রসপরিণতির সহায়করূপে দেখা দেয়।

ভাষায় ওজঃশক্তি সঞ্চারের চেষ্টা

বিবেকানন্দও সম্ভবতঃ একই কারণে বাঙ্‌লা গদ্যকে জোরালো করে তুলতে চেয়েছিলেন। যে ভাষায় তিনি জাতির সর্বাঙ্গীণ জাগরণ-মন্ত্র বীরবাণী উচ্চারণ করে জাতিকে বহু যুগের আলস্য, পরনির্ভরতা, দাসত্ব, ভীরুতা ও তামসিকতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই ভাষাকে ঐ অভয় আহ্বানের বাহন হবার মতো শক্তিমান করে তোলবার দায়িত্বও তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। তারই অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে ক্রিয়া পদের স্থানে বিশেষণ ব্যবহার করে ভাষায় জোর আনবার পরিকল্পনার কথা তিনি শিষ্যকে পত্রে লিখেছিলেন। ১৩০৪ সাল থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সাধু-চলিত নির্বিশেষে ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য সাধ্যমতো রক্ষা করতে চেষ্টা করেন।

৩) **১৩০৬ সাল থেকে অবশিষ্টকাল তিনি চলিত ভাষাতেই প্রবন্ধাদি লিখেছেন।** এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়। চলিত ভাষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ তাঁর সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে কি ১৩০৫ সালের পূর্বে পৌছোন নি অথবা এ সম্বন্ধে কি এতদ্‌পূর্বে তিনি কোনো চিন্তা করেন নি ? ১৩০৫ পর্যন্ত তিনি সাধু ভাষায় লিখেছেন। তাই ১৩০৬ সনের পূর্বে সাধু-চলিত সমস্যা নিয়ে তিনি কোনো চিন্তা করেছিলেন কি না অথবা চিন্তা করলেও কোনো সুনির্দিষ্ট প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন কি না তা নিরূপণ করা কঠিন। তবে চলিতভাষা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব

১৩০৬-এর পূর্বে আনুকূল্যপূর্ণ ছিল, এরকম সম্ভাবনার সত্যতাকে স্বীকার করলেও, এ কথা মানতেই হবে যে, দেশের লোকের মানসিক অবস্থাই হোক্ অথবা যাদের জন্যে সংস্কার, আকস্মিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তাদের আত্যন্তিক প্রতিকূল মনোভাবের কথা চিন্তা করেই হোক্, বিবেকানন্দ বাস্তবে ১৩০৬-এর পূর্বে চলিত ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনায় হাত দেন নি। তাঁর আশঙ্কা কতখানি সত্য ছিল পরবর্তী ঘটনা তার প্রমাণ। বিবেকানন্দের 'বিলাতযাত্রীর পত্র' অর্থাৎ 'পরিব্রাজক' উদ্বোধনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ লাভ করবার পর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে এর ভাষা সম্পর্কে বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। —স্বামী প্রেমঘনানন্দ তাঁর 'স্বামীজীর বাঙ্‌লা রচনা' প্রবন্ধে ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনের 'উদ্বোধনে' এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

স্বামীজীর ভাষা-আন্দোলন বিরুদ্ধতার সম্মুখীন

"স্বামীজীর পরিব্রাজক অতি সুন্দর জোরালো চল্‌তি ভাষায় লেখা। চল্‌তি ভাষা লিখে বর্তমানে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন তাঁরাও স্বামীজীর প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার এই লেখা পড়ে আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। কিন্তু ১৩০৬ সালের পয়লা ভাদ্র থেকে 'পরিব্রাজক' 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হবার পর তদানীন্তন বাঙ্‌লা সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়। দেশের অবস্থা বিবেচনা করে হয়তো সেজন্যই স্বামীজী তাঁর পরবর্তী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও সংস্কৃতমূলক করেছিলেন।"

—উদ্বোধন। ৪০শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃ—৮৫।

যাঁরা সংস্কারক, সংস্কারের অন্তিম সাফল্যের জন্যেই তাঁদিকে জনসাধারণের মন বুঝে সংস্কার-কর্মের গতির তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে হয়। অবশ্য 'পরিব্রাজক'-এর ভাষা সম্পর্কে সমসাময়িক পাঠকদের প্রতিকূল মনোভাবকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'-এর ভাষা অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর হওয়ার একমাত্র অথবা অবিসম্বাদিত কারণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি না তাও বিবেচ্য। 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'-এর বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি ও বাক্‌বিস্তার-রীতির বিভিন্নতা ঐ দুই রচনার ভাষা-রূপের পার্থক্যকে সুনিশ্চিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য, ভাষায় গাম্ভীর্যের ইতরবিশেষ হলেও উভয় রচনাই চলিত রীতিতে লেখা।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি-সীমান্তে কোনো কোনো বাঙালি চিন্তাশীল

ব্যক্তির চিত্তে চলিত ভাষার শক্তি ও অধিকার সম্পর্কে যে কিছু কিছু অনুকূল মনোভাব জাগ্রত হতে শুরু করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাঙ্‌লা ১৩০৬ সালের বৈশাখের চার-তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাতে সভাপতি (রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্‌লা ভাষা সংস্কার, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা প্রভৃতি বিষয়ে যে সুচিন্তিত ভাষণটি পাঠ করেছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে এই অনুকূল মনোভাবের ইশারা মিলবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে চলিত ভাষার অধিকার সম্পর্কে চিন্তা

"বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞ লোকের কার্য; যেহেতু সেগুলা প্রকৃতপক্ষেই সংস্কৃতের সন্তানসন্ততি।...... স্থল বিশেষে সাধু ভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্যপ্রকাশের পক্ষে বেশি কার্যকরী হয়।"

—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬, সংখ্যা ২।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত; সভাপতি বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, কারণ তিনি তাদিকে সংস্কৃতের বংশধর বলে মনে করেছেন। তাছাড়া চলিত ভাষায় মন্তব্য-প্রকাশের কার্যকারিতা স্থলবিশেষে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু স্থলনির্বিশেষে চলিত ভাষা-রূপের স্বনির্ভর মর্যাদা এখানে স্বীকৃতি লাভ করেনি।

এ ধরণের ক্ষীণ অস্পষ্ট মূল্যস্বীকৃতির পটভূমিকায় সমসাময়িক কালে বিবেকানন্দের এ সম্বন্ধে দৃষ্টি অনেক পরিণত, দ্বিধাহীন ও স্বচ্ছ। তিনি তাঁর 'বাঙ্‌লাভাষা' পত্রে (১৩০৬) যে মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে সংশয়ের বাষ্পটুকুও নেই। তিনি চলিত ভাষার শক্তি, অকৃত্রিমতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টি ও অলৌকিক প্রতিভাবলে যে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা অবিচলিত বিশ্বাসে সর্বসমক্ষে ঘোষণাও করেছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্তকে সেই মুহূর্ত থেকে কাজে রূপ দানকরতে ব্রতী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে প্রথম নেতৃত্বের গৌরব বিবেকানন্দের। —**উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যন্তে বাঙ্‌লা চলিত গদ্যরূপকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সক্রিয় আন্দোলনে প্রথম পথপ্রদর্শকের গৌরব যে এক গৈরিকধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর**

চলিতভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রথম পথিকৃৎ বিবেকানন্দ

প্রাপ্য তা এই প্রবন্ধের তথ্যনির্ভর আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী সেই আন্দোলনের উত্তরসুরি। তাঁর সতর্ক সপ্রতিভ অথচ আক্রমণাত্মক শাণিত ক্ষুরধার লেখনী মননধর্মিতায় ব্যঙ্গে বিদ্রূপে এই আন্দোলনকে প্রাগ্রসর করে ভাবী-কালের গদ্যরূপকল্পের উপর তার সুদূরচারী গভীর প্রভাবকে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত করে দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী বিবেকানন্দের উত্তরসাধক

চলিতভাষার শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তাঁর মত অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এবার এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি বলেন দেখা যাক্ঃ

"………সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্‌লার একটা প্রভেদ এই যে, বাঙ্‌লায় প্রায় সর্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার কথা। অথচ সাধু বাঙ্‌লা ভাষার ছন্দে একে দুই মাত্রা বলে ধরা হয়। অর্থাৎ কলা এবং ফল বাঙ্‌লা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপ বাঙ্‌লা সাধু ছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি-উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণে বাধা পায় না বলে পরবর্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়ে তাকে ধাক্কা দেয় ও বাজিয়ে তোলে। 'করিতেছি' শব্দটা ভোঁতা। ওতে কোনো স্বর বাজে না; কিন্তু 'কর্‌চি' শব্দে একটা স্বর আছে। 'যাহা হইবার তাহা হইবে' এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলে; সেইজন্যে এর অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় 'যা হবার তাই হবে' তখন 'হবার' হসন্ত 'র' 'তাই' শব্দের উপর আছাড় খেয়ে একটা জোর জাগিয়ে তোলে; তখন ওর নাকি স্বর ঘুচে গিয়ে ওর থেকে একটা 'মরিয়া' ভাবের আওয়াজ বেরোয়। বাঙ্‌লার হসন্ত-বর্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটা সোটা গোলগাল, চর্বির স্তরে তার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে, এবং তার চিক্কণতা যতই থাক, তার জোর অতি অল্পই।

চলিতভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ

"কিন্তু বাঙ্‌লার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা—এবং তার চেহারা বলে একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নি। কিন্তু তাই বলে অসাধু

ভাষা যে বাসায় গিয়ে মরে আছে তা নয়। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবির গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাঙ্‌লা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করে ছেয়ে রেখেছে। ছাপার কালীর তিলক পরে সে ভদ্র সাহিত্যসভায় মোড়লি করে বেড়াতে পারে না। কিন্তু তার কণ্ঠে গান থামে নি, তার বাঁশের বাঁশি বাজছেই। সেই সব মেঠো গানের ঝরণার তলায় ভাষার হসন্ত শব্দগুলো নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়ে ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ করছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নেই ;...............

".........সংস্কৃত ভাষার জরিজহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দু হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা বধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়ে গেছে, তার কালো চোখের কটাক্ষে যে কতো তীক্ষ্ণতা তা আমরা ভুলে গেছি। আমি তার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার কিছু সাধনা করেছি, তাতে সাধু লোকেরা ছি ছি করেছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলটা দেখে তার দর যাচাই করুক ; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তার চেয়ে অনেক বেশি ; সে যে বিনা মূল্যের ধন, সে ভট্‌চাজ পাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।"

—ছন্দ। সং ১, পৃ—২০৯-২১৩।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সাধুভাষার আড়ম্বরের জড়তার মধ্যে জোরের অভাবটাই বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথেরও মনোযোগিতা আকর্ষণ করেছিল এবং চল্‌তি ভাষারূপের মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষিত জোরকে তিনিও খুঁজে পেয়েছিলেন।

———

সপ্তম অধ্যায়

কর্মনায়ক

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বদেশে

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তাঁদের বাণীতে পুনঃ পুনঃ কর্মের আহ্বান ধ্বনিত হতে শুনেছি। তাঁরা অনুভব করেছিলেন, আদর্শ শুধু ঔপপত্তিকতার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তার কোনো বাস্তব মূল্য নেই। অথচ এটাই ঘটে সবচেয়ে বেশি। আদর্শের বিবৃতি, আলোচনা অথবা শাস্ত্রীয় ভাবনার অভাব নেই। অবশ্য অনেক আবর্জনা ও আগাছায় কোনো কোনো সময়ে তা আকীর্ণ হয়ে পড়ে তাতে সন্দেহ নেই। তবু স্বীকার করতে হয়, অনেক ধ্রুব চিন্তাই পরিপূরক আন্তরিক অকপট কর্মচেষ্টার শীর্ণতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। যে আদর্শ কর্মে রূপ পায় না তার সার্থকতার দাবি বড়ো ক্ষীণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

"ভাব যেখানে কেবলই ভাব মাত্র, কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে—সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না।"

—'জাতীয় বিদ্যালয়'। শিক্ষা।

আদর্শের কর্মরূপ

চিন্তানায়কের সঙ্গে কর্মবীরের মিলন ঘটলেই ইতিহাসের বুকে বৃহৎ ভাব রূপ হয়ে ধরা দেয়, প্রত্যক্ষতঃ যা স্বপ্নের আকাশকুসুম তা কর্মোদ্যোগের ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, বাস্তবের ফল হয়ে শোভা পায় ;—ভাব যেখানে কাজে রূপ পরিগ্রহ করে সেখানেই তার পূর্ণতা।

উভয় চিন্তানায়ক তাই আদর্শের উচ্চ মিনারে অবস্থান করে বাণী বিতরণ করেই নিশ্চিন্ত থাকেন নি, কর্মের প্রান্তরে নেমে এসে সাধ্য ও বিশ্বাসমতো নিজেদের চিন্তাকে ব্যাবহারিক জীবনে বাস্তবে আকার দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই চেষ্টাকে সমষ্টি-জীবনে সঞ্চারিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। দুজনের এই কর্মী-রূপটির মূল বৈশিষ্ট্যটুকু চিনে না রাখলে তাঁদের চিন্তার পরিপূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয় ; কারণ ব্যক্তিত্বের বিচারেও চিন্তা ও কর্ম পরস্পরের পরিপূরক, এই দুই মিলিয়েই পরিচয়ের সম্পূর্ণতা।

সংগঠন

স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে আমরা উভয়কে সংগঠন-প্রয়াসের উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে দেখেছি। স্বদেশের সঙ্ঘশক্তিকে দুজনে গড়বার কাজে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন।

কর্মনায়ক বিবেকানন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের মানুষকে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের পথে অগ্রণী হতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। চিন্তায় ও কর্মে দেশবাসী স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক, এই ঐকান্তিক কামনা পোষণ করতে গিয়ে তিনি যে শিক্ষা-বিস্তারকে প্রয়োজনীয়তার বিচারে অগ্রাধিকার দান করেছেন, তা আমরা দেখেছি।

কর্মনায়ক বিবেকানন্দ

কিন্তু প্রধানতঃ শিক্ষার উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি সর্বাগ্রে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হল দেশের দারিদ্র্য। দরিদ্র দেশে শিক্ষা-প্রচারের যে-সকল অসুবিধা সেগুলি-সম্পর্কে তিনি সম্যক্‌ভাবে অবহিত হয়েছিলেন। বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন তা নিম্নের উদ্ধৃত নির্দেশ থেকে কিছুটা বোঝা যাবে :

শিক্ষাব্রত

শিক্ষাপরিকল্পনা

"*The poverty in India is such, that the poor boys would rather go to help their fathers in the fields, or otherwise try to make a living, than come to school.*

"..............*If the poor boys cannot come to education, education must go to him.* There are thousands of single-minded, self-sacrificing sannyasins in our country, going from village to village teaching religion. If some of them can be organized as *teachers of secular things also*, they will go from place to place, from door to door, *not only preaching but teaching also.* Suppose two of these men go to a village in the evening with a *camera*, a *globe*, some *maps* etc. They can teach a great deal of *astronomy and geography to the ignorant. By telling stories of different nations, they can give the poor a hundred times more information through the ear than they can get in a lifetime through books.* This requires an organization."

—'Our duty to the *masses*', Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৩০৯।

"Try to get up a fund, *buy some magic-lanterns, maps, globes etc., and some chemicals.* Get every evening a *crowd of the poor and low, even the Pariahs,* and lecture to them about religion first, and then *teach them through the magic-lantern and other things, astronomy, geography etc., in the dialect of the people.* Train up a band of fiery young men."

— ৮নং পত্র। Complete Works, পঞ্চম খণ্ড, পৃ—২৯।

শিক্ষাকে প্রাত্যহিক ব্যবহারের পরিচিত মুখের ভাষায় অস্পৃশ্য ব্রাত্যদেরও মনের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহই উদ্ধৃত উক্তিগুলিতে উজ্জ্বল অক্ষরে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথও স্বদেশের সংগঠনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে নানাভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ একসময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গানে, বক্তৃতায় দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সেদিনের 'বঙ্গদর্শন'-এ তাঁর বাণীর খর দীপ্তি ঝলসে উঠেছিল বিদেশী রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। কর্মী রবীন্দ্রনাথের এটিও একটি রূপ তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কবি যে দীর্ঘদিন নিজেকে এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাখতে পারেন নি, এ তথ্য সুপরিজ্ঞাত। তাঁর নিত্যধর্মবোধকে বারবার আঘাত করেছিল সেদিনের উচ্ছ্বাস-সর্বস্বতা। কল্পনায় স্বদেশের যে আদর্শ রূপ কবি দেখেছিলেন তার সঙ্গে সেদিনের অন্ধ আবেগের তিনি কোনো রকমেই সামঞ্জস্য আনতে পারেন নি। 'ভাবোন্মাদমত্ততায়' তাঁর মঙ্গলবোধ পুনঃ পুনঃ আহত হয়েছে ; তাই সকল নিন্দাবিদ্রূপ সহ্য করেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল।

স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথ

সেদিনের উচ্ছ্বাসের মুখে লোকে বর্জন-নীতিটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিল, ভাঙার কথাটাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। কবি বর্জন-নীতির প্রতিবাদ করে স্বদেশবাসীকে অর্জনের দিকে মুখ ফেরাতে বললেন ;—সংগঠনশক্তির বিকাশ ব্যতীত দেশের দুর্দশা দূর হবে না, এই কথাটাই সেদিন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হল। 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪, জুলাই—২২) ভাষণে তিনি গ্রামকেই সমাজের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করে গ্রামের সঙ্ঘশক্তি-জাগরণের মধ্যেই স্বরাজসাধনার মূল নিহিত, এই সত্যটি সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি সকলকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, পল্লীসংগঠন ও গ্রামো-

ভোগই জাতিগঠনের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু সে-ডাকে সেদিন সাড়া দেবার মতো লোক ছিল খুবই কম। দেশ তখন আবেগের জোয়ারে ভেসে চলেছিল। কবির আহ্বান কারও কানে পৌঁছালো না।—ঝুনো রাজনীতিবিদ্‌রা তাকে কবি-কল্পনা বলে উপেক্ষা করেই ক্ষান্ত হলেন না; উপরন্তু সে ডাক তিরস্কার ও বিদ্রূপের বিষয় হয়ে উঠল।

কবির পরিকল্পিত গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি যখন কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরীক্ষা করতে অগ্রসর হল না, তখন তিনি স্বয়ং সেই কর্মে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি কবি, কবির কাজ করেছিলেন কবিতা আর গান লিখে; তিনি মনীষী, মনীষীর কাজ করেছিলেন আদর্শ প্রচার করে; তিনি কর্মনায়ক, কর্মীর কাজ করেছিলেন আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে।

নগরের 'জনসংঘাতমদিরা'র সম্মোহনী আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি নেপথ্যে আপনাকে অপসৃত করলেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি বিদ্যালয়ের উন্নতিতে মন দিলেন, তাঁর নিজের জমিদারিতে গঠন-মূলক কর্মে আপন সাধ্য ও বুদ্ধিমতো শক্তি প্রয়োগ করলেন।

সে যুগে ধনীর সন্তানেরা বিলাত যেতেন,—মেধাবী হলে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নেরা ব্যারিষ্টার হবার জন্যে। মধ্যবিত্তেরা জাপান যেতেন বিস্কুট, সাবান, কালি প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালী শিখতে। রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সন্তোষ চন্দ্রকে আমেরিকায় পাঠালেন কৃষি ও গো-পালন প্রভৃতি শিক্ষার জন্যে (১৯০৬)। কিছু কাল পরে কনিষ্ঠ জামাতাকেও একই উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠান। 'স্বদেশী সমাজ'-এর চিন্তাকে কাজে রূপ দেওয়ার ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই এগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য তাঁর কল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবে সর্বথা সাফল্য লাভ করে নি, তা বলাই বাহুল্য।

বর্জননীতি

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্র ধরে বিদেশী কাপড় বয়কট হয়েছিল, কিন্তু দেশী কাপড় কোথায়? বর্জননীতির দ্বারা জাতির নগ্নতা দূর হবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহ-যোগিতায় **কুষ্ঠিয়ায় বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।**

বয়নবিদ্যালয়

আপন জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সংঘ-কর্ম ও সঞ্চয়-অভ্যাস শিক্ষা দেবার জন্যে কবি **সমবায় ব্যাঙ্ক** স্থাপন করেছিলেন, সেই ব্যাঙ্কই **'পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক'** নামে পরিচিত হয়েছিল। এছাড়া কৃষক প্রজাদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে স্থাপন করা হয়েছিল **লোকসভা**।

কর্মনায়ক রবীন্দ্রনাথ—লোকসভা

কবি সমবায়-প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলবার এবং পল্লীর সাধারণ মানুষকে ব্যাবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তোলবার বিষয়ে কতখানি উৎসাহী ও তৎপর ছিলেন তা তাঁর নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটি থেকে কিছুটা বোঝা যাবে। পত্রটি তিনি কলকাতায় পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন। তিনি লিখছেন :

"বোলপুরে একটি ধানভানা কল চলচে—সেই রকম একটা কল এখানে আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এদেশ ধানের দেশ—বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা ৫৷১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথেষ্ট সূত্রপাত হতে পারবে। আমাদের ব্যাঙ্ক (পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক) থেকে ধার দিয়ে এই ধানভানার ব্যবসাটা এখানে সহজেই চালানো যেতে পারে।......... এই কলের সন্ধান দেখিস্।

সমবায় প্রথা

"তারপর এখানে চাষাদের কোন্ 'ইন্‌ডাষ্ট্রি' শেখানো যেতে পারে সেই কথাই ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস্—অর্থাৎ ছোটোখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ-কাজ সম্ভবপর কি না।......আর একটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে-রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলেছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোক টিনের ছাদ দিতে চায়, পেরে ওঠে না—খোলা পেলে সুবিধা হয়। যাই হোক্, ধানভানা

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

কল, Pottery-র চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস্—ভুলিস্‌নে।"

—চিঠিপত্র ২য় খণ্ড, পৃ—১৯-২০

এই Cottage industry-কে কেন্দ্র করে গ্রামের সমবায়শক্তিকে জাগ্রত করে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যগ্রতার পরিচয়টি এখানে সুপরিস্ফুট। 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে তাঁর এ ভাবনা ব্যাপক তাৎপর্য লাভ করেছিল।

কবি স্বদেশবাসীকে আত্মশক্তির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তায় ও কর্মে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্যে পুনঃপুনঃ আহ্বান জানিয়েছিলেন।

শিক্ষাব্রত ও সংগঠন

শান্তিনিকেতন আশ্রমে আদর্শ শিক্ষায়তনপ্রতিষ্ঠা, সমবায়ের ভিত্তিতে পল্লী-বাসীদের স্বাবলম্বী করে তোলবার চেষ্টা, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, শ্রীনিকেতনে ব্যাবহারিক বিদ্যা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মের মধ্যে কবির সেই প্রয়াসেরই পরিচয় মেলে। জ্ঞানে ও কর্মে সংগঠনধর্মী-মনোভাবাশ্রয়ী আদর্শ মানুষ গড়ে তোলাই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মনায়ক রবীন্দ্র-নাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার এই সত্যটির সম্মুখীন

জনগণের আন্তরিক ঐক্য

হয়েছিলেন যে, জনগণের মধ্যে আন্তরিক সেতুবন্ধনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে, কারণ দেশবাসীর অন্তরের ঐক্য না আসলে তাদের দ্বারা সমবেত সংহত ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে কোনো কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়; এবং আঘাতসহ স্থায়ী আন্তরিক ঐক্যের সেতু জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া স্থাপিত হতে পারে না।

ঔপপত্তিক ও ব্যাব-হারিক শিক্ষার সম্মিলন

তাই উভয়েই যুগপৎ ঔপপত্তিক ও ব্যাবহারিক বিদ্যানুশীলনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

কারিগরি বিদ্যা, কুটির শিল্প প্রভৃতির প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার জন্যে বিবেকানন্দের আগ্রহের কথা আমরা জানি। কলকাতা ও মাদ্রাজে প্রথমে

বিবেকানন্দের পরি-কল্পনার সুদূরপ্রসারিতা

তিনি দুটি কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অনুরূপ কেন্দ্র সমগ্র ভারতের গ্রামে ও নগরে স্থাপন করবার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তিনি তখন থেকেই পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে 'The education that India needs' নামক পত্র-প্রবন্ধটি স্মরণ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের প্রয়াস সুদূরপ্রসারী হলেও তাঁর অকালতিরোধনের জন্যে সে প্রচেষ্টা যথাযথ ফল দর্শাতে পারে নি।

বিবেকানন্দ মঠ ও সন্ন্যাসাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে অজস্র প্রতিকূলতা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও কতকগুলি আদর্শবাদী উৎসাহী যুবককে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করে তুলেছিলেন সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে কতকগুলি নিঃস্বার্থ সর্বত্যাগী কর্মযোগীকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টাই ছিল সেখানে মুখ্য লক্ষ্য। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার এই নবীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কর্মের একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে নেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছিল।

ব্যাবহারিক বিদ্যা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। বিবেকানন্দের মতো সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এ ধরণের বিরাট কোনো প্রয়াসে তিনি ব্রতী হন নি। রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ তাঁর জমিদারির ক্ষুদ্র পরিধিটুকুর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অবশ্য শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রামোন্নয়ন, ব্যাবহারিক বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির একটি স্থায়ী কেন্দ্রের পত্তন করেছিলেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম দিকে গুটিকতক এদেশী ছেলেকে প্রাচীন ভারতীয় তপোবন-আদর্শে মানুষ করে তোলবার চেষ্টাই লক্ষ করা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন আশ্রম তার এই সঙ্কীর্ণ রূপটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। সময়ের সঙ্গে কবির দৃষ্টি যতো প্রসারিত হয়েছে, আশ্রমের উদ্দেশ্যের পরিধিও ক্রমে ততোই বিস্তৃতি লাভ করেছে। অবশেষে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' একদিন 'বিশ্বভারতী'র রূপ পরিগ্রহ করে সমগ্র বিশ্বের বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনমন্ত্র উচ্চারণ করেছে।

কর্মনায়ক বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্ম-পন্থার বৈষম্য।

একথা স্বীকার করতেই হবে, স্বদেশের সংগঠন-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যতোখানি পরিধি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্রের পরিধি তার চেয়ে অনেক গুণ বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দের কর্মশক্তির একটা বড়ো অংশ ব্যয় হতো হিন্দুধর্মের প্রচার ও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায়। বিবেকানন্দ যেখানে ধর্মপ্রচারক, সংঘস্রষ্টা, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতা, সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত প্রচণ্ড বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতো সম্প্রদায়গঠনের চেষ্টা কখনো করেন নি। যুবকদিকে ত্যাগব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে মনীষী কবি নানাভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং জাতির তরুণ সম্প্রদায়কে সংযতচরিত্র ও আদর্শবাদী করে

গড়ে তোলবার সাধ্যমতো চেষ্টাও তিনি করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু, সংসারত্যাগী কৃচ্ছ্রব্রতী কোনো সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সংগঠনের সংকল্প তাঁর আদৌ ছিল না। পাশ্চাত্ত্যের উপর ধর্ম-বিজয়ের (Religious Conquest) কোনো পরিকল্পনাও কখনো তাঁর মনে সামান্যতম স্থান লাভ করে নি। এ ধরণের চিন্তা বা প্রয়াস কবির চরিত্র ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কর্মক্ষেত্রের বিস্তার, দৃষ্টিভঙ্গি ও অবলম্বিত পথ অনেকাংশে বিভিন্ন হলেও কর্মসাধনার মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মনায়ক বিবেকানন্দ ও

লক্ষ্যের অভিন্নতা

রবীন্দ্রনাথ সম্মুখে অভিন্ন লক্ষ্য স্থির রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশকে গড়ে তোলার প্রয়োজনে শুধু জ্ঞানের সূত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও দেশবাসী যাতে নিজেদের অন্তরের যোগটি উপলব্ধি করতে পারে এই চেষ্টাই ছিল উভয়ের স্বদেশ-সাধনার পুরোভাগে। ভাবে ও কাজে দেশের মানুষ যেন নিজেদের সংযোগ-সেতুটিকে আবিষ্কার করতে পারে,—এই উদ্দেশ্যে দুজনেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদেশে

এ সত্য স্বতঃই প্রতীয়মান যে, শুধু স্বদেশ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে বিচার করলে কর্মনায়ক বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্মের সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন ও যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন সম্ভব নয়; কারণ উভয়ের কর্মক্ষেত্র স্বদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর সম্প্রসারিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ একাধিকবার (১৮৯৩-৯৬, ১৮৯৯-১৯০০) আমেরিকা ও য়ুরোপের দেশ সমূহে প্রাচ্যের বার্তা বহন করে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্বভ্রমণের অবসর ও সুযোগসুবিধা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন অনেক বেশি। দীর্ঘ জীবন, আর্থিক সচ্ছলতা ও অন্যান্য সকল-রকম অনুকূলতা তাঁকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ১৮৭৮ ও ১৮৯০ এর শিক্ষা উপলক্ষে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের য়ুরোপ ভ্রমণের কথা ছেড়ে দিলেও ১৯১২ থেকে শুরু করে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি বহুবার আমেরিকা, য়ুরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শেষ য়ুরোপ ভ্রমণ। তারপরেও অবশ্য ১৯৩২ সালে ইরাণ, ইরাক এবং ১৯৩৪ সালে সিংহল ভ্রমণের সুযোগ তিনি ছাড়েন নি। এই ভ্রমণগুলির সবকটি স্বাভাবিকভাবেই সমান তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এর মধ্যে ১৯১২, ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২৪, ১৯২৬ অথবা ১৯৩০ সালের বিদেশযাত্রা কর্মী ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের জীবনে সামগ্রিক বিচারে যতোখানি গুরুত্ব অর্জন করেছে অন্যান্য গুলি হয়তো ততোখানি করেনি। চিন্তা ও কর্মজীবনের তাৎপর্যবোধে এই বিশ্বপরিক্রমাগুলির মূল্য অনস্বীকার্য।

বিদেশ ভ্রমণের গুরুত্ব

বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ভ্রমণকে কতকাংশে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল, প্রত্যক্ষ ইতিহাসের পটভূমিকায় এ সত্যটিকে অস্বীকার করা যায় না। চিন্তা ও আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সেগুলিকে বাস্তবে স্থায়ী রূপ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে উভয়ে বক্তৃতার সাহায্যে বিদেশে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন, এরকম দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। স্বদেশের সংগঠনকর্ম তথা মানবকল্যাণমূলক কাজের জন্যে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যে অর্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর 'বিশ্বভারতী' ও 'শ্রীনিকেতন'-এর প্রয়োজনে একই প্রয়াসে ব্রতী হতে দেখা গেছে। কিন্তু দুই বিশ্ব-পথিকের বিদেশপরিক্রমার তাৎপর্য অনুধাবনে এই দিকটি

বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য

মোটেই মুখ্য নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের দানপ্রতিদানের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্থায়ী ফলশ্রুতির বিচারে বিবেকানন্দ অথবা রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-পরিক্রমার পশ্চাতে কোনো বৈষয়িক বা ঔপকরণিক প্রয়োজনের তাগিদ যে একান্ত গৌণ ব্যাপার একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। পরন্তু, পাশ্চাত্ত্যের দ্বারে প্রাচ্যের চিত্তদূত হিসেবে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের চিত্তসম্মিলনের সেতুরচনায় উভয়ের ভূমিকাটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ সত্য রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। প্রতীচ্যলোকে তাঁরা অবিসংবাদিতভাবে সত্যতম অর্থে ভারতবর্ষের 'greatest and noblest ambassador' রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন।

পূর্ব ও পশ্চিমের আদানপ্রদানের ব্রত

বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচারণার মৌলিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী। একটি বিদেশের কাছে স্বদেশের বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়া, অপরটি স্বদেশের কাছে বিদেশের বার্তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসা; তাঁরা বস্তুভারজর্জরিত পাশ্চাত্ত্যে গিয়ে প্রাচ্যের ত্যাগ ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রচার করেছেন, এবং প্রাচ্যে ফিরে এসে স্থাবর সমাজের অচলায়তনে পাশ্চাত্ত্যের গতিচাঞ্চল্য এবং কর্মের উন্মাদনা সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছেন। 'পূর্বের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে পূর্বে দেওয়ার-নেওয়ার' পথ-রচনার প্রয়াসকে উভয়ে জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সেতুবন্ধনের সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে রাজা রামমোহনের সার্থকতম উত্তরসূরি। এ বিষয়ে রাজা রামমোহনের প্রয়াস উনিশ শতকের সমাপ্তিপর্বে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে উপযুক্ত আধার খুঁজে পেয়েছিল।—বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মকে আশ্রয় করে সে প্রচেষ্টা যুগপৎ ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করেছিল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেতুবন্ধন

যে পাশ্চাত্ত্য বস্তুসর্বস্বতার চাপে পিষ্ট, সঞ্চয়ের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত সম্প্রসারণের উন্মাদনায় অস্থির, তার দ্বারে তিনি করাঘাত করেছিলেন বেদান্তের বাণী নিয়ে। আধ্যাত্মিক চিন্তার অনুষঙ্গে সহিষ্ণুতা ও পরের স্বাধীন চিন্তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির শিক্ষাটিকেও তিনি প্রতীচ্যে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ও প্রথমতম সুযোগে ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রাচ্যের সেই বার্তাটি পরম বিশ্বাসে উচ্চারণ করেছিলেন।

প্রাচ্যের বেদান্তধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের স্বাধীন সমাজব্যবস্থাকে সম্মিলিত করবার একটা সজীব ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁর কথায় নানা সময়ে বার বার কেমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা তাঁর সমাজচিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই লক্ষ করেছি।

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে বলেছেন :

"অল্পদিন পূর্বে বাঙ্‌লা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

—'পূর্ব ও পশ্চিম'। সমাজ।

বিবেকানন্দের সমন্বয়প্রচেষ্টা সম্বন্ধে মনীষী রোমাঁ রোলাঁর সুপরিচিত উক্তিটিকে আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে :

"......The older he grew, the deeper was his conviction that the East and West must espouse each other. He saw in India and Europe 'two organisms in full youth,......two great experiments neither of which is yet complete'. They ought to be mutually helpful, but at the same time each should respect the full development of the other."

—'The second journey to the West',
The Life of Vivekananda and the Universal Gospel,
সং ১, পৃ—১৭২।

কিন্তু এই **সমন্বয়-সাধক বিবেকানন্দই** বিবেকানন্দের সবটুকু অথবা একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর আরও একটি সত্তা ছিল, যেখানে তিনি **ধর্মবিজেতা**। ধর্মের ভিত্তিতে পাশ্চাত্ত্যকে জয় করতে হবে, একথা তিনি অনেক সময় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন এবং তদনুসারে কর্মেও ব্রতী হয়েছেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড বৈষম্যই চোখে পড়বে।

ধর্মবিজেতা বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ বলেছেন :

"Conquest of England, Europe and America—this should be our one supreme Mantra at present, in it lies the well-being of the country. Expansion is the sign of life and we must spread over the world with our spiritual ideas."

—'The education that India needs',
Complete Works, চতুর্থ খণ্ড, পৃ—৪১৯।

"......There have been great conquering races in the world. *We also have been great conquerers. The story of our own conquest has been described by that noble Emperor of India, Asoka as the conquest of religion and spirituality. Once more the world must be conquered by India.*"

—'The work before us', Complete Works,
৩য় খণ্ড, পৃ—২৭৬।

বিবেকানন্দের পরিকল্পিত ধর্মবিজয়ের তাৎপর্য

দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যের উপর প্রাচ্যের ধর্মবিজয় কামনা করেছিলেন। এই বিজয় বলতে তিনি প্রধানতঃ বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বের উপর আধ্যাত্মিক জগতের জয়লাভকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেইটুকুই সব নয়। বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য-বিজয়-প্রয়াসকে প্রাচ্যে মিশনারি ধর্মপ্রচারকদের ধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা প্রবল তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মিশনারিরা এদেশে যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, তারই পাল্টা জবাব দেবার জন্যে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যে বেদান্তধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, —এরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন এবং সে ধারণা অনেকাংশে সত্য বলেই মনে হয়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় এ প্রসঙ্গে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্‌লায় উনবিংশ শতাব্দী' গ্রন্থে লিখেছেন :

মিশনারিদের এদেশে ধর্ম-প্রচার প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া

"স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই ধারা (মিশনারিদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা) এক অতি ভীষণ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এক প্রচণ্ড বিরুদ্ধ ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল। খ্রীষ্টান জাতিদিগের মধ্যে স্বামীজীর হিন্দুধর্ম প্রচারই এই প্রতিক্রিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংস্কার-যুগের, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে ইহা এক প্রবল

পাল্টা জবাব। তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বাজাত্যাভিমান এ অংশে পরিপূর্ণরূপে দেদীপ্যমান। স্বামীজীর অদ্বৈতবাদপ্রচারকেও আমরা এই ধারার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি।"

শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ প্রতীচ্য তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে হিন্দুধর্মের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন (১৮৯৩)। মুখ্যতঃ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার উদ্দেশ্যেই তিনি পাশ্চাত্ত্যের দেশসমূহে স্বপ্রতিষ্ঠিত মঠ বা মিশনের শাখা-কেন্দ্র স্থাপন করতে যত্নবান হয়েছিলেন। বিদেশে অনেকে তাঁর কাছে বেদান্তধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর একদল পাশ্চাত্ত্য শিষ্যও গঠিত হয়ে উঠেছিল। অনুগামী সন্ন্যাসী শিষ্যদের স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় বিশিষ্ট ধর্মাদর্শ প্রচার করবার কাজে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন ও নানাভাবে এই ব্রতে তাদিকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছিলেন।

বিবেকানন্দ যেখানে ধর্মবিজেতা বা সংঘগুরু, সেখানে তাঁর কর্মধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কর্মধারার দুস্তর ব্যবধান, এমনকি ঘোর বিরোধ বললেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন না, গুরুর মন্ত্রগ্রাহী শিষ্যও ছিলেন না। অবশ্য প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, তপোবনজীবন অথবা শিক্ষাগুরু সম্পর্কে এবং শিক্ষাগুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের নিবিড়তা সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা যে কতখানি গভীর ছিল, সে পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। গুরুবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল মনোভাব সুবিদিত। তিনি সন্ন্যাসী নন, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ও গঠন করেন নি। কোনো রকম ধর্মবিজয়ের পরিকল্পনা তাঁর মনে কখনো স্থান পায়নি, কারণ এ ধরণের প্রয়াস কবির স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সকল সংস্কৃতির প্রতি বিদগ্ধজনোচিত শ্রদ্ধা রক্ষা করেই তিনি পরিতৃপ্ত।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্মধারার পার্থক্য ও ঐক্য

কিন্তু বিবেকানন্দের মঠ বা সন্ন্যাসী-সংঘ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ধর্মপ্রচারটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মনে করলে ভুল হবে ও বিবেকানন্দের প্রয়াসকেও একান্ত সঙ্কীর্ণ করে দেখা হবে। বিভিন্ন সমষ্টিকল্যাণকর্ম, সংগঠনপরিকল্পনা, শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি যে কর্মীদের কাজের অঙ্গ হিসেবে সুনির্দিষ্ট হয়েছিল তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের বিদেশে প্রতিষ্ঠিত শাখা-কেন্দ্রগুলির মূল্য কম নয়; তাছাড়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির সম্মিলন-সংঘটনে,—দুইপক্ষের ভাবের আদান-প্রদানের

পথ সরলতর করে তাদের আন্তরিক সমন্বয়-প্রতিষ্ঠার নীতি ও প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সর্বথা স্বীকৃত। এই দিক্‌ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের চিত্তের মিলন-সেতু রচনায় সংগঠনটির একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এই মিলনসাধনার ব্রত-উদ্‌যাপনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সুদূরবিস্তারী। এ প্রসঙ্গে তাঁর কোনো কোনো বিদেশ-পর্যটনের তাৎপর্যও অনুধাবনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণের মধ্যে ১৯১২ সালের য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ এবং ১৯১৬ সালের জাপান-মার্কিন মুল্লুক ভ্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমবার তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন 'গীতাঞ্জলি' ;—এর মধ্য দিয়ে, ভারতীয় সাধনায় আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের লীলার যে নিগূঢ় তত্ত্বটি রয়েছে সেটিকে ছন্দে গেঁথে তিনি কর্মভারাক্রান্ত য়ুরোপের সামনে তুলে ধরলেন। তাছাড়া 'সাধনা' বক্তৃতামালার সাহায্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কাছে তিনি ভারতীয় ঔপনিষদ-চিন্তাধারাকে পরিচিত করে তুলতে চাইলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনসাধনায় রবীন্দ্রনাথ

'সাধনা' বক্তৃতামালা

দ্বিতীয়বার তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন পাশ্চাত্ত্যের উগ্র জাতীয়তাবাদের মৃত্যুবাণ। ন্যাশন্যালিজমের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা সমস্ত বিশ্বের মঙ্গলবোধকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল ; কবি তাই তার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন তাঁর 'ন্যাশন্যালিজম্‌'-গ্রন্থের বক্তৃতাগুলির মধ্যে। আবার অন্যদিকে 'পার্সন্যালিটি' গ্রন্থের বক্তৃতাগুলিতে তিনি আত্মবোধ ও বিশ্ববোধকে পরিপূর্ণ জীবনদর্শনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ১৯১২ ও ১৯১৬ সালের বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও তার সার্থকতা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

'ন্যাসন্যালিজম্‌' ও 'পার্সন্যালিটি'

"এইবারের (১৯১৬ সালের) পূর্ববারে (১৯১২ সালে) রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে গিয়াছিলেন, তখন তিনি 'তীর্থযাত্রী'র মতো গিয়াছিলেন এবং সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন 'গীতাঞ্জলি' এবং গীতাঞ্জলি বলিতে যে বস্তু বুঝায়। ভগবানের সহিত আত্মার লীলার যে একটি দিক্‌ আছে, প্রকৃতিতে, জীবনে ও সামাজিক নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে লীলার বিচিত্র প্রকাশ এবং যে লীলাতত্ত্ব ভারতবর্ষের অনেক কালের সাধনার ফল,—সেবারে সেই বস্তুটিকে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র ভিতর দিয়া পশ্চিমে

ব্রজেনশীলের ব্যাখ্যা

লইয়া গেলেন। ইউরোপের সমস্যাপ্রপীড়িত, ব্যস্ততাসঙ্কুল ব্যক্তিজীবনে যে শান্তিরসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তিনি সেখানে তাহারই উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন কি? সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন একটা বড়ো অশান্তি, একটা ঝঞ্ঝাবাত, একটা storm and stress (struym and drang), যাহা আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, যে সকল অর্থহীন সামাজিক নিগড় ব্যক্তিকে ক্রমাগত সংকুচিত করিয়া বিশ্বমানবের দিকে তাহার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করিতেছে, সতেজে সংগ্রাম করিয়া সে-সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া ব্যক্তিকে মুক্তিরপথে বাহির হইতে হইবে; সেই উন্মুক্ত মার্গের সন্দেশ তিনি সমুদ্রপথ বাহিয়া আনিয়াছেন। এভাব পূর্বে তাঁহার রচনায় সৌন্দর্যানুভূতি ও রসানুভূতির দিক্ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল বটে কিন্তু সম্প্রতি যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তির সহিত সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ভাবটিকে অবতরণ করাইয়া এবং তাহাকে রক্তমাংসে সজীব করিয়া, জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া, আমাদের সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্বের সহিত বর্তমানের এইখানে পার্থক্য।

'সবুজপত্র'-এর মধ্যে বিবৃত ভাবধারায় যৌবনের পূজায় পাশ্চাত্ত্য অনুপ্রেরণা

"তারপরে এবার (১৯১৬) যে তিনি জাপানে ও আমেরিকায় গেলেন, এবারেও তিনি ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমের জন্য একটা বড়ো message লইয়া গেলেন। পশ্চিম মহাদেশে সমাজের যতো কিছু সমস্যা জমিয়া উঠিয়াছে, যথা capital and labour problem (ধন ও শ্রম সমস্যা), state and individual problem (রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সমস্যা), international problem (আন্তর্জাতিক সমস্যা) ইত্যাদি সে-সমস্ত ঘনীভূত রূপ (concentrated form) লাভ করিয়াছে তাঁহার এবারকার বাণীটিতে। সে-সকল প্রচণ্ড সমস্যার আঘাতে ইউরোপীয় সমাজ আজ একেবারে বিধ্বস্ত ও অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের সাধন, জীবন ও কাল্চারের আদর্শ হইতে তাহার জন্য তিনি শান্তিবাণী লইয়া গেলেন। Cult of nationalism প্রবন্ধে সর্বাবরণ-মুক্ত মানবের যে vision বা আদর্শ তিনি ইউরোপের সম্মুখে ধরিয়াছেন, আমি তাহারই কথা বলিতেছি।......ন্যাশন্যালিজমের যে দিক্টা commercialism (বণিক্বৃত্তি), militarism (সৈনিকবৃত্তি) প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিকে মারিয়া বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, সেই ন্যাশন্যালিজম্ ব্যাধির ঔষধ

কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। দুইদিক্ হইতে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় তিনি বিবৃত করিয়াছেন :

"১। ব্যক্তির যে ব্যক্তি হিসাবে একটা অসীম মূল্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে,

"২। ন্যাশন্যাজিম্ যদি Internationalism বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে যায় তবে উহার বিশ্বমূল্য cosmic value নির্ধারণ ও নিরূপণ করিতে হইবে।

"সেবার 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি ওধারকার ব্যক্তিগত জীবনের unrest বা অশান্তি নিবারণার্থে এক শান্তিমন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গাহিলেন ভগবানের সহিত আত্মার লীলাতেই সেই শান্তি। আর এবার ওধারের সামাজিক জীবনে unrest বা অশান্তি নিবারণার্থে ভারতবর্ষের চিরসাধিত শান্তি ও মৈত্রীর রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন। সেবার ব্যক্তির নিত্যসহচর ভগবানকে দেখাইলেন আর এবার সমাজ-জীবনের নিত্যসহচর the Eternal Individual বা চিরন্তন ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা করিলেন।"

—'পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদানপ্রদান'। প্রবাসী, ১৩২৪ ভাদ্র।

পাশ্চাত্ত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা-বিক্ষুব্ধ জীবনে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছিল তার নিরাময়কল্পে ঋষি কবি যেমন সেখানে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী, তেমনি প্রাচ্যের আচার ও সংস্কার-জর্জরিত জীবনযাত্রার স্থবিরতা দূর করবার জন্যে তিনি পাশ্চাত্ত্য থেকে আবাহন করে নিয়ে এসেছিলেন নবযৌবনের গতিমুখরতা ও কর্মচাঞ্চল্যের বেগ। রবীন্দ্রনাথের প্রতীচী-পরিক্রমার মূলে সকলসময় প্রধানতঃ দুইপক্ষের এই দেওয়া-নেওয়ার ব্রত উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষাই কাজ করেছে।

পাশ্চাত্ত্যের বস্তু-তান্ত্রিকতা ও প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়সাধনা

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান পরিকল্পনা ছিল বিশ্বের সকল সংস্কৃতির একটি সাধারণ মিলনকেন্দ্র সংগঠন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমকে ধীরে ধীরে বিশ্বের বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বভারতী (যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্) রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর অঙ্গনে সর্বদেশের সবজাতির ভাবধারার সম্মিলন ঘটবে এই ছিল কবির স্বপ্ন। —১৯১৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহর থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা একখানি ব্যক্তিগত পত্রের

বিশ্বভারতী

মধ্যে (১৩২৩, কার্তিক—১০) এ কথাটি অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সর্বজাতির মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" —চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড।

ভাবতে ভালো লাগে যে, এ পত্র (যদিও অপ্রাসঙ্গিক ও একান্ত আকস্মিক যোগাযোগ, তবু) যে শিকাগো থেকে পুত্রকে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেই শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসভাতেই একদিন বিবেকানন্দ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বার্তা ঘোষণা করেছিলেন। কবির হৃদয়ের গূঢ় নেপথ্যে কি সেদিন ১৮৯৩-এর শিকাগোর বুকে দণ্ডায়মান এক তরুণ বীর সন্ন্যাসীর উদ্দীপ্ত স্মৃতি ছায়া ফেলেছিল? সেই সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরই কি অজ্ঞাতে তাঁর চিত্তে অনুরণিত হয়েছিল?

'সু-বাবুকে' লেখা একটি পত্রের মধ্যেও কবি অন্তর-লালিত এই ইচ্ছা ও ব্যগ্রতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐ একই আকাঙ্ক্ষা কবি বারবার ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বাঙ্‌লাদেশের একপ্রান্তে রুক্ষ-সবুজ আস্তরণে ঘেরা শান্তিনিকেতন আশ্রমের বুকে কবি বিশ্বকে আহ্বান জানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে আহ্বান বিফল হয় নি, তা আমরা জানি।

জগৎজয়ী ধর্মগুরু এবং বিশ্ববিজয়ী কবি—বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই 'বৃহত্তর ভারত' গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।—বিশ্বসভায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল উভয় সন্তানেরই গৌরবে।

বৃহত্তর ভারত

মনীষী বিনয়কুমার সরকার 'বৃহত্তর ভারত'কে 'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য' আখ্যা দিয়েছেন। এ নাম কিন্তু তিনি কোনো সংকীর্ণ বা পরিমিত অর্থে ব্যবহার করেন নি। 'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য' বলতে তিনি বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ভাবসাম্রাজ্যকে বুঝিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন:

রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য

"প্রাচীন ও মধ্য যুগের এশিয়ায় বৃহত্তর ভারত হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেটা মোটের উপর বৌদ্ধ-সংস্কৃতির সাম্রাজ্য বা বুদ্ধ-সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। কিন্তু সেই ভারতীয় সংস্কৃতির ভেতর সবই কি কাগজে-কলমে নাম-লেখানো বৌদ্ধ ছিল? না। সেই বৃহত্তর ভারতের অনেক কিছুই ছিল অবৌদ্ধ, যথা:—চরকের আয়ুর্বেদ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পাণিনির ব্যাকরণ, মনু, কালিদাস, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, শ্যাম, ইন্দোচীন, জাপান ইত্যাদি দেশের ভারতীয় সংস্কৃতি-গুলো খানিকটা বৌদ্ধ-হিন্দু, খানিকটা অবৌদ্ধ-হিন্দু। বৌদ্ধ সাম্রাজ্য বললে একমাত্র বৌদ্ধ 'ধর্মের' বিস্তার সাধন বুঝতে হবে না। বুঝতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্বিজয়। তার ভেতর অ-বৌদ্ধ এবং ধর্মছাড়া মাল অনেক।

"বর্তমান যুগের বৃহত্তর ভারতের বা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ভাব-সাম্রাজ্যের নাম দিয়েছি রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য। কিন্তু এ সাম্রাজ্যটা একমাত্র রামকৃষ্ণ-পন্থী গেরুয়াওয়ালাদের তৈরি নয়। এর ভেতর আছে হাজার হাজার গেরস্থ নরনারীর কৃতিত্ব। এর ভেতর বহু সংখ্যক অ-হিন্দুর কাজ। মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, পার্শী ইত্যাদি নানা ধর্মাবলম্বী ভারত-সন্তানের হাতে পায়ে এটা গড়া হচ্ছে। সে কালের ভারতীয় ধারাটা বজায় রাখবার জন্য বলছি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামে সাম্রাজ্য চালাচ্ছি। কিন্তু এর ভেতর ধর্মছাড়াও অনেক কিছুর দিগ্বিজয় আছে। অধিকন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দই এর সবকিছু নন।"

—বিনয় সরকারের বৈঠকে। পৃ—১২-১৩, সং ১।

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য স্থাপনে বিবেকানন্দের নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব এবং রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিনয়কুমার বললেন:

"......**এর নাম নয়া-স্বরাজসিদ্ধি। বাদামী-সাদায় সমতা-প্রতিষ্ঠা এই নবীনীকৃত উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতার আসল ভিত্তি ও লক্ষ্য। এশিয়ার সঙ্গে ইয়োরামেরিকার সমানে সমানে লেনদেনের কাজ শুরু হয়েছে বিবেকানন্দের দৌলতে (১৮৯৩)। বিবেকানন্দ আমার এই এশিয়ান্ মনরো-নীতির প্রবর্তক।** সেই সমানে সমানে লেনদেনের কাজ বেড়ে চলেছে—বহুসংখ্য অ-সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ভারতসন্তানের কৃতিত্বে। সেই কাজেই ব্রতবদ্ধ হয়েছে আবার আজকালকার মার্কিন বেদান্ত-সমিতি আর রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠানগুলো। স্বামীজীরা রাষ্ট্রনীতি এড়িয়ে চলেন বলাই বাহুল্য।........."

"………**রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের কর্মীরা সকলেই রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামীজী নন। বাইরের লোক আছে বহু সংখ্যক।** এই সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কর্মচারী, প্রচারক বা সেবকের অন্তরে অন্তরে একটা প্রবল দর্শন কাজ করে থাকে। এই দর্শনটা অনেকসময় হয়তো অজ্ঞাতসারেই কাজ করছে। **প্রাচ্যে-পাশ্চাত্ত্যে সমতা স্থাপন করা সকলেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।** এশিয়া হতে ইয়োরামেরিকার আধিপত্য তাড়িয়ে দেওয়া ঘটছে এঁদের প্রভাবে সর্বদাই অল্পবিস্তর। আর ইয়োরামেরিকায় এশিয়ার প্রভাব বাড়ানো তো যে-কোনো লোকই দেখতে পাচ্ছে।"

—বিনয় সরকারের বৈঠকে। পৃ—১৯২-১৯৩, ১ম সং।

দেখা যাচ্ছে, এই রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের কর্মীদের প্রধান চেষ্টা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে 'সমানে সমানে লেনদেনের' সম্বন্ধ স্থাপন করা। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও নিঃসন্দেহে 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য' বা 'বৃহত্তর ভারত'-এর কর্মীদেরই একজন। লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে শুধু অধমর্ণ না হয়ে উত্তমর্ণ হতে হবে,—এই সত্যোপলব্ধি সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে এখানে। এই উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ কিন্তু রামমোহনের মধ্যেই লক্ষ করা গিয়েছে। সেদিক থেকে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের কর্মীদের রামমোহনের উত্তর-সাধক বলে অভিহিত করতে বাধা কোথায়! এ সত্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টার সূত্রে রবীন্দ্রনাথও এই 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের' অন্যতম প্রধান কর্মী; কিন্তু যেখানে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের কর্মীদের প্রয়াস পাশ্চাত্ত্যের উপর প্রাচ্যের কোনো সুপরিকল্পিত ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক জয়ের অভিলাষের দ্বারা চালিত হয়েছে সেখানে কর্মী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র।

রামমোহন বৃহত্তর-ভারতের সংগঠনে পুরোধাঃ কর্মী

কবির হৃদয়ে যে বৃহত্তর ভারতের স্বপ্নরূপ প্রতিফলিত হয়েছিল তা তাঁর নিজের ভাষাতেই ব্যক্ত করছি ঃ

"অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়। সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রী-ভাবনাতেই এই অহং-ভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোক-দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারে নি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূ-খণ্ড-সীমার বাইরে আপনাকে

প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটেই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তাহলেই আমরা ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা নিজেকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব, সে জন্য আমাদের নতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না।"

রবীন্দ্রচিন্তায় 'বৃহৎ ভারত'

—'বৃহত্তর ভারত', কালান্তর, পৃ—৩০৮, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫৫।

তিনি আরও বললেন:

"………ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য করে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অন্যকে আপন করে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এই জন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্য জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষে সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়।"

—'বৃহত্তর ভারত'। কালান্তর, পৃ—৩০৯-১০, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৫৫।

আসল কথা, বাণীর সাধকেরা শব্দের শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে সচেতন; তাই শব্দের নির্বাচন ও প্রয়োগ বিষয়েও তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধানী। এই সতর্কতার বশবর্তী হয়েই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মবিজয়', 'সাংস্কৃতিক বিজয়', প্রভৃতি কথা উচ্চারণের বা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না ; কারণ 'বিজয়' শব্দটির সাহায্যে যে আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার ভাবটি প্রকাশ পায় তার মধ্যে একটা বিরোধ, অনৈক্য এবং অহমিকার সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই বৃহত্তর ভারতের কোনো কোনো স্বপ্নদ্রষ্টা ও কর্মী পাশ্চাত্ত্যের উপর প্রাচ্যের যে ধর্মবিজয় বা সাংস্কৃতিক বিজয়ের বার্তা ঘোষণা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে তার কোনো প্রতিধ্বনি আমরা পাইনি। তিনি এ বিষয়ে শুধু নীরব নন, সম্পূর্ণ বিপরীত প্রত্যয়ানুবর্তী। কিন্তু যেখানে তাঁরা পূর্বপশ্চিমের মিলন-সাধনার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সতীর্থ এবং এ বিশ্বাসে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। —তাই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যের উপরেই তিনি বার বার জোর দিয়েছেন।

পরিশেষ

ভারতের ইতিহাসে শ্রেয়ঃসাধকদের দৃষ্টি, জিজ্ঞাসা ও জীবনবোধ সুপ্রাচীন অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয়ে এমন একটি দেশ-কাল নিরপেক্ষ সামগ্রিক সত্যরূপ লাভ করেছে যে, তাকে কোনো খণ্ড ভৌগোলিক আয়তনে অথবা সময়ের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে বিচার করা কঠিন। তাঁরা যে কালে বিরাজ করেন সে কাল 'অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত'। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম তাই সর্বদাই একটি নিত্য-সত্যের ভিত্তিকে আশ্রয় করতে সচেষ্ট হয়েছে। সেই নিত্য-সত্যের স্বরূপটিকে আবিষ্কার করার মধ্যেই ভারতপথিকদের চিন্তাকে অনুসরণের সার্থকতা নিহিত। সেই সত্যের ভিত্তিটি কি? স্বল্পতম ভাষার পরিসরে সেটিকে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, তা হল, **অখণ্ড নির্বিশেষ মানবতাবোধ**। নানা বিচ্ছিন্ন পরিচয়ের মধ্যে তাঁদের যে বৈষম্যগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি এই **মানবাদ্বৈতবোধের** মধ্যে এসে সুমহৎ প্রশান্ত সামঞ্জস্যে লীন হয়েছে। এই সত্যের সাগরসঙ্গমে এসে সকল সাধক তাঁদের সুচির অক্লান্ত সন্ধানের শেষে পরম প্রাপ্তির লগ্নে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। সেখানেই মানবসত্তা তত্ত্বের আকাশ-বিহার থেকে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে আত্ম-আবিষ্কারের মাটিকে খুঁজে পেয়েছে।

ভারতপথিকদের সাধনা

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান নিবন্ধে যদি তাঁদের এই মানবাদ্বৈত-বোধের বিকাশের তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোকপাত করা সম্ভবপর হয়ে থাকে, তবেই এ প্রচেষ্টা যথাসাধ্য যৎসামান্য সার্থক।

মানবাদ্বৈতবোধ

এই মানবতাবোধের সংযোগসূত্রে শ্রেয়ঃ সাধকদের চিন্তাধারা একসঙ্গে গ্রথিত। এক মহৎ চিন্তানায়কের চিন্তা অনুসরণ করতে গিয়ে তাই আমরা তাঁর কণ্ঠে অপর মনীষীর বাণীনির্ঘোষ শুনতে পাই, বিশেষ একজনের জীবনবেদে অন্য কারও জীবনদর্শনের প্রতিফলন দেখতে পাই। চিন্তা বা কর্মের খুঁটিনাটি বিচারে এই সমধর্মিতা যখন খুব বেশি বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তা আমাদের বিস্ময়ের ও কৌতূহলের অনুসরণযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এই ভাবে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের বিদ্রোহের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মনীষী

স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মাগান্ধী

রোমাঁ রোলাঁর স্বাভাবিক ভাবেই মহাত্মা গান্ধীর কথা স্মরণে এসেছিল। মহাত্মা গান্ধীকে এ বিষয়ে তিনি বিবেকানন্দের উত্তরসাধক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

"Another has received the torch from the hands of him (Vivekananda) who cried ;

'Come, all ye, the poor and the disinherited ; come, ye who are trampled under foot ; we are one !' and has taken up the holy struggle to give back to the untouchables their rights and their dignity—M. K. Gandhi."

—The life of Vivekananda and the Universal Gospel.

ভারতের শাশ্বত সাধনা

মানবহিতৈষণার তথা মানবাদ্বৈতবোধের ('we are one') এই বাণী ভারতের সাধকদের কণ্ঠে আশ্চর্য আধ্যাত্মিক স্বরসাম্যে ধ্বনিত হয়েছে :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বিবেকানন্দ।

"যেথায় থাকে সবার অধম
দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

"Service to man is service to God."

—মহাত্মা গান্ধী।

ঐ অখণ্ড মানবসত্তার, নিত্যমুক্ত নির্বিশেষ মানবাত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেই 'মানুষের ধর্ম' ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন

সর্বকালীন মানব।.........সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।.........সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক তাঁকে অন্তরে ধারণ করতে হবে—এই হল ভারতের চিরন্তন বাণী, ইতিহাসের অজস্র অগ্নি-পরীক্ষায় যা আজও নবঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে। শুধু অখণ্ড মানবপ্রেম তথা মানবাদ্বৈতবোধের এই বাণীর বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়েই 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' সকল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষা পেতে পারে। ভারতপথিকদের কণ্ঠে যুগে যুগে নব নব ভাবে ও ভাষায় উদ্গীত সেই বাণীকে প্রত্যক্ষ জীবনাচরণে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের নৈতিক দায়িত্ব মুখ্যতঃ বর্তমান ভারতের। সেই বিশ্বজনীন মিলনমন্ত্রের শ্রেয়ঃসাধনায় তার পূর্ণতর সাফল্যের প্রহর গুণে চলেছে পৃথিবীর সকল শান্তিকামী মানুষ।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির তালিকা

(তথ্য ও উদ্ধৃতির জন্যে যাদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে)

রবীন্দ্রনাথের ও বিবেকানন্দের (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম, প্রথম সংস্করণ) রচনাবলী

এবং

গ্রন্থ		রচয়িতা
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ		শিবনাথ শাস্ত্রী।
বাঙ্‌লার নবযুগ	···	মোহিতলাল মজুমদার।
Notes on Bengal Renaissance	···	অমিত সেন।
বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর আনন্দমঠ	···	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ব্রাহ্ম ধর্ম	···	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
An Indian pilgrim	···	সুভাষচন্দ্র বসু।
প্রবন্ধ সংগ্রহ	···	প্রমথ চৌধুরী।
বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) বাঙ্‌লা সাহিত্যের কথা		ডঃ সুকুমার সেন।
বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিকাশের ধারা	···	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস	···	ডঃ ভূদেব চৌধুরী।
Life of Ramkrishna	···	রোমাঁ রোলাঁ।
স্বামিশিষ্য সংবাদ (পূর্বখণ্ড)	···	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী।
বিবেকানন্দ চরিত	···	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্‌লার ঊনবিংশ শতাব্দী		গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।
স্বামীজীর জীবনকথা	···	কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র জীবনী (চার খণ্ড) রবীন্দ্র জীবনকথা	···	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ	···	প্রমথনাথ বিশী।

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা ... ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র।
বিবেকানন্দ ও বাঙ্‌লা সাহিত্য ... ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।
দুই মনীষী ... হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিনয় সরকারের বৈঠকে ... আলাপচারী বিনয়কুমার সরকারের উক্তির সঙ্কলন।

প্রবন্ধ

পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদান-প্রদান ... আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।
(প্রবাসী ১৩২৪ ভাদ্র)

১৩০৬ সালের ৪ঠা বৈশাখের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬, সংখ্যা—২)

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১১শ খণ্ড, ১১শ বর্ষ, ১৩৫৯ শ্রাবণ),
রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ
(কথা সাহিত্য, ১৩৭০ ফাল্গুন) } প্রবোধচন্দ্র সেন।

বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদান সংগ্রহ ... ডঃ কালিদাস নাগ।
(উদ্বোধন, ১৩৬৮ মাঘ)

পুরোনো কথা ... হেমলতা ঠাকুর।
(দেশ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬)

স্বামীজীর বাঙ্‌লা রচনা ... স্বামী প্রেমঘনানন্দ।
(উদ্বোধন, ১৩৪৪ ফাল্গুন)

নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য ... শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
(দেশ, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৭)

———